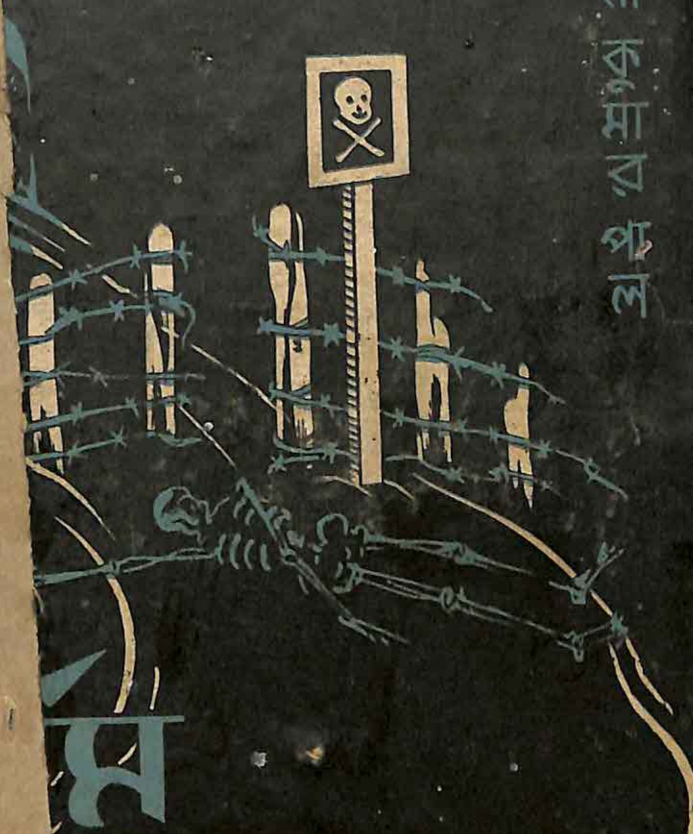
অশ্বিনীকুমার পাল



বার ব
নগরবাসি
ঠ, প্রা
শান ;
ছ আকাশে
ারো ভ
মস্ত মা

দুর্গম গিরি-শিরে

ষ্টি, সৌন্দর্য, মানুষ, মানবতা ও সভ্যতা—এই নিয়ে
সিতা করছি একা বসে' কল্পনা-রাজ্যে। ভাবছি, সুন্দর এই
ী, আরো সুন্দর বৈজ্ঞানিক এই আবিষ্কার !

এমন সময় হঠাৎ ভীষণ শব্দ হলো। কেঁপে উঠলাম আমি ;
উঠল পায়ের নীচে সমস্ত শহরটা। বোমা পড়ল রেংগুনে।
তখন দশটা। আমার কল্পনা-রাজ্যের ভাব-বিলাস হয়ে
ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। পরিবর্তে অংকুরিত হলো দুঃখবাদের কঠিন
সত্য।

নিমিষের মধ্যে সমস্ত শহরের কায়া গেল বদ্‌লে। ক্ষত-বিক্ষত
শহর। ধূম্রা। এই র ভিতরের ও বাইরের চেহারা। ধ্বংসরূপী
দেবতা মুহূর্তে ক লয়লীলায় রেখে গেল ঘরে ঘরে করুণ
ন সুর। রয়েছে- ব্রধ্বনি উঠল দিকে দিকে। ভেঙ্গে পড়ল
থরের there. বাড়ী, মন্দির-মস্‌জিদ, গির্জ্জা-প্যাগডা।
পরা। সেখা লেজ, অফিস-আদালত। যুগযুগান্তরের
গরিমা, ভারতের পথ কৃষ্টি ও সাধনার প্রতিচ্ছবি ক্ষণিকের
আঘা কোমল লো ধূলিময়। আকাশ বাতাস কেঁদে
সেই ধূযাত্রী। রিত হয়ে। সারাদিন কেটে গেল ধূমায়িত
র দিকে রলাম, পরে এলো সন্ধ্যা, এলো তমসা-ঘোর
। মুছে নের চিতা রাতের অন্ধকারে।

সেই বিশ্ব-স্তব্ধ প্রলয় নিশীথে রাত তিনটের সময় শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে, শুধু কম্বলটা সম্বল করে'। ন্যাশন্যাল ইন্‌ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেন্স অফিসে কাজ করি, সঙ্গে এলো অফিসের দারোয়ান রামকিষণ আর মণীন্দ্র। সাথী হলো তারা সাথীহারার ; সমর-শংকিত নিঃসঙ্গ জীবনে তারা দিল সাড়া। নীরব নিস্তব্ধ সমস্ত শহর, ধ্বংসীভূত প্রাণহীন। শুধু ইটপাথরের বাড়ীঘর স্তূপাকারে পড়ে' আছে পথের দু'পাশে ; মানবজীবনের সভ্যতার ইতিহাসকে উপহাস করে', পদদলিত করে'।

ভীতি-বিহ্বল চিত্তে ছুটে চল্‌ছি শহরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে—মটন ষ্ট্রীট জেটীতে। ভোর পাঁচটায় ষ্টীমার। সেই ষ্টীমারেই যেতে হবে চায়লট—এই শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। খুনী আসামীর মত পলাতক আমরা। দুরু দুরু বুকের স্পন্দন। শংকাজড়িত পদক্ষেপ। পায়ের ধ্বনিতে যেন কেঁপে উঠ্‌ছে বুক। পথের দু'পাশে ইটের তৈরী বড় বা[illegible]রনের [illegible]ক। সাই[illegible] ইংগিত শোনা মাত্র শহরবাসীর আশ্রয় নেবার ব[illegible]স্থা। কিন্তু আজ শহর একেবারে শূন্য, জনপ্রাণীহীন। নগরবা[illegible] আজ অরণ্য ও প্রান্তরবাসী। শহরবাসী আজ অরণ্যে, মাঠে, প্রা[illegible]রে, জলাশয়ের ধারে বেঁধেছে বাসা। শহর আজ শ্[illegible]শান ; [illegible] চিতাভস্ম উড়ে উড়ে প্রাণহীন সভ্যতার পরিচয় দিচ্ছে আকাশে বাতাসে।

ট্রেঞ্চের ভিতরের অন্ধকাররাশি [illegible]মারো ভয়ংকর। জীবন্ত মানুষকে যেন গ্রাস করতে চাইছে। স[illegible]মস্ত মানুষ আর মানুষের সংসার যেন ধ্বংস করতে চায়।

অতি সাবধানে পা ফেলে' তাড়াতাড়ি চল্‌ছি। কারো মুখে

কোন কথা নেই। নীরব নিস্তব্ধ ভাষাহীন আমাদের মুখ। ঘন ঘন বইছে উষ্ণশ্বাস। প্রলয়-বিধ্বস্ত শহরের বুকের ওপর শংকাজড়িত পা ফেলে' আমরা ছুটে চল্‌ছি জেটীর উদ্দেশ্যে। সমুখ দিয়ে একটা কালো কুকুর রাস্তা পেরিয়ে ওধারে গেল। একবার দাঁড়িয়ে ঘাড় কাত করে' আমাদের দিকে পিছন ফিরে চাইল। পশুতে আর মানুষে কোথায় যে ব্যবধান তাই বোধ হয় খুঁজল। তারপর আমাদের দিকে আর একবার চেয়ে চলে' গেল। মিশে গেল অন্তহীন রাতের কালো অন্ধকারে।

সহসা রামকিষণের পায়ে কি যেন ঠেক্‌ল। মাথা নীচু করে' উপুর হয়ে চেয়ে দেখে একটা মড়া ; সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত. ডান হাতখানা দেহচ্যুত হয়ে পাশেই পড়ে' রয়েছে। কিছুদূর এগিয়ে এসে একজন লোককে অন্ধকার রাস্তার ওপর দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। প্রথমে ভয় হলো। এই মৃতের রাজ্যে জীবন্ত মানুষের দেখা! কালো পোষাক পরিহিত কালো চেহারা! কালো পোষাকে শাদা অক্ষরে লেখা রয়েছে—এ. আর. পি.। গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, who goes there ? বল্‌লাম, ইভাকুইজ। মর্টন ষ্ট্রীট জেটীতে যাব আমরা। সেখান থেকে ষ্টীমার ধরে' চায়লট্ হেনজাদা, প্রোম হয়ে ভারতের পথ ধরব।

লোকটি কোমল স্বরে বললে, চলো ভাই, আমিও তোমাদের সহযাত্রী।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কোত্থেকে আস্‌ছ ?

সে বললে, ইন্‌সিন থেকে আসছি।

—তোমার নাম কি ?

—আগের নাম ছিল ভি. জি. মুদালিয়ার, এখন স্মিথ।

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নামের এই পরিবর্তন কেন হ'ল ? সে একটু সংকোচের সঙ্গে বল্‌লে, যৌবনের ভুলে একটি ফিরিঙ্গি মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম, তাই আমার নাম স্মিথ। ভেবে দেখলাম, এ সব ভুল। প্রেম, ভালবাসা, ধর্মান্তর গ্রহণ, সবই ভুল। অপরিপক্ক জীবনের স্বপ্নছবি মাত্র। সত্য শুধু এই সংগ্রাম, বোমা, ধ্বংস আর মৃত্যু। বলে' সে হলো আমাদের সাথী। এ.আর.পি'র পোষাকটা গা থেকে খুলে' ফেলে' দিল। ভিতরে ছিল আসল পোষাক—স্বদেশের, স্বজাতির। এখন থেকে নাম ধরল—ভি. জি. মুদালিয়ার।

ভোর পাঁচটায় মর্টন ষ্ট্রীট থেকে ষ্টীমার ধরে' আমরা চায়ল্‌ট এসে ডাঃ পালের অতিথি হ'লাম। উদ্দেশ্য এখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করে' বোমাভীতু চঞ্চল মনটাকে একটু শান্ত করে' আবার পথ ধরব। মাদ্রাজী স্মিথ সাহেব সেদিনই গ্রামের পথ ধরল।

মাসখানেক পর। বাটা কোম্পানীর কালো ক্যান্‌ভাসের এক জোড়া জুতো আর একটি টুপি কিনে' রওনা হ'লাম ১৩ই ফেব্রুয়ারী চায়লট্ থেকে। আমাদের সঙ্গ ধরলেন ডাঃ পালের স্ত্রী শান্তিদি'। তাঁর কোলে দু' বছরের একটি খোকা। আরো এলেন হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও প্রথম পক্ষের তিনচারটি ছেলেমেয়ে। কম্পাউণ্ডারবাবুও এলেন। দু'জন চাকরও এলো। একজন উড়িষ্যাবাসী, নাম শৈব ; আর একজন উত্তরভারতীয় মুসলমান, নাম বসির। লোকটি সাহসী এবং

অনেকটা গুণ্ডাপ্রকৃতির। আর এলো সুরেশ ও ক্ষেত্র—তুটি তরুণ যুবক।

ভোর আটটার সময় চায়ল্‌ট থেকে প্রথম শ্রেণী রিজার্ভ করে' লঞ্চে হেন্‌জাদা রওনা হবার প্রস্তুতি চল্‌ছে। ট্রাংক, স্যুট্‌কেশ, বিছানাপত্র, থালা ঘটিবাটি, ছেলেপিলের জন্য বিস্কুটের টিন আর আমাদের জন্য চায়ের সরঞ্জাম ইত্যাদি জীবনের সব কিছু জিনিষ-পত্র নিয়ে এই তুটি পরিবার যখন প্রথম শ্রেণীতে গিয়ে ঢুকলাম—লঞ্চের সাহেবীয়ানা প্রথম শ্রেণীর কামরাটা তখন খাঁটী বাংগালী-য়ানার তৃতীয় শ্রেণীতে পরিণত হলো। সমস্ত জিনিষপত্র এলোমেলো ভাবে রাখা হয়েছে। আর ছেলেপিলের দল সে সব জিনিষপত্রের ওপর পা ছড়িয়ে বসে' হাত তালি দিচ্ছে। কখনও কখনও বিছানার বাণ্ডিল আর বড় বড় ট্রাংকের ওপর উঠে লাফালাফি খেলছে। আবার কেউবা বিস্কুটের টিন হাতে নিয়ে কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে। এসব দৌরাত্ম্যে ডাক্তার পালের স্ত্রী শান্তিদি' অতিষ্ঠ হয়ে এক কোণে চুপ করে' বসে' বল্‌লেন, কোথাও যদি এতটুকু নিস্তার পাওয়া যেতো। কম্পাউণ্ডারবাবুর স্ত্রীও বেশ একটু অতিষ্ঠ হয়ে মৃতা সতীনের ছেলেমেয়েগুলিকে ধরে' তু'চারটে কিল চড় সুরু করে' দিলেন। নিমিষের মধ্যে ছেলেপিলেগুলো সমস্বরে মড়াকান্নার রোলে চারদিক ভরে' তুল্‌ল। চুপ, চুপ, কাঁদতে নেই, বলে' ছেলেপিলেগুলোকে কোনোরকম শান্ত করলাম। ঝড় বয়ে যাবার পর প্রকৃতি যেমন শান্ত ভাব ধারণ করে আমাদের কামরাটিও অনেকক্ষণ পর যেন একটু শান্ত হলো।

লঞ্চের বাঁশী বাজল। লঞ্চ ছেড়ে দিল। একটা জানালার

ধারে দাঁড়িয়ে ক্রমশঃ অদৃশ্যমান চায়ল্‌ট শহরের দিকে চেয়ে আছি। সংগ্রাম, প্রলয়, বন্যা মানুষকে যে এমন করে' ঘরছাড়া করে সে কথাই ভাবছি। হঠাৎ পেছন দিকে চেয়ে দেখি কম্পাউণ্ডারবাবুর স্ত্রী গালে হাত দিয়ে একটা চেয়ারে চুপ করে' বসে' আছেন! যেন দুষ্মন্তের ধ্যানে মগ্না শকুন্তলা। কম্পাউণ্ডারবাবু লঞ্চে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এতদিন চায়লটে থাকতেই কম্পাউণ্ডারবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কাছে এসে একটু হেসে বললাম, গালে হাত দিয়ে কি ভাবছেন শকুন্তলার মত? আপনাকে দেখতে ঠিক শকুন্তলার মতই মনে হয়। এবার থেকে আপনাকে কিন্তু শকুন্তলাদি' বলে' ডাকব।

গাল থেকে তাড়াতাড়ি হাত নামিয়ে হেসে বললেন, বেশ তাই হবে। কিন্তু দেখুন তো উনি গেলেন কোথায়! এখানে তো দেখতে পাচ্ছিনা!

বললাম, কোথায় আর যাবেন। হয়তো লঞ্চের টি-ষ্টলে চা-টা খাচ্ছেন।

—উনি কোনোদিন চা খান না। আপনি একটু দেখে আসুন।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এমন পতিগত প্রাণ দেখে একটু বিস্মিত হ'লাম। কামরা থেকে বেরিয়ে দেখি পা ফেলবার জায়গা নেই—এতো প্যাসেঞ্জার। প্রাণের ভয়ে সব ব্রহ্মদেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। এতো লোকের ভেতর কম্পাউণ্ডারবাবুকে খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য। তবে একমাত্র সহজ উপায়—তাঁর মাথার চুলগুলো সব পাকা। তাই সাদা মাথা খুঁজতে লাগলাম। ওপরের ডেকে নেই। চট্টগ্রামের মুসলমানের ভীড় ঠেলে নীচে গিয়ে দেখি—তিনি লঞ্চের ইঞ্জিনের

কাছে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিন চালাবার ব্যাপার দেখছেন। বললাম, মানুষ বুড়ো হ'লে ছেলেমানুষেরও বাড়া হয়। এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন ? ওদিকে গিন্নী যে খুঁজে' মরছেন।

—কেন, আমি তো এখানেই আছি। এখানে বেশ একটু দাঁড়াবার জায়গা আছে। দেখছেন তো কি রকম ভীড়। কোনো ভদ্রলোক যেতে পারে এতো ঠেলাঠেলির ভেতর ?

হেসে বল্‌লাম, এখন ভদ্রলোক অভদ্রলোকের প্রশ্ন নয়, বোমার ব্যাপারে সবই সমান হয়ে গেছে। আজ সব লোকই এক। জগতে একটা শুভ পরিবর্তনের যুগ এসেছে। কিন্তু আপনার এই ইঞ্জিনের উত্তাপের কাছে দাঁড়াবার দরকার কি ? প্রথম শ্রেণী যখন রিজার্ভ রয়েছে······ ?

কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, ডাক্তারবাবুর স্ত্রী রয়েছেন কিনা, তাই একটু······।

—তাই একটু লজ্জা করছে। কিন্তু লজ্জা সরমের কথা নয়। বিশেষতঃ আপনি বুড়োমানুষ, তাঁর কাছে আপনার লজ্জার কি আছে ?

বল্‌লেন, ডাক্তার পাল আর আমি আজ অনেকদিন ধরে' একসঙ্গে কাজ কর্‌ছি। তাঁর পরিবারের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। কিন্তু কোনদিন বউটীর মুখ দেখতে পাইনি—এত লজ্জাশীলা বউটী। হবেইবা না কেন, লজ্জাই তো বাংলার নারীর ভূষণ। তার চেয়ে এখানেই বেশ আছি। আপনি যান। গিন্নী আমায় খুঁজছে কেন ? আপনার মত লোক থাকতে তার কিসের অসুবিধা ? আপনাকে সঙ্গী পেয়েছি বলেই তো এই দুর্গম পথে প্রাণের ভয়ে ছেলেপিলে

নিয়ে পালাচ্ছি। এখন সব ভারই আপনার ওপর। যা হয় আপনিই করুন। এখন আমার মাথার ঠিক নেই। দুশ্চিন্তায় মারা গেলাম। এবার পূজোয় দেশে যাবার কথা ছিল, তখন চলে' গেলে আমাকে আজ এই বিপদে পড়তে হ'ত না। অদৃষ্টে দুর্ভোগ আছে, খণ্ডাবে কে? এখন একমাত্র ভগবান ভরসা। নির্বিঘ্নে তিনি যদি পৌঁছে দেন, তবেই রক্ষে। টাকা পয়সা যা কিছু ছিল সবই ফেলে এলাম, এখন জীবনটা বাঁচলে হয়।

হেসে বল্‌লাম, জীবনটার জন্য এত ভাবনা করছেন কেন? জীবনটা তো দু'দিনের। না হয় সবাই মিলে একসঙ্গে মরব। কিন্তু যাক সে কথা। আপনি ওপরের কেবিনে চলুন। এখন আর লজ্জা সরম করলে চলবে না। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী রয়েছেন, সে জন্য লজ্জার কি? চলুন ওপরে।

ওপরে এলে শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, তুমি নীচে একা একা বসে' কি ভাবছিলে শুনি? ভেবে ভেবে মাথাটা খারাপ করবে নাকি? তারপর আমার দিকে চেয়ে আবার বল্‌লেন, বাসায় থাকতেও রাত্রে ঘুম ছিল না। কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস। মাথার চুলগুলো এ ক'দিনের ভেতর সব সাদা হয়ে গেল। বয়স কি আর তেমন বেশী কিছু হয়েছে।

বল্‌লাম, কত?

—ষাট এখনো হয়নি।

—কিন্তু আপনার?

—ধরুন, পঁচিশ।

—কিন্তু আরো কম বলে' যেন মনে হয়। কী সুন্দর স্বাস্থ্য আপনার! শুনে' শকুন্তলাদি' ভারী খুসী হয়ে আমাকে একটি পান সেজে খেতে দিলেন। কম্পাউণ্ডারবাবু আমাদের কথাবার্তা শুনে' একটু দূরে চেয়ার টেনে বসে' জানালা দিয়ে মুখ বার করে' নদীতীরের দৃশ্য দেখতে লাগলেন। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী শান্তিদি' তখন তাঁর দু' বছরের ছেলেকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বল্‌লাম, আচ্ছা শকুন্তলাদি' আপনার বয়স মাত্র পঁচিশ আর কম্পাউণ্ডারবাবুর বয়স ষাট: একটা বিরাট্ ব্যবধান। অথচ আপনাদের বেশ গলাগলি ভাব। এ কি করে' সম্ভব হ'ল?

তিনি গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন, ব্রহ্মচারিণী যে নারী সে দেহের দিকে চেয়ে তার স্বামীকে ভালবাসে না। তার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতাটুকু আমার জীবনপথের পাথেয়। আমি তাঁর কাছে আর তো কিছু চাইনে।

এমন সময় কম্পাউণ্ডারবাবু এদিকে এসে বল্‌লেন, বসে' বসে' যে গল্প করছ ছেলেমেয়েদের খাওয়াবে কখন? সন্ধ্যে হয়ে এল। ব্ল্যাক-আউট্, ষ্টীমারে লাইট্ থাকবে না—সে কথা মনে আছে?

অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লাম, হ্যাঁ শকুন্তলাদি, তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার কাজটা সেরে ফেলুন, নইলে অন্ধকারে মুশকিল হবে। শান্তিদি'কেও ডেকে তুলুন। কি রকম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছেন, যেন নিজের বাড়ী পেয়েছেন।

সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে' ঘুমোবার ব্যবস্থা চল্‌ল। কিন্তু শোবার এতটুকু জায়গা নেই, আমাদের

মালপত্রেই সব ভরে' গেছে। বিছানা পেতে আরাম করে' পা ছড়িয়ে ঘুমাবার জায়গা নেই। ছেলেপিলের জন্য আগে শোবার জায়গা করা হলো। ছেলেরা শুয়ে পড়ল। শোয়া মাত্রই তাদের অঘোর ঘুম। কিন্তু আমাদের শোবার আর জায়গা নেই। শান্তিদি' তাঁর দু'বছরের ছেলেটিকে বুকে করে' এক কোণে মাথা রাখলেন। এ কামরায় একটা টেবিল আর একটা চেয়ার আছে। শকুন্তলাদি' সৌখীন মেয়ে, তিনি না ঘুমিয়ে থাকতে পারেন না। টেবিলটা একধারে টেনে নিয়ে পা গুটিয়ে টেবিলের ওপর শু'য়ে পড়লেন ছোট একটা বালিশ মাথায় গুঁজে। কম্পাউণ্ডারবাবু বুড়োমানুষ, একটু শোয়া দরকার। তিনি উপায় না দেখে' স্ত্রীর টেবিলের নীচে গিয়ে একটু কাত হ'লেন। কিন্তু বুক থেকে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ টেবিল ছাড়িয়ে বাইরের দিকে এসে পড়েছে। আমি শকুন্তলাদি'র টেবিল সংলগ্ন চেয়ারটায় বসে' ঘুমোবার ব্যবস্থা করলাম। শৈব, বসির, রামকিষণ, মণীন্দ্র—এরা সব ডেক্ প্যাসেঞ্জার হয়ে চাট্‌গাঁয়ের মিঞাভাইদের দলে মিশে' গেছে। রাত প্রায় দু'টো বাজে। কম্পাউণ্ডারবাবুর আর আমার চোখে এতটুকু ঘুম নেই। দু'জনেই জেগে আছি তা বুঝতে পার্‌ছি। অথচ দু'জনেই একেবারে নীরব, মনের নানা দুশ্চিন্তায়। হঠাৎ কম্পাউণ্ডারবাবু বলে' উঠলেন, ভাগ্যে দুর্ভোগ থাকলে শুয়ে থেকেও লাথি খেতে হয়।

আমি বল্‌লাম, আবার কি হলো আপনার ?

—সারা রাত চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই, তার ওপর আপনার শকুন্তলাদি'র পা দু'খানি টেবিল থেকে ঝুলে' পড়েছে

ঠিক আমারই মাথার ওপর। একটু উঠে বসব, তারও উপায় নেই। পা দুটো কপালে ঠেকে। কতবার উঠতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু লাথি খাই আর শুয়ে পড়ি।

এতো দুশ্চিন্তার মধ্যেও চোখ বুঁজেই হাসতে লাগলাম। শকুন্তলাদি'কে ঠেলে দিয়ে বল্লাম, উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন। রাত ভোর হয়ে আস্ছে। এখুনি হেন্জাদা গিয়ে পৌঁছাব।

শকুন্তলাদি' তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন। বাইরের দিকে চেয়ে বল্লেন, কোথায় ভোর ? এখনো রাত আছে। বলে' আবার পা গুটিয়ে শুয়ে' পড়লেন।

পরদিন বেলা বারোটায় এসে হেন্জাদা পৌঁছালাম। নদীর তীর। বালুর চর। উত্তপ্ত নদীতীরের বালুকণা। এখান থেকে অন্য ষ্টীমারে প্রোম যেতে হবে। চেয়ে দেখি সে ষ্টীমারখানা দু'দিন আগে থেকেই প্যাসেঞ্জারে ভর্তি হয়ে আছে। সবই ইভাকুইজ্। ভারতবাসী। ষ্টীমারে তিল ধরবার স্থান নেই। শান্তিদি' শকুন্তলাদি' সহ আমরা সবাই মিলে' কুলীর মত কোলে কাঁধে মাথায় করে' সব মালপত্র নিয়ে ঐ ষ্টীমারে ওঠবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দুঃসাধ্য ; পুলিশ পাহাড়া দিচ্ছে। আর কাউকেও উঠতে দেবে না। স্থান নেই।

পরের ষ্টীমার আবার ক'দিন পর কে জানে ? এই ষ্টীমারে উঠতে না পারলে এই বালুচরেই পড়ে' থাকতে হবে। তার ওপর এই চরে বর্মী ডাকাতের ভয় আছে। এর মধ্যেই নাকি লুঠ-তরাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। এই ষ্টীমারে যেতেই হবে। সবাই মিলে ষ্টীমারের সিঁড়ির ওপর মালপত্র মাথায় করে' দাঁড়িয়ে আছি।

উপায় নেই। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দশ টাকার কয়েকখানা নোট বার করে' পুলিশের হাতে দিতেই ষ্টীমারে জায়গা হয়ে গেল।

এই ষ্টীমারে আর একটি বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো। ভদ্রলোকের নাম সুধাংশুবাবু। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আর বয়স্থা মেয়ে, গৌরী। তাদের একটি চাকরও আছে, নাম রামতনু। আমাদের দল বেশ ভারী হয়ে উঠল। হেন্‌জাদা থেকে আবার দু'দিনে এসে পৌঁছালাম প্রোমে, রাত বারোটার সময়। অপরিচিত শহর, ব্ল্যাক-আউটের রাত। এতগুলি লোক নিয়ে কোথায় যাই? প্রোমে একজন পরিচিত বন্ধু আছে। অনেক খুঁজে' তার বাসা পেলাম। তাকে বল্‌লাম, ভাই, পরের কতগুলো মেয়েছেলে সঙ্গ ধরেছে: আজ রাতটা তোমার এখানে একটু জায়গা দাও। কালই আবার এখান থেকে রওনা হ'ব। বন্ধুটী আগুনের মত জ্বলে' উঠে আমাকে এক রকম তাড়িয়েই দিলে। তার বাসায় জায়গা হ'ল না। ফিরে এলাম। পথে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁকে সব কথা খুলে' বল্‌লাম। শুনে' তিনি বল্‌লেন, মেয়েছেলেরা এখন কোথায়?

—ষ্টীমার থেকে নেমে নদীর ধারে বসে' আছে।

ভদ্রলোকের দয়া হলো। নিজের স্ত্রীপুত্র আগেই দেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বল্‌লেন, আমি তো এখন মেসে থাকি, আমার ঘরটা খালি আছে। এই নিন চাবি। চলুন, আপনাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ভদ্রলোকের অনুগ্রহে একটু জায়গা পেলাম। কিন্তু সে রাতটা

আমাদের ভয়ানক অশান্তিতে কাটল। রাত একটার সময় চার পাঁচজন বর্মী এসে আমাদের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে' গেল। মনে হলো : নিশ্চয় ওদের কোন দুরভিসন্ধি আছে। এ দিকে নানা জায়গায় লুঠপাটের কথা শুনছি। খুব সাবধানে থাকা দরকার। সারা রাত আলো জ্বেলেই বসে' থাকতে হবে। কিন্তু এখন আলো কোথায় পাই ? অন্ধকার ঘর যেন আমাদের গিলে' খেতে চাইছে। সমুখের রাস্তায় একটা পানের দোকানে তখনো কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বল্‌ছে, কালো কাগজের ঢাক্‌না দেওয়া। আলো যেন বাইরে না পড়ে। ব্ল্যাক-আউট্‌। সেখানে গিয়ে মোমবাতি পেলাম। একসঙ্গে চার পাঁচটা মোম জ্বেলে' ঘরে আলোর ব্যবস্থা করলাম। মেয়েরা ছেলেপিলে নিয়ে বসে' আছে। সকলের মনেই বিষাদের ছায়া। কারো সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় না। এ দিকে ছেলেপেলের দল ক্ষুধার জ্বালায় ভয়ানক কান্না সুরু করে' দিয়েছে। কিছু খাবার কিনতে গেলাম। কিন্তু কোথাও কিছু মিল্‌ল না—সব দোকানই বন্ধ। ষ্টীমারে চায়ের দোকানে বিস্কুট দেখে এসেছি। ষ্টীমার ঘাট এখান থেকে প্রায় মাইলখানেক। সর্ট-কাট্‌ করে' একটা রাস্তায় ঢুকতেই কয়েকজন বর্মী গুণ্ডা এসে পকেটে হাত দিতে চাইল। ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম। সঙ্গে ছিল কম্পাউণ্ডারবাবুর চাকর বসির। সেও এদের চেয়ে কম গুণ্ডা নয়। একজন বর্মীকে এক ঘুষিতে 'পপাত ধরণীতল' করে' দিল। বাকী সব দৌড়ে পালালো একটা আমবাগানে। অক্ষত পকেটে সেখান থেকে ষ্টীমারে গিয়ে বিস্কুট কিনলাম।

রাত্রে শোবার জন্য বিছানাপত্র কিছুই নেওয়া হয়নি। সব

জিনিষপত্র নদীর ধারে নামিয়ে রাখা হয়েছে। রামকিষণ, মণীন্দ্র, সুরেশ আর সুধাংশুবাবু—এরা ক'জন মালের কাছে বসে' মালগুলো পাহারা দিচ্ছে। এতো রাত্রে কুলী মিলল না বলে' মালপত্র আজ এখানেই থাকা স্থির হলো। সুরেশ, মণীন্দ্র আর সুধাংশুবাবুকে সেখানে রেখে রামকিষণ আর বসিরকে বললাম, গোটা দুই বিছানা নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।

ঘরে ফিরে দেখি সবাই কাঠের মেঝের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেপিলের গায়ের জামাগুলো খুলে' বালিশের পরিবর্তে মাথার নীচে দেওয়া হয়েছে। গৌরীর বালিশ হয়েছে একটা পিঁড়ি। এভাবে ঘুমোলে নিশ্চয়ই মাথায় ব্যথা হবে ভেবে পিঁড়িখানা সরিয়ে নিজের গায়ের জামাটা খুলে' ওর মাথার নীচে দিলাম। গৌরী ঘুমিয়ে পড়েনি। চোখ মেলে' আমার দিকে চাইল। কি যেন লজ্জায় ওর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠ্‌ল একটি মৃদু মধুর হাসি। দেখে খুসী হয়ে চলে' এলাম শান্তিদি'র কাছে। তিনিও ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু তাঁর মাথা নিজের ডান হাতের ওপর। শকুন্তলাদি' আর গৌরীর মা শুধু বসে'। এঁদের বল্‌লাম, ডাকাডাকি করে' সবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দরকার নেই। রাত অনেক হয়ে গেছে, আপনারা এই বিছানা পেতে শুয়ে পড়ুন। বিস্কুট এনেছি, কিন্তু ছেলেপেলেরা তো সব ঘুমিয়ে পড়েছে। আচ্ছা থাক, ওদের জন্য রেখে দিন। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই খাবে। দিনকাল ভাল নয়, এখানে খুব কলেরা হচ্ছে।

পরদিন সকালে উঠেই বাজার করতে গেলাম। চাল, ডাল, তরকারী সামান্য যা কিছু পাওয়া গেল তাই নিয়ে এলাম। লবণ

পেলাম মাত্র দু'আনার, বেশী বিক্রী করবে না। তাড়াতাড়ি রান্না করে' খাওয়াদাওয়ার পর আবার রওনা হবার যোগাড় করলাম। প্রোম নদী পাড়ি দিয়ে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে নামতে হবে। একখানা বড় শাম্‌পান (ও দেশী নৌকো) পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভাড়া করলাম। যার ভাড়া আগে ছিল দু'টাকা। নদী পার হয়ে যেখানে নামব, সে জায়গার নাম পাডাং। নদীর তীরে একটা বালুর চর। এই পাডাং থেকে একশো কুড়ি মাইল পাহাড়ের ওপর দিয়ে হেঁটে তারপর টাংগুর পৌঁছতে হবে। এ রাস্তায় ভাত জল কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা এক বস্তা চাল ও আনুষঙ্গিক মালমশলা কিনে নিলাম। জলের জন্য এগারোটা কেরোসিন তেলের টিনও এগারো টাকা দিয়ে কিনে প্রোম নদী থেকে জল ভরে' শাম্‌পানে উঠ্‌লাম। নদীর পার থেকে মালপত্র নিজেরাই বয়ে' এনে শাম্‌পানে ওঠালাম। এই সময় আর একজন সঙ্গী জুট্‌ল নিতাই। আমাদের সকলেরই আগের জানাশোনা। কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, ভালই হলো। মেয়েছেলে নিয়ে চলেছি, বিপদ-সংকুল পথ, আমাদের অনেকটা সাহায্যই হবে। ছোকরার সাহস আছে, শক্তিও আছে। ও একবার একটা জানোয়ারের মত বর্মী ছোকরাকে এক ঘুষিতে নৌকো থেকে জলে ফেলে দিয়েছিল। বেশ সাহস ছোকরার। আমার তো সাহস, শক্তি কিছুই নেই। যাও ছিল তাও এই যুদ্ধের ঠেলায় আর নেই।

বেলা একটার সময় পাডাং এসে পৌঁছালাম। ধূ ধূ করছে বহুদূর বিস্তৃত বালুর চর। চৈত্রের চিতা চারদিকে জ্বলছে যেন! মধ্যাহ্নের সূর্য আকাশের অসীমতায় ঢেলে দিয়েছে তার তীব্র

অনলের তপ্ত ঝল্‌কানি। উত্তপ্ত রূপালী বালুকাসাগরের ঢেউ চোখের সামনে। রৌদ্রানলের ভিতর যেন দিগন্ত লুপ্ত হয়ে গেছে। অবলুপ্ত হয়েছে এখানে শ্যামল কচি তৃণের সমাজ। একপাশে নীরব নিস্তব্ধ প্রোম নদীর শৈবালযুক্ত কালো কুৎসিৎ জল। অপর পাশে এই তপ্ত কম্পমান বালুকণার মরীচিকা-তরঙ্গ। প্রবাহ শুধু আগুনের। ভাসমান শুধু উষ্ণ বাতাস, অধীর উত্তপ্ত বহ্নির মত।

পীড়িত মানবসমাজের দৃশ্য ভেসে' উঠ্‌ল চোখের সামনে। হাজার হাজার ভারতীয় ইভাকুইজ এই বালুর প্রান্তরে। মাদ্রাজী, গুজরাটী, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী আর বাংগালী—সবাই ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রাপথে বেরিয়েছে এই বহ্নিদীপ্ত মরু অঞ্চলে। বোমা-বিতাড়িত হয়ে মিলেছে এই রৌদ্র-দগ্ধ বালুর বুকে। পলকহীন শংকাজড়িত চোখে চেয়ে আছি। মানবজীবনের পরিণামের দৃশ্য দেখছি। দেখছি যাত্রাপথের মানুষ। দেখছি পথহারা ভারতীয় মানবসমাজ। অধিকাংশই কুলীমজুর। পরিধানে শুধু ছিন্নবস্ত্র সম্বল করে' বেরিয়েছে তারা ভারতের পথ অনুসন্ধানে। পায়ে হেঁটে যেতে হবে চিরবাঞ্ছিত নিজ দেশে। ঘৃণায়, অবহেলায় ত্যাগ করেছে ব্রহ্মদেশ। শুধু জাপানী বোমার ভয়ে নয়, ভারতীয়দের প্রতি বর্মীদের অত্যাচার যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ মাত্রায় বেড়ে গেছে। এখন এদেশে থাকা একেবারে অসম্ভব। একদিকে মাথার ওপর বোমা, আর এক দিকে এই দুঃসহ অত্যাচার। তাই ভারতবাসী আজ ভারতের সন্ধানে বেরিয়েছে। পায়ে হাঁটার পথ। আরাকান পর্বত-শ্রেণী পেরিয়ে যেতে হবে। দুঃসহ কল্পনা! কি করব? অন্য পথ নেই। জলপথ বন্ধ। সে পথে সাবমেরিনের ভয়। এখন শুধু এই

এক পথ। হোক সুদীর্ঘ পার্বত্যকঠিন, হোক্ বন্যজন্তু সমাকুল; কিন্তু নিঃস্ব পথিকের পক্ষে এই পথই ছায়াশীতল, স্নিগ্ধ ও সুশ্যামল। তাই হাজার হাজার লোক এখানে এসে জড়ো হয়েছে এই নদীর তীরে—বালুচরে; তৃষিত কণ্ঠে আর ক্ষুধিত জঠরে।

সমুখে সুদীর্ঘ অজানা দুর্গম পার্বত্য পথ—একশো কুড়ি মাইল। এই পথে কেউ কোনদিন যায়নি। লোকচক্ষুর আড়ালে লুকানো ছিল এই পথ। ব্রহ্মদেশ জয়ের পর হয়তো ইংরেজ রাজত্বের গুপ্ত গিরি-পথ ছিল এটা। কিন্তু আজ লোকের চক্ষে এই পথ আবিষ্কৃত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ইভাকুইজ এই পথের সন্ধান পেয়ে ছুটে এসেছে ভারতে চলে' যাবার জন্য। দেশে গিয়ে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকবার জন্য। মরতে কে চায়? অজানা মৃত্যুর অন্ধকারে ভীত সবারই প্রাণ। কাজেই আজ হাজার হাজার লোক—ভদ্র অভদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, পণ্ডিত মূর্খ, অভিজাত অনভিজাত, ধনী দরিদ্র, কুলী মজুর—সবাই এসে মিলেছে এই পথের প্রথম অংশে। কিন্তু পথের খবর যা শোনা যায়, সে এক ভয়ংকর ব্যাপার। ভয়ে, ত্রাসে গা শিউরে' ওঠে। সর্বশূন্য বিঘ্নসংকুল এই পথ। অন্নহীন, জলহীন, আশ্রয়হীন, লোকালয়হীন। শুধু অরণ্য, শুধু গিরিমালা, শুধু গিরি-গহ্বর। অরণ্যের অন্ধকারে পরিপূর্ণ শুধু বন্যজন্তুর বাসস্থান। এই ভয়াবহ পথ ধরে' যেতে হবে ভারতবর্ষে। হাজার হাজার লোক তাই এখানে একত্র হয়ে জটলা করছে নিজেদের মধ্যে। পথের দুঃসংবাদ শুনে' তা নিয়ে আলোচনা চল্‌ছে শুষ্ক ম্লান বেদনা-চঞ্চল মুখে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা। উত্তুঙ্গ গিরি-শিখরে নাকি একবার উঠতে হয়, আবার

অতল গিরি-গুহায় নেমে আসতে হয়। প্রত্যহ কুড়ি মাইল করে' হাঁট্‌লেও ছ'সাত দিন লাগবে। কিন্তু কুড়ি মাইল করে' এই পার্বত্য পথে হাঁটা কি সকলের পক্ষে সম্ভব? কত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছে, ছেলেপেলে আছে, সব রকম লোকই আছে। হয় তো এই পথ পার হ'তে মাসখানেকও লাগতে পারে। অনিদ্রা, অনাহার হয়তো এই পথের অপরিহার্য। এ অবস্থায় এই পথ ধরা সকলের পক্ষে সম্ভব কি? কিন্তু অসম্ভব হ'লেই বা প্রতিকার কি? ফিরে আবার রেংগুন চলে' গেলে মৃত্যু অনিবার্য। মরতে হয় এ পথে যেতেই মরবে। তবু আর ফিরে যাওয়া যায় না। শোনা যায় এ পথের জন্য গরুর গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু একশো টাকা করে' তার ভাড়া। নিঃস্ব হয়ে পথে বেরিয়েছে যারা তাদের পক্ষে গাড়ীর কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র। পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

এমনি সকলের মনের অবস্থা। সমুখের পথে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ-সংশয়। আবার পিছনে রেংগুনের পথে বোমা-মৃত্যু; অথবা বর্মীদের দ্বারা লুণ্ঠনাশংকা; নির্যাতিত জীবনের জ্বালাময় ছবি। এমনি "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় লোকগুলো এই বালুরাশির ওপর পড়ে' থেকে অভিশপ্ত জীবনের ভার বইছে। জ্বলন্ত রোদের তাপ সহ্য করতে না পেরে বেশীর ভাগ লোকই প্রোম নদীর পচা জলে নেমে স্নান কর্‌ছে এবং নদীর ধারে উনুন তৈরী করে' তাতে রান্না কর্‌ছে। কোনরকম এক মুষ্টি খেয়ে আবার বসে' বসে' পথের ভাবনা ভাবছে।

মুহূর্তের মধ্যে এ জায়গার অবস্থাটা বুঝতে পারলাম। বুঝতে

পারলাম এ জায়গটা কলেরাক্রান্ত। নদীর ধারে জল ঘেঁষে' চার পাঁচটা মৃতদেহও দেখতে পেলাম। একটা কুকুর সেই মৃতদেহের পাশে বসে' ঘেউ ঘেউ করে' চীৎকার কর্‌ছে। আর একটা কাকও কা-কা কর্‌ছে।

এই জায়গাটা এ মুহূর্তেই ত্যাগ করা দরকার। সঙ্গে ছেলেপেলে রয়েছে, কখন কার কি হয় বলা যায় না। শান্তিদি'র কোলের ছেলেটির এর মধ্যেই সারা গা ভর্তি ঘাম উঠেছে। তার সঙ্গে একটু একটু জ্বরও আছে। ছেলেটিকে কোলে করে' নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে শান্তিদি' আমায় বল্‌লেন, যা হয় শীগগির করুন, ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। শুন্‌ছি এখান থেকে নাকি গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। কোথায় গাড়ী? আমি তো কোন গাড়ীই দেখছি না। মরণ আর কাকে বলে। ছেলেপেলে নিয়ে কি শেষে রাস্তায় মারা যাব?

বললাম, এখান থেকে দু'মাইল দূরে পুলিশ ষ্টেশন। সেখানে গিয়ে গাড়ী ভাড়া কর্‌তে হয়। পুলিশের লোকই গাড়ী ঠিক করে' দেয়। Family যার সঙ্গে আছে তাকেই আগে গাড়ী দেওয়া হয়। আপনি ভাববেন না, এখুনি সব ঠিক হয়ে যাবে। বলে' নিতাই আর আমি গাড়ী ভাড়া কর্‌তে গেলাম। আটখানা গাড়ী আটশো টাকা দিয়ে ভাড়া কর্‌লাম। টাকা জমা দিয়ে গাড়ী নিয়ে এলাম। একশো টাকা একখানা গাড়ীর কথা শুনে' সুধাংশুবাবু মুখখানা বিবর্ণ করে' বললেন, আমার পক্ষে একশো টাকা এখন অসম্ভব। এত টাকা দিয়ে যেতে

পারব না। এখানেই কিছুদিন থাকি, গাড়ীর ভাড়া কমলে পরে রওনা হব। আপনারা যান।

বললাম, এখানে থাকা আর মরা একই কথা। দেখছেন না চারদিকের অবস্থা। একদিন দেরী করলে কলেরায় মৃত্যু অনিবার্য।

সুধাংশুবাবুর স্ত্রী আমার হাতটা ধরে' দু' চোখের জল ছেড়ে' দিয়ে বললেন, আপনি ছাড়া আমাদের উপায় নেই, এ বিপদ থেকে আপনি আমাদের বাঁচান। বলে' শাড়ীর আঁচলের গিঁট্‌টা খুলে' আমার হাতে মাত্র পঁচিশটি টাকা দিয়ে বললেন, এই আছে।

টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, আপনাদের অন্য খরচ আছে, রেখে দিন আপনার কাছে। আপনাদের গাড়ীর ভাড়া আমিই দেব।

কম্পাউণ্ডারবাবুর বয়স প্রায় ষাট। অত্যন্ত সাদাসিদে এবং সরল প্রকৃতির লোক। তিনি বললেন, গাড়ীর ভাড়া কত তা আমি জানি না। একশো হোক দু'শো হোক, গাড়ী যে পাওয়া গেছে এটাই যথেষ্ট। এই নিন্ আমার কাছে পাঁচশো টাকা আছে, আপনার কাছেই রেখে দিন। যা খরচ করবার করবেন। জীবনের চেয়ে কি টাকা বেশী হ'ল। ছেলেপেলে নিয়ে যে বিপদে পড়েছি, তা' একমাত্র মাথার ওপর ঈশ্বরই জানেন। জীবন ভরে' যা রোজগার করেছি সবই তো ফেলে এলাম। মাত্র এই পাঁচশো টাকা এখন সম্বল। আর এই ক'টা মালপত্র ; বাসা ভর্তি সব জিনিষপত্র রেখে এসেছি, হয়তো এতদিনে

তাও বর্মীরা লুঠপাট করে' নিয়ে গেছে। সে-সব জিনিষ কি আর ফিরে পাবার আশা আছে? এখন দেশে গিয়ে না খেয়েই মরতে হবে। তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বল্লেন, তোমার কাছে যা আছে সব বার করে' এঁর হাতেই দাও। টাকা পয়সার হিসেব রেখে আর কি হবে! এখন কোনোরকম প্রাণে বেঁচে দেশে যেতে পারলেই ভাল।

শকুন্তলাদি' একটা সুট্‌কেশ খুলে' ভেতর থেকে একটা থলে' বার করে' আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, দেখুন তো এ থলে'র ভেতর কত টাকা আছে? দু'চার আনা করে' জমিয়েছিলাম, আজ সেটা কাজে লাগবে। মেয়েদের গুপ্তধন দুর্দিনের সহায়।

থলে'টি খুলে' বালুর ওপর ঢেলে' গণে' দেখি—আড়াইশো টাকার সিকি, দু'আনি আর আধুলি। হেসে বল্‌লাম, আপনার মত হিসাবী স্ত্রী স্বামীর দুর্লভ। যাক্, এতে খুচরো পয়সার কাজটা চলে' যাবে। আমার নিজের টাকা নিয়ে মোট পাঁচ হাজার টাকা আমার কাছে গচ্ছিত হলো। এতগুলি টাকা একজনের কাছে রাখা ঠিক নয় ভেবে শকুন্তলাদি'র আড়াইশো টাকার থলে'টা রামকিষণের হাতে দিলাম। রামকিষণ থলে'টা কোমরে জড়িয়ে বেঁধে রেখে দিল। জীবনের এই মরুময় অভিযানের দিনে বিশ্বাস কর্‌লাম হিন্দুস্থানী এই রামকিষণকে। দু'জনেই ন্যাশন্যাল্ ইন্‌ডিয়ান্ লাইফ অফিসে কাজ করি; আমি কেরাণী, সে দারোয়ান। মাইনে সামান্য বেশী পাই ওর চেয়ে। কিন্তু মানুষ হিসাবে ও হয়তো আমার চেয়ে ওপরে। ওর গায়ে কোম্পানীর ইউনিফর্ম পরা, হাতে বাঁশের

লাঠি, পিতল দিয়ে বাঁধানো তার মাথা। টাকাগুলি কোমরে বেঁধে অফিসের কায়দায় নমস্কার জানিয়ে যেখানে আমাদের মালপত্র স্তূপাকারে রেখে দেওয়া হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে লাঠি হাতে মালপত্রগুলো পাহারা দিতে লাগল। ছেলেপেলে নিয়ে মেয়েরা সব মালপত্রের ধারে খরতপ্ত বালুরাশির ওপর বসে' নিজেদের মালের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। মাথার ওপর সূর্যের প্রখর তাপ আর পায়ের নীচে বহ্নিতপ্ত বালুকা-বেলা। এরই মধ্যে রাখতে হবে হিসাব করে' পথিকজীবনের সামান্য সম্বল এই মালপত্র। অস্থাবর সম্পত্তি হলো অস্থায়ী জীবনের সাথী।

আমাদের আটখানা গাড়ী এসে মালগুলোর ধারে দাঁড়াল। আটজন বর্মী গাড়োয়ান। বন্য জংগলীর মত চেহারা। মনুষ্যসমাজে কোনোদিন বাস করেছে বলে' মনে হয় না। কঠিন নির্দয় তাদের চোখের চাহনি। ভরসা হলো না এদের দেখে। প্রত্যেকের সঙ্গে আবার এক একটি দা; তীক্ষ্ণ ও শাণিত।

শকুন্তলাদি' দেখে বল্‌লেন, এই গুণ্ডাদের নিয়ে পথ চলবেন? বোমা ছেড়ে বর্মীর দা?

হেসে বল্‌লাম, ভয় নেই। আমরা এতগুলো লোক আর ওরা মাত্র আটজন। তাছাড়া আমাদের বসির, নিতাই আর রামকিষণ—এ তিনজনই ওদের আটজনের সমান। বসিরের ছুরি, নিতাইর ঘুষি আর রামকিষণের লাঠি; কার সাধ্য সামনে দাঁড়ায়।

হাঁটুর সমান উঁচু করা খড় ভর্তি প্রত্যেকটি গাড়ী। গরু-গুলোর পথের খোরাক। খড়ের ওপর আমাদের বিছানা খুলে' পেতে দেওয়া হলো। পেছনের দিকে চার পাঁচটা করে' মাল

রেখে সমুখের দিকে আমরা উঠে বসলাম। একবার চারদিক চেয়ে দেখলাম। করুণ কাতর শত শত জীবনের ছবি ভেসে' উঠল প্রাণস্পর্শ করে'। গাড়ী ভাড়া করে' যাবার যাদের শক্তি নেই, অর্থের অভাবে যারা অভাবগ্রস্ত, একখানা পরণের কাপড় সম্বল করে' তাড়াতাড়ি প্রাণের ভয়ে চলে' এসেছে—এমন লোক হাজার হাজার এই বালুচরে পড়ে' রইল। হয়তো তারা দু'একদিন পরে সাহস আর শক্তি সঞ্চয় করে' পথ ধরবে। হয়তো বা এখানেই দিনের পর দিন কাটিয়ে অবশেষে অনাহারে অনিদ্রায় ব্যাধি-গ্রস্ত হয়ে মরে' পড়ে' থাকবে এই নদীতীরের তপ্ত ধূলায় জীবনের শেষ নিশ্বাস ছেড়ে। চেয়ে রইলাম এই জীবন্ত মুমূর্ষুদের মুখের পানে। তাদের মর্মভেদী অবস্থা চঞ্চল করল আমার সারা দেহমন।

বেলা পড়ে গেছে। দিগন্তের অরণ্যশ্রেণীর মাথায় সুদূর প্রান্তের বিলীয়মান রোদের ম্লান ঝিকিমিকি খেলা চল্‌ছে। বিশ্বের যেন মৃত্যুমলিন হাসি। মুমূর্ষু পৃথিবীর দীর্ঘশ্বাস যেন পশ্চিম আকাশের রক্তরেখায় দোলা দিচ্ছে। আমাদের গাড়ী চল্‌ছে বালুচরের ওপর দিয়ে সারিবন্দী হয়ে, একটির পর একটি। সকলের আগের গাড়ীতে আমি—দলপতি সেজে। চির অজানা পথের পথ দেখানো পথিক যেন আমি। কিন্তু কোথায় কোন্ পথে কি ভাবে চলতে হবে, সে ভার আমার গাড়োয়ানের ওপর। আমি শুধু বলি, চালাও গাড়ী। কোন্ পথে? সে ভার তার ওপর। মহাসাগরের বুকে দিশাহারা যাত্রীদলের ধ্রুবতারা যেন আমার গাড়ীর গাড়োয়ান।

বালুর চর ছেড়ে এসে পৌঁছালাম শুক্‌নো একটা মাঠে। সূর্যের প্রখর প্রতাপে মাঠের মাটি ফেটে দু'ভাগ হয়ে গেছে। তার ওপর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ সুদূরের দিকে প্রসারিত। সে পথের সাথী আমরা, আমাদের সাথী সেই পথ। ধূলায় ধূসরিত ফাগুনের বাতাস বইছে চঞ্চল। উড়ে যাচ্ছে ধূলার তুফান। পেছনের দিকে চেয়ে দেখলাম, দলের লোক ঠিক পেছনে পেছনেই আছে। সকলের মুখেই একটু আনন্দের হাসি। গরুর গাড়ী চড়বার এই প্রথম আনন্দ সকলকেই যেন একটু খুসী করে' তুলেছে। সন্দেহ হলো—এমন হাসিখুসী ভাব কি সারা পথেই থাকবে?

আমাদের প্রায় মাইলখানেক আগে আরো দশবারোখানা গাড়ী চল্‌ছে। গাড়োয়ানকে তাড়াতাড়ি গাড়ী চালিয়ে ঐ গাড়ীগুলো ধরতে বল্‌লাম। উদ্দেশ্য: অনেকগুলো ভারতবাসী একত্র হয়ে পথ চলি। মেয়েছেলে নিয়ে পথ চল্‌ছি, কখন কি বিপদ আসে বলা যায় না। তার ওপর গাড়োয়ানগুলির চেহারা সন্দেহ-জনক। সমস্ত ইন্‌ডিয়ান একত্র থাকাই ভাল। ভারতবাসী হয়ে সেদিন অপর ভারতবাসীকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে' মনে কর্‌লাম। স্বদেশবাসীকে সেদিন ভাল করে' ভালবাসতে শিখলাম। অন্তরে জেগে উঠল স্বদেশ-প্রেম। ইচ্ছা হলো সবাই মিলে' সমস্বরে বলে' উঠি: বন্দে-মাতরম্।

গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি গাড়ী চালালো। প্রত্যেক গাড়োয়ানের হাতে গরু তাড়াবার আল্‌পিন বিঁধানো লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেই গরুগুলি লাফিয়ে উঠে দৌড়ে চলে।

সামনে দু'টো ক্ষেতের মাঝখানে একটা খাদ পেলাম। এই খাদটা পেরুবার সময় হঠাৎ ধুপ করে' গাড়ী থেকে মাটিতে পড়ে' গেলাম। হাত পা ভাঙ্গল না বটে, কিন্তু লজ্জা পেলাম ভয়ানক। পেছনের সবাই হো হো করে' হেসে উঠল। হাসল না শুধু আমার ঠিক পেছনের গাড়ীর মেয়েটি—গৌরী। বললে, লাগেনি তো? ওর কাছেই যেন লজ্জা পেলাম বেশী। বললাম, না—গরুর গাড়ীতে চড়বার অভ্যাস নেই কিনা, তাই। বলে' আবার তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বসলাম। রামকিষণ ছিল সকলের পেছনে। গাড়ী থেকে পড়ে' গেছি শুনে' দৌড়ে এসে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে' আমার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। আর যেন পড়ে' না যাই এমনি একটা সতর্ক দৃষ্টি তার চোখেমুখে। মনে প্রশ্ন জাগল: সাথী কে? গৌরী না রামকিষণ?

মাঠের ওপর দিয়ে ক্ষেতের পর ক্ষেত পেরিয়ে যাচ্ছি। ক্ষেতের ওপর দিয়েই পায়ে হাঁটার ও গরু চলার একই রাস্তা। ব্রহ্মদেশে শুধু একমাত্র শস্য ধান। সে ধান কাটা শেষ হয়ে গেছে। পড়ে' আছে শস্যহীন শুক্‌নো ক্ষেত দিগন্ত ব্যাপী। কাজেই এখন লোক আর গরু চলার পথ সোজা। মাঠের এক কোণ থেকে সোজা অপর কোণ। ঘুরে' ঘুরে' পথ চলতে হয় না। ভাবলাম: এত সুন্দর সোজা রাস্তা তবে আর দুঃখ কিসের? সারাটা পথ যদি এমন সমতলভূমির ওপর দিয়েই হয়।

লাঠি কাঁধে করে' রামকিষণ চল্‌ছে আমার পাশে। বল্‌লাম, রামকিষণ, আজকাল তোমার এ লাঠির যুগ নেই। দু'শো বছর

আগে দেশের লোক যখন ছিল বালকের মত সরল তখন সামান্য লাঠির ভয় দেখিয়েই দেশের আর সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা যেত। এখন বোমা আর মেসিন গানের যুগ। লৌহকঠিন নির্দয় উচ্ছৃংখল মানবচরিত্র গঠনের জন্য বৈজ্ঞানিক শাসনের ব্যবস্থা। তোমার এ লাঠির কথা শুনবে কে? আচ্ছা, রাস্তায় যদি বর্মীরা আমাদের আক্রমণ করে, তবে এই লাঠি দিয়ে কি কর্‌তে পার শুনি?

রামকিষণ বল্‌লে, ওরাও আমাদের মত পরাধীন জাত। বোমা, মেসিন গান ওদের হাতেও নেই। কাজেই ওদের সঙ্গে লাঠির যুদ্ধই হবে আসল যুদ্ধ। আমার এ লাঠির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরও মৃত্যু নেই। অবশ্য ওপর থেকে হঠাৎ এসে যদি মাথার ওপর কিছু না পড়ে। বোমাকে বড্ড ভয় করি বাবু, একেবারে সাক্ষাৎ যম।

আমার গাড়ীর গরু দুটো বেশ সবল, স্বাস্থ্যবান্ চেহারা আর বেশ বুদ্ধি আছে তাদের। কাজেই সকল গাড়ীর আগে আগে চল্‌ছে তারা। সমুখে পথের শত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ করে' চলার ভার আমার গাড়ীর গরু দুটির ওপর। সমুখে নাকি শত বিপদসংকুল বন্ধুর পার্বত্য পথ। জীবন-মরণ সমস্যায় পরিপূর্ণ। সে পথের একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু আমার গাড়ীর গরু। এদের সাবধানে পথ চলার ওপর নাকি নির্ভর কর্‌ছে আমাদের জীবন। যদি একটু অসাবধান ভাবে পা ফেলে তবে পড়ে যেতে হবে উঁচু পাহাড় থেকে মাইলখানেক নীচে—গিরি-গহ্বরে। মৃত্যু অনিবার্য। তাই গরুকে আজ গুরুর আসনে স্থান দিয়ে

মনে মনে প্রণাম করলাম ওদের চতুষ্পদের সাবধানতা প্রার্থনা করে'।

নোয়া হা! নোয়া হা! গাড়োয়ানের মুখে গরু তাড়ানোর সুর। গরু গাড়োয়ানের ভাষা বুঝল। তাড়াতাড়ি হেঁটে চল্‌ল। পিঠের ওপর পলাতক যাত্রীদের পার করে' দেবার ব্যাকুল ব্যস্ততা যেন চারটি চরণে জেগে উঠল। মাঠের পর মাঠ পার হয়ে চল্‌ছি। সমুখ পানে চেয়ে দেখি একটি পাঞ্জাবী নারী ব্যগ্রকরুণ কণ্ঠে চীৎকার করতে করতে আবার পেছনের পথে ছুটে আসছে। উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে আছি। ব্যাপার কি? রমণী এমন পাগলের মত ছুটে আসছে কেন? যাকে সমুখে পাচ্ছে তাকেই জড়িয়ে ধরে' যেন কি বলছে। আমাদের সমুখে এসে রামকিষণের দুটি হাত ধরে' বল্‌লে, ভাই, হামারা বাচ্চাকো রাস্তামে দেখা? হামারা বাচ্চা কিধার গিয়া, আপ লোক জান্‌তে হায়? রমণীর চোখে ছেলে-হারানোর ব্যাকুল অশ্রু। সঙ্গে ছিল সাত বছরের ছেলে, সে কোথায় গেল? তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। রমণীর আর্তকণ্ঠ আমাদের সকলের বুকে দীর্ঘশ্বাস তুল্‌ল। সকলের পেছনের গাড়ী থেকে শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, এ মাগীরই দোষ। ছেলেটা সঙ্গে থাক্‌তে হারায় কি করে'? এত অসাবধান কেন? বললাম, প্রাণের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার দিনে জীবনের সব কিছু এমনি হারিয়ে যায় শত সাবধানতার মাঝেও। কোন্ পথে? কেমন করে' তা কেউ বলতে পারে না। স্নেহের সুর, প্রেমের উচ্ছ্বাস, ভালবাসার আহ্বান ইত্যাদি সব কিছু পড়ে' থাকে ছিন্নচ্যুত হয়ে পথের পাশে।

মাঠ পার হয়ে এসেছি। সমুখে বর্মীদের বস্তি। বস্তির ভেতর দিয়ে এখন পথ। পথের দু'ধারে বর্মীদের ঘর-বাড়ী। আমাদের দেশের মত নয়। অতি দরিদ্র পর্ণ কুটীর। অতি দরিদ্র ওদের জীবন-যাত্রা। পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে বর্মীরা আমাদের বার বার চেয়ে দেখছে। তাদের মনে যেন আনন্দের ঢেউ; কত কৌতূহল। "কালারা পালাচ্ছে" এ কথা বলে' কানাকানি আর হাসাহাসি করছে। ভারতের লোককে এরা "কালা" বলে। ঘৃণার সুর। শুনলে প্রাণে লাগে। সুনীতি চ্যাটার্যি এ "কালা" শব্দটার অর্থ আবিষ্কার করে' বলেছিলেন, এ শব্দটা নাকি বর্মীরা গালির সুরে ব্যবহার না করে' ভদ্রতার সুরেই ব্যবহার করে'। কিন্তু আজ এ ব্রহ্মদেশ থেকে বিদায়ের পথে বেরিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের প্রতি এদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো' এ দেশের ছেলেবুড়ো সবাই গালির অর্থে এ শব্দটা ব্যবহার করছে। অসহ্য এ বর্মী বস্তিটাকে নীরবে সহ্য করে নিলাম।

রাত্রি তখন গোটা নয়েক। একটু একটু জ্যোৎস্না আকাশে জ্বলছে। আমাদের গাড়ী এসে এক জায়গায় থামল। এটাও একটা বর্মী বস্তি। সমুখের আমবাগানের ভেতরে চেয়ে দেখি—সেখানে আরো কতগুলি গাড়ী একত্র হয়েছে। সব ইভাকুইজ। গাড়ী থেকে নেমে তারা আমবাগানে রান্নাবান্না করে' খাচ্ছে। দেখে আমাদের গাড়োয়ানও এখানে গাড়ী বেঁধে রান্নার যোগাড় করল এবং আমাদেরও রান্না করে' খেয়ে নিতে বল্‌ল। রামকিষণ আর বসিরকে রান্না করতে বল্‌লাম। তারা আগুন

জ্বেলে আগে চা করতে লাগল। আগে চা খেয়ে পরে রান্না করবে। আমরা কেহ কেহ গাড়ীর ওপরেই বসে' রইলাম কেহবা নীচে নেমে আগুন পোহাতে লাগলাম। দিনের বেলা ভয়ানক রৌদ্র ও গরম, রাত্রিতে আবার ভয়ানক শীত। আমি গাড়ীর ওপরেই সুজনী চাদর গায়ে দিয়ে বসে' আছি। পাশা-পাশি সবগুলি গাড়ী রাখা হয়েছে। আমার গাডী মাঝখানে। এক পাশে শকুন্তলাদি'র গাড়ী, অপর পাশে গৌরীদের গাড়ী। আর সব চারদিকে। শকুন্তলাদি' টিন থেকে বিস্কুট বার করে' ছেলেপেলেদের এক একখানা করে' বিতরণ করছেন। আমার গাড়ীর ওপর দু'খানা ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে বললেন, খান। একখানা মুখে দিয়ে অপরখানা পাশের গাড়ীর গৌরীকে দিয়ে বললাম, খাও। গৌরী আবার সে বিস্কুটখানা ভেঙ্গে দু'ভাগ করে' অর্ধেক আমার কোলে ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে বললে, খান। শকুন্তলাদি' দেখে হেসে বললেন, একি ছেলেখেলা হচ্ছে! গৌরী লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু করে' আমার দিকে আড় চোখে চেয়ে হাসল। কিছুক্ষণ পর চেয়ে দেখি আমাদের আগে এসে আমবাগানে যারা রান্না করছিল, তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে' আবার পথ ধরল। জ্যোৎস্না যতক্ষণ আছে তাদের গাড়ী চল্‌বে। জ্যোৎস্না ডুবে যেতে আরো অনেক দেরী। চাঁদটা এখনো মাথার ওপরে দেখা যায়। ভাবলাম: আমরাও রাত্রির খাওয়া এখানে শেষ করে' পথ ধরব। তাড়াতাড়ি রান্না করবার তাড়া দিলাম। চা হয়ে গেছে। সকলেই টিনের ছোট বাটিতে করে' চা খেলাম। এখানে পেয়ালা করে' খাওয়ার সৌখীনতা

নেই। পথের সাথী ঘটি আর বাটী। চা খাওয়ার পর আবার রান্নার ব্যবস্থা হলো। বসির ও রামকিষণ লেগে গেল রান্না করতে। বৃদ্ধ রামতনু ভয়ানক তামাকখোর। হুঁকা হাতে তামাক খেতে খেতে রান্নার সাহায্য করতে লাগল। বসির মুসলমান, তার হাতের রান্না ভক্ষ্য না অভক্ষ্য, তা নিয়ে কারো কারো প্রশ্ন জাগল। কিন্তু মীমাংসা করবার জন্য কোন স্মৃতিশাস্ত্রের প্রয়োজন হলো না। স্মৃতি এখানে মূল্যহীন, শাস্ত্র এখানে অর্থশূন্য। সমাজ সংসার এখানে মিথ্যা। যে দুর্গম অজানা বন্ধুর পথের যাত্রী আমরা, সে পথের ধারে সমাজ নেই, সংসার নেই; ধর্ম অধর্ম, পাপ পুণ্য, সত্য মিথ্যা কিছুই নেই। আছে শুধু অন্তহীন এই পথ আর অন্তহীন এই মানবযাত্রীর দল।

গাড়ীর ওপর বসে' গল্প করছি—আমি আর শকুন্তলাদি'। বল্লাম, কি সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি! কি সুন্দর ঐ আকাশের চাঁদ! শকুন্তলাদি' বল্লেন, আর কি সুন্দর আমাদের এই গরুর গাড়ীতে চড়া। হেসে বল্লাম, পৃথিবীতে এত সুন্দর যানবাহন থাকতে গরুর গাড়ীটাকে সুন্দর বল্লেন? বর্তমান সভ্যজগতে মোটর গাড়ী রয়েছে, বাস রয়েছে, এ্যারোপ্লেন রয়েছে, সে সব ভাল লাগছে না? মুখখানা অতিশয় গম্ভীর করে' বল্লেন, আপনাদের সভ্যজগতের মোটর, বাস এসব পুরাতন সুন্দর পৃথিবীকে আজ অসুন্দর করে' তুলেছে। বোমা-বাহী এ্যারোপ্লেন আর সৈন্যবাহী মোটর, লরী, বাস সৃষ্টির মাঝে এনেছে জটিলতা, এনেছে ধ্বংস, প্রলয়, মৃত্যু। তাই

আজ মনে হয় এই গরুর গাড়ীই সত্যিকারের যান বাহন।

শীতে বসে' বসে' কাঁপছি দেখে রামতনু সমুখে এসে হুঁকাটি বাড়িয়ে ধরে' বল্‌লে, টানবেন? বল্‌লাম, না। চুরুট আছে। তোমার ম্যাচ বাক্সটা দাও। বল্‌লে, ম্যাচ তো বাইরে নেই, কাপড়ের পুঁটুলীতে ভরে' রেখেছি। এই ক'লকের আগুনে ধরান। খামাকা একটা ম্যাচের কাঠি নষ্ট করবেন কেন? বলে' ক'লকেটা এগিয়ে ধর্‌ল। চুরুট ধরিয়ে হেসে বল্‌লাম, বুড়ো, যে পথে চলেছ সে পথে আয় ব্যয়ের হিসাব নেই। ধন-দৌলত টাকা-পয়সা লাভ-লোক্‌সান এ পথের ধারে মিথ্যা। এখন সত্য শুধু তুমি আমি আর এই সব বন-জংগল। রামতনু আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে, হ্যাঁ বাবু, স্ত্রী পুত্র সব মিথ্যা; তবু মনে হয় দেশের বাড়ীতে আমার নাবালক ছেলে ও তার মা রয়েছে। ফিরে গিয়ে তাদের দেখব—কত আশা মনে। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে বল্‌লে, আমাকে কিন্তু ফেলে যাবেন না পথে। আপনার সঙ্গ ধরেছি, দয়া করে' দেশে নিয়ে যাবেন। টাকা পয়সা আমার হাতে কিছুই নেই। এখন শুধু আপনার ভরসা। কাপড়ের পুঁটুলীতে কয়েকটা ম্যাচ বাক্স, রাস্তায় তামাক খাবার জন্য। আর সের দুই সাগু রাস্তার খোরাক! দয়া করে' দু'এক বেলা যদি ভাত খেতে দেন, তবে এই একশো কুড়ি মাইল হেঁটেই যেতে পারব। বল্‌লাম, আমরা যদি ভাত খাই, তবে তুমিও দু'মুঠো পাবে।

যেখানে বসে' ওরা রান্না করছে, চেয়ে দেখি দশ বার-জন বর্মী সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকের হাতে লম্বা লম্বা দা, দু' দিকই শাণিত। তাদের মহৎ উদ্দেশ্য যে কি বুঝতে আর বাকী রইল না। ব্যাপারটা অনুভব করে' মেয়েরা সব অস্থির হয়ে উঠল। ছেলেপেলে সব গাড়ী থেকে নেমে জ্যোৎস্না রাত পেয়ে খেলা করছিল। শান্তি ও শকুন্তলাদি' তাদের ছেলেপেলেদের চীৎকার করে' ডেকে এনে গাড়ীতে উঠিয়ে বসাল। শুষ্ককণ্ঠে শকুন্তলাদি' আমাকে বল্লেন, শীগগির চলুন। এখানে রান্না করে' খাবার দরকার নেই। আমবাগানের দল সব চলে' গেছে, শুধু আমরাই আছি। এখন মেরে কেটে সব লুঠপাট করলেও কেউ রক্ষা করবার নেই। কম্পাউণ্ডারবাবু কাঁপতে কাঁপতে বললেন, অশোকবাবু, এখন উপায়? দেখছেন এক একজনের হাতে কত বড় বড় রাম দা! এ ব্যাটারা কি উদ্দেশ্যে এসেছে এখানে? ছেলেপেলে নিয়ে শেষ হ'লাম বুঝি।

বসির আর রামকিষণ নির্ভয়ে রান্না করছে। রামতন্থ বসে' বসে' তামাক খাচ্ছে। ডেকে বললাম, উনুনের আগুন নিবিয়ে ফেল শীগগির। এখন খাওয়া দাওয়া হবে না। এখান থেকে এখনই চলে' যাব। ওদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে? জিজ্ঞাসা কর তো ওরা এখানে কি চায়? বসির বর্মা ভাষা জানে। জিজ্ঞাসা করে' জানল—এরা নাকি আমাদের দেখতে এসেছে। বললাম, দা হাতে করে' রাত্রিবেলা কেউ কাউকে দেখতে আসে? শীগগির চলে' এসো।

গাড়োয়ানদের এর মধ্যেই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে।

গরুগুলিকে পাশের জংগলে ছেড়ে দিয়ে লতাপাতা খাওয়াচ্ছে। আমার গাড়োয়ানকে ডেকে গাড়ী ছাড়তে বললাম। প্রথম সে আপত্তি জানাল বললে, এখানে বস্তি আছে। কোন ভয় নেই। সামনে শুধু জংগলা পথ, রাস্তা সুবিধার নয়। রাত্রি ভোর হ'লে গাড়ী চালাবো! কিন্তু রাত্রি ভোর হবার পূর্ব্বেই যে এ ব্যাটাদের হাতে প্রাণ হারাতে হবে! এ গাড়োয়ান ব্যাটারাও কি তাহ'লে এদের সঙ্গে যোগ দিল নাকি? ভেবে আরও চঞ্চল হয়ে উঠলাম। তারপর নানা কথা বুঝিয়ে বক্শিসের লোভ দেখিয়ে বাধ্য করলাম। গাড়ী ছাড়ল। দা হাতে যে ভদ্রলোক ক'টি এসেছিল তারা আমাদের পেছনে পেছনে কতদূর এসে ফিরে চলে' গেল। বসিরকে ডেকে বল্লাম, ব্যাপার কিছু বুঝলে বসির? বল্লে, রাম-কিষণের গায়ে অফিসের পোষাক দেখে শালারা ভয় পেয়ে গেছে। ভেবেছে আমরা সব সরকারী অফিসের লোক। নইলে আমাদের প্রাণ নিয়ে ফিরতে হ'ত না। কম্পাউণ্ডারবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে রামকিষণকে বল্লেন, সাবধান রামকিষণ, কোম্পানীর পোষাকটা কখনো গা থেকে ছাড়বে না কিন্তু। নেহাৎ ভাগ্যি ভাল তোমার পোষাকটা গায়ে ছিল। শালারা কি মানুষ, সব ডাকাতের দল।

এতক্ষণ মেয়েরা আধমরা হয়ে গাড়ীর ওপর চুপ করে' রুদ্ধ-শ্বাসে ছিল। ডাকাতের দল চলে' গেলে তারা আবার প্রাণ ফিরে পেল। মুখ ফুটে বেরুলো শত কথা। কলকোলা-হলে আবার ভরে' উঠ্ল বিজন পথ। নীরব নিস্তব্ধ চারিদিক।

সামনে কোন বস্তি আছে বলে' মনে হ'ল না। তবু মিথ্যা কথা বললাম, আপনারা একটু আস্তে কথা বলুন। ঐ বর্মীদের বস্তি সামনে। কথার আওয়াজ শুনতে পেলে আবার আর একদল ডাকাত এসে কিন্তু কেটে ফেল্‌বে। ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ হলো। অব্যর্থ শরসন্ধান। মেয়েদের মাথায় যেন বাজ পড়ল। নিমেষের মধ্যে তাদের মুখ হলো বন্ধ। কথার স্রোত পেল নিদারুণ বাধা। কিছুক্ষণ নির্জন পথে নীরবে গাড়ী চল্‌ল। নীরব রাত্রির বুকে ভাষাহীন যাত্রীর দল। ব্যাপারটা বিশ্রী লাগল। মনে হলো, আমরা যেন অন্ধকারে হারিয়ে গেছি। যাত্রার পথে কলকোলাহল না থাকলে যাত্রার আনন্দ হয় বিফল। কথার নির্ঝর যেখানে প্রাণ সেখানে। শেষে বল্‌লাম, এবার আর ভয় নেই, বর্মী বস্তি পেছনে ফেলে এসেছি। মধুচক্রে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করলাম। নানা সুরের গলার আওয়াজ মেয়েদের গাড়ী থেকে ছুটে পড়তে লাগল। জনমানবহীন নিশীথ পথের ধারে বসল যেন হাট। কথার বেচাকেনা চল্‌ল। শকুন্তলাদি'র কণ্ঠস্বর সকলের ওপরে। শিক্ষিতা তিনি। পরিষ্কার তাঁর ভাষা। মিষ্টি তাঁর কণ্ঠস্বর। জ্বলছে তাঁর দুটী চোখ। একহারা লম্বা চেহারা। সুন্দর স্বাস্থ্য। সুন্দর গঠন। দেবীর মত সুন্দর তাঁর মুখ। জবা ফুলের মত সুন্দর সীঁথির সিঁদূর। সতীর মত সুন্দর তাঁর সর্ব অন্তঃকরণ। তিনি এবার সগর্বে বলে' উঠলেন, মৃত্যুপথের যাত্রী হয়েছি, মৃত্যুকে আর ভয় করব না। আসুক না ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাসের দল। এক হাতে ধরব তরবারি। অপর হাতে ঢাল।

অগ্রসর হব সম্মুখ সমরে। ভয় কি? গৃহের নারী ভীরু, বাইরের নারী ভৈরবী, ঝাঁপিয়ে পড়্‌ব বিপদের মাঝে।

আমার ঠিক পেছনের গাড়ীতে গৌরী আর তার মা। গৌরীর বাবা স্থধাংশুবাবু এবার আমার গাড়ীর আগে আগে রামকিষণ ও রামতনুর সঙ্গে হেটে চলেছেন। পেছনে মুখ ফিরিয়ে গৌরীকে বল্‌লাম, শুনলে শকুন্তলাদি'র কথা? পারবে বীর রমণী সাজতে? হাতে ঢাল তলোয়ার, মাথায় পাগড়ী? ঘোড়ার ওপর সোয়ার? গৌরী লজ্জায় লাল হয়ে ঘাড় কাত করে' আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কে হাসলো। লজ্জাবতী লতার মত নুয়ে পড়ল ওর সকল দেহ। কিছু বল্‌লে না। বুঝলাম, ও তা পারবে না। বললাম, বেশ, তা না পারলে, কিন্তু আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারবে? পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। রান্না বান্নাতো আজ আর হবে না দেখ্‌ছি। এক গ্লাস জলই খাই।

প্রত্যেক গাড়ীতেই এক এক টিন করে' জল রাখা হয়েছে। যার যখন দরকার ক্ষুধা পেলে জলই খাবে। আমার গাড়ীতে জল নেই, কারণ আমার গাড়ী মালপত্রেই বোঝাই। নিজের মালপত্রের মধ্যে মাত্র একটা কম্বলের বিছানা। বাকী সব সঙ্গের লোকের। কাজেই জলের টিন রাখবার আর স্থান নেই। গৌরী এবার মাথা তুলে' বল্‌লে, নেমে আস্থন, জল দিচ্ছি। গাড়ী থেকে নেমে গেলাম। গৌরী টিন থেকে জল তুলে' একটা টিনের গ্লাসে করে' দিল। একেবারে কানায় কানায় ভরা এক গ্লাস জল। বল্‌লাম, জল কিন্তু সোনার

দরে বিক্রী হবে এ পথে। বৃথা জল নষ্ট করা ঠিক না। এত জল খাব না, অর্ধেক রেখে দাও। গৌরী বল্‌লে, আপনি পেট ভরে' খান। জলের কি অভাব হবে? জলের টিন এখনো ভর্তি। অর্ধেক জল খেয়ে গ্লাসটা ওর হাতে দিলাম। বাকী অর্ধেক জল ও নিজেই খেয়ে ফেল্‌ল। বল্‌লাম, একি করলে? আমার এঁটো জল খেলে? পিপাসা-শান্ত অধরে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে বল্‌লে, যান গাড়ীর ওপর উঠে বস্থন গিয়ে। রাত্রে হাঁটবেন না। বুনো রাস্তা, সাপ পড়ে' থাকতে পারে। এদেশে বড় সাপের ভয়। যান গাড়ীতে উঠে বস্থন। ওর কথা রাখলাম। তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বস্‌লাম। জ্যেৎস্না তখন অস্ত যায় যায়। অসীম কালো-রাতের আবরণ চারিদিক থেকে ঘনিয়ে আস্‌ছে। মনে হলো, নিমেষের মধ্যে আমরা হারিয়ে যাব অতল অন্ধকারে। গাড়োয়ানকে বল্‌লাম, ভাল একটা জয়গা দেখে গাড়ী বেঁধে ফেল। জ্যোৎস্না অস্ত যাচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার রাত, এখন আর পথ চলা ঠিক হবে না। আরও কতদূর এগিয়ে গিয়ে একটা খালি ক্ষেতের মধ্যে গাড়ী বাঁধা হলো। রৌদ্রের তাপে ক্ষেতের মাটী ফেটে হাঁ করে' রয়েছে। মনে হলো, এ অঞ্চলে বৃষ্টি হয় না কোনদিন। ক্ষেতের চারপাশে কাশের বন। এক কোণে একটা অশ্বত্থ গাছ। দক্ষিণা বাতাস বইছে উতলা হয়ে। শোঁ শোঁ ধ্বনি তুলছে কাশের বন। অশ্বত্থ-পত্রে উঠছে থর থর মর্মর ধ্বনি। নৈশ-প্রকৃতি কত কথা বললে, বনবাসী আদি ভারতের মুনিঋষিদের কথা।

উপহাস করল আমাদের আর আমাদের তৈরী ইট পাথরের সভ্য শহরকে।

আশে পাশে কোন বস্তি আছে বলে' মনে হয় না। থাকলেও হয়তো অনেক দূরে। কারণ কোথাও কুকুর কিম্বা গরুবাছুরের ডাক শুনতে পাচ্ছিনা। অনেকটা নিরাপদ মনে করলাম। বরং এ কাশের বনের বাঘ ভল্লুক ভাল, তবু মানুষের আবাস নিকটে চাই না। কারণ মানুষ বন্যপশুর চেয়েও ভয়ংকর। গাড়োয়ানরা গাড়ী থেকে গরু এনে বাশ বনে ছেড়ে দিল। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত গরুগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ল কাশবনে। আমরা পুরুষেরা গাড়ী থেকে নেমে ক্ষেতের মাটির ওপর নামমাত্র বিছানা পেতে শোবার ব্যবস্থা করলাম। মেয়েরা গাড়ীর ওপরই শোবে। কিন্তু এখন কিছু না খেলে আর চলে না। ক্ষুধায় সকলেই ক্লান্ত, অবসন্ন। আজ সারাদিন কারো খাওয়া হয়নি। কিছুক্ষণ আগে আধ-সিদ্ধ ভাতগুলি ঐ দা-হাতে বর্মীদের ভয়ে ফেলে আসা হয়েছে। এখন এ কাশবনের নিরাপদ স্থানে রান্না করে' কিছু খাওয়া দরকার। কিন্তু এখন রাত আড়াইটা। ছেলেপুলে সব গাড়ীর ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্তিদি'র শরীর ভাল না। সেই পুরাতন রোগ। পেট ব্যথা। হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে' দু' বছরের খোকাকে পাশে শুইয়ে গাড়ীর ওপর পড়ে' আছেন। বল্লেন, কিছু খাব না। গৌরীর মার ভয়ানক মাথা ধরেছে। ব্যথায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছেন। গৌরী পাশে বসে' মাথাটা একটা নেকড়া দিয়ে শক্ত করে' বেঁধে দিচ্ছে। তিনিও কিছু খাবেন না। কাজেই ভাবলাম, এত রাত্রিতে ভাতের আর দরকার নেই, সকলে

মিলে চা-ই খাবো। অবিলম্বে বসির অশ্বত্থ গাছের একটা শুকনো ডাল ভেঙ্গে এনে আগুন জ্বেলে চা করতে বসল। শকুন্তলাদি' চায়ের সরঞ্জাম বের করে' দিলেন। রামকিষণ কাশের কতগুলি শুকনো গোছা আগুনের মধ্যে ফেলে দিল, দাউ দাউ করে' জ্বলে' উঠ্‌ল আগুন। ফেব্রুয়ারী মাস। ভয়ানক শীত পড়েছে। তার ওপর আকাশ থেকে হিম পড়ছে। সকলে মিলে' আগুন পোহাতে গেলাম। মেয়েরা গাড়ীর ওপরই কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে' রইল। কম্পাউণ্ডারবাবু একটা কাঁথা গায়ে দিয়ে আগুনের কাছে এসে বসলেন। রামতনু কাপড়ের খুঁট গায় টেনে দিয়ে হুঁকা হাতে বসিরের কাছে একটু আগুন চাইল। কিছুক্ষণ আগুন পোহানোর পর মাটিতে পাতা বিছানার ওপর এসে সকলে বস্‌লাম। উড়িয়া চাকর শৈব একখানা খালি গাড়ী পেয়ে তার ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু সে গাড়ীর গাড়োয়ান শৈবকে একটা ঠেলা দিয়ে নীচে মাটিতে ফেলে দিয়ে বল্‌ল, যাও নীচে শোও গিয়ে, এখানে আমি শোব। সকলেই এ দৃশ্যটা দেখলাম। গাড়োয়ানের প্রতি মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু ক্ষিপ্ততা প্রকাশ করবার স্থান এ নয়। আটজন গাড়োয়ান। আটখানা শানিত দা গাড়ীর সমুখে ঝুলিয়ে বাঁধা। সামান্য কারণে এরা মানুষের রক্ত নিতে দ্বিধা বোধ করে না। বসির, রামকিষণ আর নিতাই মাথা তুলে' দাঁড়িয়েছিল। কম্পাউণ্ডারবাবু তাদের হাত ধরে' বল্‌লেন, বাবারা, তার চেয়ে আগে আমাকে মারো। ওরা থেমে গেল।

কেট্‌লী করে' চায়ের জল সিদ্ধ-করা আমাদের এ পথে-চলা

সংসারে চলে না। বড় সংসার, একপাল লোক। এক ডেক্‌চী চায়ের কমে চলতে পারে না। আমরা এখানে নানা দেশের অজানা অচেনা লোক মিলে' বৃহৎ পরিবারের সৃষ্টি করেছি। শান্তিদি'র দেশ ঢাকা, শকুন্তলাদি মৈমনসিংহের আর গৌরীরা চট্টগ্রামের। কালের প্রভাবে বা যুদ্ধের অভিশাপে একত্র হয়ে পথের ধারে বেঁধেছি ঘর। এর মধ্যেই সকলকে আপন করে' নিয়েছি এবং একান্নবর্তী পরিবার হয়ে মাঠ প্রান্তর পেরিয়ে চলেছি একই পথে। সমাজ সংসার ও সভ্য শহরে বাস করে' শিক্ষিত ও মার্জিত মন নিয়ে যা পাইনি, তার সন্ধানেই আজ আমরা একত্র হয়েছি। আমরা ছুটে চল্‌ছি জীবনের সত্য উপলব্ধির সন্ধানে।

চা তৈরী হলো। টিনের গ্লাসে করে' চা খাবার ব্যবস্থা। ক্ষেতের ওপর আমাদের সংসার। চারিদিকে কাশবনের বেড়া; এক কোণে অশ্বত্থ বৃক্ষের মর্মরধ্বনি। নীরব-নিশীথ রজনী। মাথার ওপর নক্ষত্র নবীন অনন্ত আকাশ। নীচে এ সোনার সংসার। ধূলির পরে বাঁধা আমাদের ঘর প্রকৃতির কোলে। এক অভিনব সুর অন্তরে এসে প্রবেশ করল। ওপরের অসীম যেন সসীম হয়ে ধরা দিল প্রাণের কাছে। সত্য হলো আজ অতি সহজ। কত আপনার আজ আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে। হিন্দুস্থানী রামকিষণ, ইউ, পির মুসলমান বসির; উড়িয়্যার শৈব আর বাংলার আমরা—সবাই যেন কত আপনার জন।

রামকিষণ এক গ্লাস ভর্তি চা আমার হাতে দিল। রাম-কিষণের দরদ দেখে খুসী হ'লাম। উঠে গিয়ে গৌরীকে আর

একটা গ্লাসে অধিক ঢেলে দিলাম। গৌরী এক চুমুক খেয়ে বল্‌লে, এঃ, চা না ছাই। একেবারে জল। অনর্থক জলগুলি নষ্ট করেছেন। চা না খেলে মানুষ মরে না। কিন্তু জল না পেলে কি অবস্থা হবে? বললাম, কি হবে? না হয় মরবে। মরতে রাজী আছো তো? বল্‌লে, মেয়েরা মরতে ভয় করে না। তবে মরতে চায় না পুরুষদের মায়ায়। মেয়েরা মরলে পুরুষেরা বিপদে আপদে পথে ঘাটে ভয়ানক কষ্ট পায়। হেসে বললাম, বেশ চালাক হয়েছ দেখছি? ধর ধর, আর একটু নাও বলে' ওর গ্লাসটা চাইলাম। ওর গ্লাসটা সরিয়ে নিয়ে বল্‌লে, আর দরকার নেই। এই জল আপনিই খান। বলে' ওর গ্লাসটা এগিয়ে এনে আমার গ্লাসে একটু ঢেলে দিল। খুসী হয়ে হেসে বল্‌লাম, একি, তোমার মুখের চাগুলো আমার গ্লাসে দিলে? গৌরী হেসে মাথা নীচু করল। এক চুমুকে নিজের গ্লাসটা শেষ করে' চায়ের আগুনের ধারে এলাম। আগুনে গা গরম করে' বিছানায় বসে' আবার গল্প স্বুরু করে' দিলাম। গল্প-সল্প করে' রাত পোহানোর ইচ্ছা। সকলে মিলে ঘুমিয়ে পড়া ঠিক হবে না। প্রতি মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। রামকিষণ, বসির, শৈব, রামতনু এরা সব আগুন জ্বেলে রেখে বসে' বসে' আগুন পোহাচ্ছে। বলে' রেখেছি আগুন যেন নিভে না যায়। আলো রাখা দরকার। শুনেছি আলোর কাছে বন্যজন্তু আসতে ভয় পায়। কম্পাউণ্ডার-বাবু আর মেয়েরা ছাড়া আমাদের সকলের বিছানা মাটিতে। সকলেই শুয়ে শুয়ে গল্প কর্‌ছি। কিন্তু কথার

আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি সকলের। জোর করে' চোখের পাতা খুলে' রাখতে চেষ্টা করছি। চেয়ে দেখি সবার চোখ নীমিলিত। আগুনের কাছে যারা বসেছিল তারাও আগুনের ধারে মাটির ওপর শুয়ে পড়েছে। সকলে মিলে' ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। আমি leader। আমাকে জেগে থাকতে হবেই। কিন্তু চোখ দুটো সে কথা বুঝে না। আপনিই বুঁজে আসে। এমন সময় সুপোরী কাটার শব্দ শুনলাম। গৌরীর মা সুপোরী কাটছেন গাড়ীর ওপর বসে'। তাঁর সঙ্গে পান আছে। উঠে সেখানে গেলাম। বললেন, পান খাবেন? বললাম, দিতে পারেন একটা। ভয়ানক ঘুম পাচ্ছে। পান খেয়ে ঘুমটা ভেঙ্গে দিই। গৌরী শুয়ে পড়েছিল। হয়তো ঘুমোয়নি। আমার কথা শুনে' তাড়াতাড়ি উঠে বসল। মার কাছ থেকে একটা পান নিয়ে নিজেই সেজে দিল। বললে, শরীর খারাপ হবে রাত জাগলে, শীগ্‌গীর শুয়ে পড়ুন গিয়ে। বললাম, শুয়ে পড়লে চলবে কি করে? সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্তত একজনকে জেগে থেকে পাহারা দিতেই হবে। বললে, কিন্তু আপনি ঘুমোন গিয়ে, আমিই জেগে থাকবো।

এমন সময় ভীষণ শব্দে হাঁচতে হাঁচতে সমস্ত কাশবন আলোড়ন করে' কি এক ভয়ংকর জানোয়ার এ দিকে ছুটে আসছে। ভয়ে চীৎকার করতে করতে গৌরী আমাকে টেনে তাদের গাড়ীর ওপর তুলল। ওদিকে কম্পাউণ্ডারবাবু বাঘ বাঘ করে' ভয়-বিহ্বল আর্তকণ্ঠে রামকিষণ, বসির, নিতাই ও সুরেশকে ডাকাডাকি সুরু করে' দিলেন। কিন্তু রামকিষণের দল তখনো

চায়ের আগুনের পাশে ঘুমোচ্ছে। কম্পাউণ্ডারবাবুর চীৎকারে তাদের ঘুম ভাঙ্গলো। তারা লাফিয়ে উঠে কি হলো, কি হলো বলে' হৈ-চৈ করে' উঠল। কম্পাউণ্ডারবাবুর কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে। কেবল বল্‌তে লাগলেন, শীগ্‌গীর! বা······ঘ! তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো। রামকিষণ ওরা এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গাড়ীতে ঝুলানো গাড়োয়ানদের দা হাতে নিয়ে তৈরী হয়ে রইল। রামতনু নিবু নিবু আগুনটা দাউ দাউ করে' জ্বেলে' দিল। সে আগুনে চারিদিক আলোকিত হয়ে গেল। হাঁচতে হাঁচতে কাশবন থেকে বেরিয়ে এলো আমাদের গাড়ীর একটা গরু। নাকে জোঁক ঢুকেছে, তাই হাঁচছে আর ছুটোছুটি করছে। নিমিষের মধ্যে একটা কুরুক্ষেত্রের কাণ্ড হয়ে গেল। কম্পাউণ্ডারবাবু হাঁপিয়ে বললেন, তবু রক্ষা, গরুকে বাঘ ভেবেছি। ভুলে যদি সত্যিকারের বাঘকে গরু ভাবি আবার কখনো তবে সবাই মিলে' মারা যাবো—সে ভুল যেন আমাদের না হয়, সেদিকে সকলেই তোমরা লক্ষ্য রাখবে। তারপর আবার বললেন, গাড়োয়ান ব্যাটাদের কাণ্ড দেখলে? হারামজাদারা কি নির্ভয়ে ঘুমোচ্ছে! আমাদের এত বড় একটা বিপদ গেল, ব্যাটারা একটু উঠেও বস্‌ল না। আর ব্যাটাদের বিভীষণের মত চেহারা, কুম্ভকর্ণের মত ঘুম।

শকুন্তলাদি' এবার কম্পাউণ্ডারবাবুকে ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর বল্‌ছি। ব্যাটাদের কি গরজ পড়েছে তোমাদের সাহায্য করবার। তোমরা এতগুলি পুরুষ আছ কি জন্যে? তবু রক্ষে সত্যিকারের বাঘ নয়। নইলে তোমাদের অবস্থা যে কি হ'ত

ভেবে পাইনে। মনে করেছিলাম, এতগুলি পুরুষের কাছে একটা বাঘ সামান্য। এখন দেখছি এখানে পুরুষ কেউ' নেই। কম্পাউণ্ডারবাবু একেবারে চুপ।

শকুন্তলাদি'র কথায় ভয়ানক লজ্জা পেলাম। গৌরী আমাকে তাদের গাড়ীতে টেনে উঠিয়েছে সত্যি, কিন্তু আমি নিজেও থতমত খেয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নামতে চাইলে গৌরী বললে, বাঘের ভয় যখন নেই তখন পাহারা দেবারও প্রয়োজন নেই, তবে আর নামছেন কেন? এখানেই একটু বসুন। ওর মুখের দিকে চেয়ে হাসলাম। গৌরী বল্‌লে, ভারী দুষ্টু আপনি। মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছেন? অন্ধকার রাতে মুখ দেখা যায় কখনো?

হেসে বললাম, আমার চোখ সব সুস্পষ্ট দেখতে পায়। তারপর গৌরীর মার দিকে চেয়ে বললাম, ঘুমিয়ে পড়লেন না কি? কোন সাড়া নেই। বুড়োমানুষ যখন তখন ঘুম আসে। গৌরী বললে, মার শরীরটা ভাল নয়, ডাকবেন না। একটু ঘুমোক। বল্‌লাম, আর একটা পান খাওয়াবে? বল্‌লে, এইমাত্র পান খেলেন আবার কেন? বার বার পান খেলে দাঁত খারাপ হয়ে যাবে যে, আর খেতে পারবেন না। চুপ করে' আছি। বল্‌লে, একি রাগ করলেন? চুপ করে' রইলেন যে? আচ্ছা দিচ্ছি। হেসে ফেল্‌লাম। বললাম, রাগ করতে চেষ্টা করছিলাম। থাক পান খাব না। তোমার কথাই শুনব। গৌরী চুপ করে' থেকে কি যেন ভেবে নিল। পরে আবার একটু হেসে বল্‌লে, শুধু আমার কথা শুনলে এই দলের এতগুলো লোক ভাববে কি?

আপনি হ'লেন দলপতি, সকলের কথাই আপনার শুনতে হবে। ঐ চেয়ে দেখুন, নিতাই, বসির ওরা সব এদিকে চেয়ে যেন কি বল্‌ছে। এখন নেমে যান তো। দলপতির কাজ করুন গিয়ে। নিজের ও গৌরীর মান সম্মানের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে শান্তিদি'র গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, খোকা ঘুমোচ্ছে? শান্তিদি' বল্‌লেন, কোথায় ঘুমোচ্ছে। খোকা জ্বরে ছট্‌ফট্ করছে। এ ছেলে নিয়ে কি আর দেশে ফিরতে পারব। ভগবান শত্রুকেও যেন এমন বিপদে না ফেলেন। বললাম, ভাববেন না, ভগবানকে ডাকুন। আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না। ভাল করে' ঢেকেঢুকে রাখুন। আপনার পেট ব্যথাটা এখন কেমন? কমেছে একটু? বললেন, একটু কম। ঘুমোতে পারলে একেবারে কমে' যেতো। ছ'চোখের ঘুম একেবারে শুকিয়ে গেছে। শুনেছি দুঃখের দিনে আপনিই ছ'চোখ বুঁজে আসে। কিন্তু আমার ঘুম নেই। সর্বদা আপনাদের ডাক্তারবাবুর কথাই মনে পড়ে। উনি কেন যে আমাদের সঙ্গে এলেন না। আর কি আসতে পারবেন? জাপানীরা এসে দখল করলে আর পথ পাবেন না। মেরে কেটে শেষ করবে। বলে' ছ'চোখের জলে ভেঙ্গে পড়লেন। বললাম, আপনি এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। বৃথা চিন্তা করে' এখন নিজের শরীর খারাপ করবেন না। ডাক্তার-বাবু বুদ্ধিমান লোক। তিনি কখনো জাপানী গুণ্ডাদের হাতে পড়বেন না, আগেই পালাবেন।

পরদিন ভোর বেলা খুব সকালে গাড়ী ছাড়ল। চেয়ে দেখি, যে গরুটা রাত্রে বাঘ হয়েছিল আজ সকালে সে জেয়ালা

কাঁধে করে' আমারই গাড়ী টেনে আগে আগে চল্‌ছে। বাঘ হবার উপযুক্তই বটে। রাতের কাশবন পার হ'য়ে আবার এসে মাঠে পড়লাম। মাঠের তীরে তীরে অনেক দূরে গ্রাম দেখা গেল। গ্রামে লোকজন খুব কম বলেই মনে হলো। এখানে সেখানে দু'একটা পাতার ঘরের বস্তি। ঘাটে বা মাঠে কোন লোকের চিহ্ন দেখি না। সাধারণতঃ চাষীরা এ সময় ক্ষেতে কাজ কর্‌তে আসে। কিন্তু ক্ষেতের পর ক্ষেত লোকশূন্য দেখলাম। মাঝে মাঝে ক্ষেতগুলি আগাছায় ভরা। বন জঙ্গলে ভরে' উঠেছে। এমন দশবারো বছর চল্‌লে ক্ষেতগুলি একেবারে অরণ্যে পরিণত হবে। সোনার ধানক্ষেত হয়ে যাবে কণ্টাকাকীর্ণ বেতসের বন। উর্বরা মাটী হবে দুর্ভেদ্য অরণ্যপুরী, হিংস্র জন্তুর আবাস। যে দেশের লোক পরিশ্রম-বিমুখ সে দেশের ভবিষ্যৎ অরণ্য-বিভীষিকায় ভরা। সে দেশের মাটী মরুভূমির মরীচিকাময়।

নোয়া! নোয়া! গরুকে তাড়া দেবার ভাষা গাড়োয়ানের মুখে। রৌদ্রের উত্তাপ প্রখর হবার আগে যতটুকু যাওয়া যায়, এজন্য এত ব্যস্ততা গরু তাড়াবার। গরুগুলিও রাত্রে কাশবনে খেয়ে খেয়ে বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে। এখন দৌড়ে দৌড়ে হাঁটছে। পথ ভাল। মাঠের ওপর দিয়ে পরিষ্কার সোজা পথ। গরুগুলো একটানা ছুটছে। ওরা যেন বুঝতে পেরেছে, আমাদের পার করে' দিতে হবে সুদূর সুদীর্ঘ পথ। ওদের চরণের ওপর নির্ভর করছে আমাদের জীবন-মরণ। গাড়ীর ওপর পা ঝুলিয়ে দিয়ে আরামে বসে' আছি। ভাবছি, আজ এ

পথে-চলা-জীবনের সব থেকে বড় সাথী কে ? মন থেকে আপনি উত্তর এলো—কেউ নয়। একমাত্র শ্রেষ্ঠ সঙ্গী এই গরু দুটী। পিঠে করে' বয়ে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছে এই দুটী গরু। এরাই পরম বন্ধু।

আটখানা গাড়ী। কিন্তু আমরা লোক হয়েছি সবে মিলে জন পঁচিশ। গড়ে দু'জন করে' এক এক গাড়ীতে উঠে বসলে ষোল জনের বেশী ওঠা যায় না। কারণ মালপত্রেই সব গাড়ী বোঝাই। তা'ছাড়া গরুর কষ্ট দেখে দু'জনের বেশী ওঠাও উচিৎ না। আর উঠতে চাইলে গাড়োয়ানরা দা হাতে নিতে চায়। কেটে ফেলবে তা'হলে। বাধ্য হয়ে সর্বদা গাড়ীর সাথে হেঁটে চলতে হয় আট ন'জনের। বসির, শৈব, রামতনু, রামকিষণ ইত্যাদি এরা সব এখন হেঁটে চলছে। রামতনু হাঁটছে আর তামাক খাচ্ছে। ভোরবেলা একটু একটু শীত লাগছে। এ সময় তামাক খেতে নাকি বেশ মজা। জোরে একটা টান দিয়ে শেষে মাইল তিনেক রাস্তা অনায়াসে হাঁটা যায়। তামাকের উপকারিতা সম্বন্ধে রামতনু এই লেক্চার দিচ্ছে। এ উক্তিতে সকলেই হলো তার শিষ্য। অমনি হাতে হাতে হুঁকাটি ঘুরে বেড়াতে লাগল। রামতনু থেকে রামকিষণ, রামকিষণ থেকে বসির, বসির থেকে শৈব। গাড়ীর ওপর বসে' সব দেখছি। নিজের মনেও ভক্তি জন্মাল। বল্লাম, রামতনু, দাও দেখি হুঁকাটা —একটা টান দিয়ে দেখি। টান দিয়ে কাসতে সুরু করে' দিলাম। ফিরিয়ে হুঁকাটা রামতনুর হাতে দিয়ে বললাম, অভ্যেস নেই। রামতনু বললে, আস্তে আস্তে অভ্যাস করুন।

সিগারেট চুরুট ক'দিন যাবে? রাস্তায় হয়তো ফুরিয়ে যাবে, তখন? কিন্তু আমার সঙ্গে এক মাসের তামাক আছে। ফুরোবে না। অক্ষয় সাথী। যত খুসী খেতে পারবেন। পথের বন্ধু তামাক আর ঘরের বন্ধু স্ত্রী। দুটোই জীবনের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। রামতনুর সঙ্গে ইয়ারকি করাটা হয়তো ভদ্রতা এবং রুচিবিরুদ্ধ। কিন্তু যে পথে বের হয়েছি সে পথে মানুষকে শুধু আমার মতই একজন মানুষ বলে' মানতে শিখেছি। বসির, শৈব, রামতনু—এরা যে চাকরশ্রেণীর লোক সে প্রশ্ন আজ আর এ পথে নেই। ওরা আমাদেরই একজন। তাই রামতনুর কথা শুনে' হেসে বল্‌লাম, আমার তো কোনটাই নেই। রামতনু বললে, এ বড় ভাল কথা নয় বাবু। মস্ত বড় ভুল জীবনের। সে যাই হোক, পথে পথে তামাক খাবার অভ্যাস করে' নেবেন। কিন্তু বিয়েটা পথে পথে হ'তে পারে না। মঙ্গলমত দেশে গিয়ে সে কাজটাও সেরে ফেলবেন। পেছনের গাড়ী থেকে গৌরী রামতনুকে ধমকাল। পেছন ফিরে গৌরীর দিকে চেয়ে বললাম, থাক, চাকরবাকরের সঙ্গে আর ইয়ারকি দেব না।

বেলা আটটা বাজে। একটা বস্তির ভেতর দিয়ে গাড়ী চলছে। আমাদের কোলাহলে রাস্তা মুখরিত। সহসা আমার গাড়ীর গাড়োয়ান আমাদের সকলকে চুপ করে' থাকতে বললে। এ বস্তিটার লোকগুলি নাকি ডাকাত। পথিক পেলেই আক্রমণ করে। বর্মী গাড়োয়ানের সুবুদ্ধি দেখে খুসী হ'লাম। নিমিষের মধ্যে সকলের মুখে ধূলি-পড়া পড়্‌ল। নির্বাক নীরব সব।

ভয়ে ভয়ে নিঃশব্দে বস্তিটা পেরিয়ে এলাম। ডান দিকে চেয়ে দেখি কাষ্ঠনির্মিত প্রকাণ্ড প্যাগডা। প্রায় তিনশো ফুট উঁচু মাটির ঢিপির ওপর বুদ্ধ-মন্দির। চারদিকে চারটে কাঠের সিঁড়ি। মন্দিরে ওঠবার সোপান। সকলের আগে কম্পাউণ্ডার-বাবু দু' হাত তুলে' প্রণাম করলেন। বললেন, ঠাকুর, তোমার দয়া ভিক্ষা চাই। ঐ বস্তির ডাকাতগুলির হাত থেকে যে মুক্তি পেয়ে এলাম—এ শুধু তোমারই করুণায়। কিন্তু ঠাকুর, তোমার মন্দিরের পাশে থেকে মানুষ ডাকাত হয় কি করে'? কথা শুনে হেসে বল্‌লাম, কম্পাউণ্ডারবাবু, এও ভগবানের এক রহস্য। ভগবানের রাজ্যেই চলে যুদ্ধ-সংগ্রাম, বোমা মেসিনগান, ডাকাতি লুঠ্‌পাট্। কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, সে কি ভগবানের দোষ? তিনি দয়াময়। নিরাকার ব্রহ্ম। আমরা মানুষই হয়েছি পশু। নইলে যুদ্ধের কি দরকার দেশে।

এবার আমাদের পথ চলছে মাঠের ওপর সড়ক দিয়ে। প্রশস্ত সড়ক। অনায়াসে গরুর গাড়ী চলতে পারে। সড়ক দিয়ে টেলিগ্রাফের তার চলে' গেছে ব্রহ্মদেশ থেকে আমাদের ভারতবর্ষে। নিতাই দুরন্ত যুবক। টেলিগ্রাফের তারের পোষ্টে কাণ পেতে কি শুন্‌ছে। কম্পাউণ্ডারবাবু সেদিকে চেয়ে বল্‌লেন, ও কি কর্‌ছ নিতাই? নিতাই বল্‌লে, শোঁ শোঁ শব্দ শুন্‌ছি। কম্পাউণ্ডারবাবু মুখ বিকৃত করে' বল্‌লেন, যত সব পাগলের দল নিয়ে চল্‌ছি। আমাদের কি ঐ শোঁ শোঁ শব্দ শোনবার সময় এখন। ভালয় ভালয় দেশে পৌছতে পারলে বাঁচি। আর তুমি পাগলের মত তারের পোষ্টে শোঁ শোঁ শব্দ শুনছ। কম্পাউণ্ডার-

বাবুর কথা শুনে গৌরী হেসে মরে আর কি। শকুন্তলাদি' ধমক দিয়ে বল্‌লেন, চুপ কর বল্‌ছি। ছেলেপেলে পথেঘাটে এসব না করে' পারে না। এসব করে বলেই পথে চলার আনন্দ। তোমার মত বুড়ো তো আর সবাই নয়, কেবল বক্‌ বক্‌। কম্পাউণ্ডারবাবু একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন।

সড়ক দিয়ে কিছুদূর গিয়ে দেখলাম—রাস্তার ধারে বসে' কয়েকজন বর্মী মেয়ে কলা আর পান বিক্রী করছে। কলা দেখে ছেলেপেলেরা সব গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়তে চায়। ক্ষুধার জ্বালায় আমরা সকলেই নিপীড়িত। আর একটু এগিয়ে গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করব। কিন্তু ছেলেপেলে তো দূরের কথা কলা দেখে আমরাও যেন আরো ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলাম। নাপিত দেখলে চুল দাড়ি যেমন হঠাৎ বেড়ে যায়। পকেট ভর্তি খুচরা পয়সা। গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে গণ্ডা দশেক কলা কিনে সবাইকে বিতরণ করলাম। ছেলেপেলেরা সব আর একটা দিন, আর একটা দিন বলে' চীৎকার করতে লাগল। মনে হলো, যেন কাঙ্গালী ভোজন করাচ্ছি। গৌরী না চাইতেই তাকে দু'টো বেশী দিলাম। সে একটু হেসে বললে, ছিঃ, আমি কি ছেলেমানুষ, যে কলার জন্য চীৎকার করছি! ওরা দেখলে বলবে কি? বললাম, দেখবে আবার কে? লুকিয়ে দিলাম, কেউ দেখেনি। খেয়ে ফেল তাড়াতাড়ি। গৌরীর মা বললেন, বোকা মেয়ে। দাদা দিয়েছেন, এখন না খাস পরে খাবি, রেখে দে। গৌরী শেষে লজ্জায় চুপ করে' রইল। কিছু পানও কেনা হয়েছে। গৌরীর মা কলার চেয়ে পান খেতে বেশী

ভালবাসেন। বললেন, পান খেয়ে দু'দিন পর্যন্ত নাকি উপোস করা যায়। ভাত না খেলেও চলে।

মাঠের ওপর দিয়ে প্রায় মাইল দশেক যাওয়ার পর সামনে প্রকাণ্ড খাল পড়ল। সেটা পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। হাঁটু পরিমাণ জল। খালের ওপর দিয়ে একটা প্রকাণ্ড ইটের পুল। পুলের মুখে পুলিশ লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। পুলের ওপর দিয়ে যাবার নাকি নিষেধ আছে। একটা বাঁশের পোষ্টে প্রকাণ্ড একটা কার্ড ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার মধ্যে একটা মানুষ আঁকা। মানুষটি অঙ্গুলি নির্দেশে পুলের নীচে দিয়ে যাবার আদেশ করছে। কার্ডখানার এক পাশে আবার লেখা—রোড টু টাংগুব ফর কালা। মানে, হাঁটু জল ভেঙ্গে খাল পার হয়ে ওপারে যেতে হবে। এই কি ভারতীয়দের প্রতি আদেশ ? ঘৃণা ? অবহেলা ? অভিশাপ ? কার্ডে আঁকা মানুষটির অঙ্গুলি নির্দেশ উপেক্ষা করে' পুলের ওপর দিয়েই যাব বলে' এগিয়ে গেলাম কিন্তু জীবন্ত মানুষটি লাফিয়ে সমুখে এসে বাধা দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে খাল দেখিয়ে দিলে।

এ পুলের মুখে আমরা প্রায় চার পাঁচশো ভারতীয় ইভাকুইজ এসে একত্র হয়েছি। একত্র হবার কারণ আমাদের সকলেরই এই এক রাস্তা ভারতে পৌঁছাবার। এক রাস্তা ধরেই সকলে একদিন দু'দিন করে' অগ্রসর হচ্ছি ভারতের দিকে।

আমরা পথে যখন কোন গাছতলায় বসে বিশ্রাম করি তখন আমাদের পেছনের দল এসে আমাদের ছাড়িয়ে আগে চলে যায়। আবার তারা যখন কোন জায়গায় বসে বিশ্রাম করে,

বা রান্না করে' খাওয়া-দাওয়া করে, আমরা তখন তাদের ছাড়িয়ে আগে চলে যাই—অথবা তাদের সঙ্গে একত্র বসে রান্না করবার ব্যবস্থা করি। বিশেষ করে রাস্তা যেখানে বিপদ সংকুল সেখানে সকলে এক সঙ্গে বসে থেকে পেছনের দলের অপেক্ষা করি। উদ্দেশ্য সকলে মিলে পরামর্শ করে, এ বিপদ-সংকুল পথটা পার হওয়া যাবে। মরতে হয় সকলেই মরবো, বাঁচতে হয় সকলেই বাঁচবো। জীবনের মহাসত্যের আবিষ্কার করলাম আজ এ পথের যাত্রী হয়ে। মনে হলো সমাজ, সংসার, ও সভ্য-জগতের মানুষ চিরদিন একা। নিঃসঙ্গ পথিক। সবাই সেখানে নিজকে নিয়ে নিজে ব্যস্ত। সবাই নিজ নিজ স্বার্থ খুঁজে' অস্থির। কারো পানে কেউ ফিরে চায়না। সংসারে সে এসেছে একা, আবার তাকে যেতেও হবে একা। অসীম বিজন সংসার পথের পথিক সে। অন্তহীন কালের অতি পুরাতন পথিক সে। কিন্তু আজ এ পথে বার হয়ে দেখলাম—মানুষের সাথী মানুষ। পথ যেখানে ভয়াবহ বিপদ-সমাকীর্ণ, মৃত্যুধ্বনিতে মুখরিত, সেখানে ভারতবাসী-ই ভারতবাসীর জন্য বসে অপেক্ষা করছে পথের ধারে। কাজেই আজ এখানে কেউ একা নয়। সকলের সাথী সকলে!

এখানে আমরা চার পাঁচশো ইভাকুইজ এ খালের মুখে এসে একত্র হয়ে পার হবার জন্য বসে বসে পরামর্শ করছি। সংঘবদ্ধ যেন আমাদের সকলের প্রাণ; এ বিপদ-সংকুল পথের পাশে।

ভয়ানক খাড়া পাড়। নীচের দিকে চাইলে পা কাঁপে। পুলের ওপর বার বার চাইছি। কিন্তু পুলিশ যেতে দেবেনা।

একবার মনে হলো এতটুকু একটা লোক আমাদের এতগুলি লোকের পথে বাধা সৃষ্টি করছে? আমাদের এ চার পাঁচশো লোকের সমবেত শক্তি সামান্য একটা ছোকরা পুলিশের কাছে তুচ্ছ? ভেবে দেখলাম—তুচ্ছই বটে? ওর ঐ ছোট্ট লাঠি-খানার চুল-পরিমাণ প্রতিস্থানে ব্রিটিশ সরকারের অপরাজেয় অসীম শক্তি বিদ্যমান। কাজেই তুচ্ছ আমরা এতগুলি লোক এই স্বাস্থ্যহীন হাড়-বার-করা-পুলিশটার কাছে। বাধ্য হলাম নীচে নেমে খাল পার হয়ে যেতে। গাড়ী থেকে আমরা আগেই নেমে পড়েছি। মালকোঁচা দিয়ে কাপড় শক্ত করে পরেছি। পায়ে থেকে জুতা খুলে গাড়ীতে রেখেছি। ছেলেপেলে কোলে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছি। মেয়েরাও পায়ে থেকে বর্মীস্যানডেল্ খুলে' গাড়ীতে রেখেছে। কাপড়ের আঁচল কোমরে জড়িয়ে বেঁধে বীর ভারত রমণী সেজে পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার পঞ্চাশ ফুট উঁচু তীর থেকে নীচে নেমে খালটা পার হতে হবে। রামের সাগর মন্থনের কথা মনে পড়ল। আমরা যেন সেই রামেরই বংশধর। বীর বেশে আমরা যেন তাঁরই পদাংক অনুসরণ করছি। শকুন্তলাদি'র দিকে একবার চাইলাম। মনে হলো রাণী ভবানী। লজ্জানত বাংলার বধূ আজ লজ্জাহীনা, অনবগুণ্ঠিতা। সুদীর্ঘ রুক্ষ ঘন এলো কালো চুল পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত। সীঁথিমূল সিঁন্দুর সৌন্দর্য্যহীণ। কাঁধে ঝুলানো ক্যান্‌ভাসের ঝুলি। ঝুলিতে মূল্যবান সোণার গহনা। খান দুই ভাল শাড়ী। ছেলেপুলের কয়েকটা গরম জামা; আয়না চিরুণী আর একটা গামছা! এ ঝুলিটি তিনি

সাথে সাথেই রাখেন। ঝুলির ভিতরের সম্পত্তির মূল্য যেন জীবনের মূল্যের চেয়েও বেশী। গাড়ী উল্টে পড়ে ক্ষতি নেই, কিন্তু ঝুলি যেন উল্টে না পড়ে। পলাশ পুষ্পের মত রক্তরাঙা তার পরিহিত শাড়ীর রঙ। কোমরে দৃঢ়বদ্ধ শাড়ীর অঞ্চল। উন্নত শির। তেজোগর্ভ বক্ষস্থল, ভৈরবী। সম্ভ্রমে মাথা আপনিই নত হয়ে এলো তার দিকে চেয়ে। বাংলার কুলবধূর লজ্জানম্র পুষ্প-আননের মৌন সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ জ্যোঃতিরশ্মি কি তাহলে এমনি আবার বৈশাখী আকাশের মেঘমুক্ত জ্বলন্ত অরুণের মত ভয়ঙ্কর রূপ ধরে? বাংলার যে বধূকে দেখেছি বিশ্বের গোপন, ছায়া নিবিড় নীল পর্দ্দার আড়ালে পুরুষের শান্ত জীবন সঙ্গিনীরূপে, আজ তাকে আবার দেখলাম অনাবৃত বিশ্বের মাঝে; সংগ্রাম-পীড়িত আঙিনায়; উদাসিনী ভৈরবী বেশে পুরুষের পাশে দাঁড়াতে। নারীকে চিনলাম আজ শক্তিময়ী রূপে; জীবনের বীর-সঙ্গিনী বেশে।

ভয়ংকর খাড়া পাড়। আস্তে আস্তে নামছি। জ্বলন্ত শুভ্র বালুকারাশি পায়ের নীচে। বার বার পা পিছলে যাচ্ছে। পড়ে গেলে আর রক্ষা নাই। গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচে খালের জলে ডুবে যেতে হবে। সন্তর্পণে সাবধানে পা ফেলতে হবে। সহসা পেছন থেকে গৌরী বললে, আমাকে একটু ধরবেন? ভয়ানক ভয় করছে নামতে। পেছন ফিরে চেয়ে বললাম, ভয় কি? সবাই যেমন আস্তে আস্তে সাবধানে পা ফেলে কখনো সোজা হয়ে, কখনো উপুড় হয়ে মাটী ধরে নামছে, তুমিও তেমনি নাম। ভয় কি? আমি তোমার আগে

আগে নীচে আছি, পড়ে গেলে ধরে ফেলব। গৌরী নেমে আসতে লাগল আমার পেছনে পেছনে। কিছুক্ষণ পর গৌরী হঠাৎ পেছন থেকে ব্যস্ত ভীত কণ্ঠে বললে, পড়ে গেলাম। শীগগীর ধরুন, ধরুন। চমকে উঠে পেছনে চেয়ে দেখি—ঠিক সোজা দাঁড়িয়ে গৌরী হাসছে, পড়ে' যাবার কোন লক্ষণই নাই। চাইতেই হেসে বললে, পড়ে গেলে কি করতেন শুনি? বললাম, কেন, জড়িয়ে ধরে' পাঁজা কোলে তুলে খাল পার করে দিতাম। গৌরী লজ্জায় মাথা নীচু করে আস্তে বললে—ছিঃ।

কম্পাউণ্ডারবাবু আমাদের সকলের পেছনে। চেয়ে দেখি সে এখনো অনেক ওপরে। বসে বসে মাটী ধরে' ধীরে ধীরে নামছেন। নিজে নিজেই আবার বলছেন—হারামজাদা পুলিশ! পুলের ওপর দিয়ে যেতে দিলে না। জোরের মুল্লুক সব। অন্যায় অত্যাচার পথে ঘাটে পর্য্যন্ত। বুড়ো মানুষ; পড়েই যাই যদি! পা'তো অবিরত কাঁপছে। কম্পাউণ্ডার-বাবুর দিকে চেয়ে হাসি পেলো। পাশের শকুন্তলাদি'কে বললাম, দেখছেন কর্তার কাণ্ড! এমনি করে বসে বসে নামতে দুই ঘণ্টা লাগবে, এ খাল পার হতে'। শকুন্তলাদি' পেছন ফিরে ওপরে চেয়ে বললেন, আমার হয়েছে মরণ। তারপর সোজা আবার ওপরে উঠে গিয়ে কম্পাউণ্ডারবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে ধরে ধরে নামো। এভাবে কয়দিনে নামবে শুনি?

এ খাল পার হবার কোন রাস্তা নাই। একমাত্র

রাস্তা পুলের ওপর দিয়ে। কিন্তু সে পথ আমাদের বন্ধ। কাজেই আমরা শ'পাঁচেক লোক যেখান দিয়ে খুসী নেমে যাচ্ছি। কেউ সোজা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ একাত ওকাত হয়ে, কেহবা পা পিছলে প'ড়ে ধূলি ধূসরিত দেহে; কেউ নুয়ে পড়ে; আবার নিতাই, সুরেশ, বসির, ক্ষেত্র এরা সব দৌড়ে দৌড়ে। মনে হলো খালের সমস্ত তীর ভূমিতে যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। আর আমরা শ'পাঁচেক লোক বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গি করে, হেলে দুলে, আছাড় খেয়ে জীবন পন করে খাল পার হতে চলেছি।

গাড়ীর গরুগুলি পা সামলাতে না পেরে দৌড়ে নীচের দিকে কতখানি নেমে পড়ে। অমনি গাড়ীর ওপর থেকে আমাদের জীবনের সামান্য সর্ব্বস্ব মালপত্র সব ছিট্‌কে পড়ে যেতে লাগল। গাড়োয়ানদেরে শত চীৎকার করে মানা করতে লাগলাম—গরু আস্তে আস্তে নামাও। কিন্তু কার কথা কে শোনে? বাধ্য হয়ে সে সব পড়ে যাওয়া মাল নিজেরাই কাঁধে তুলে নিলাম। ধূলা বালিতে মালপত্র সব নষ্ট হয়ে গেল। গৌরীদের একটা সুট্‌কেশ পড়ে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে গৌরীর সামনে ধরে বললাল—ধর; মাথায় তুলে নাও। গৌরী সেটা ঠেলে আমার হাতে দিয়ে হেসে বললে—না, লজ্জা করে। বললাম, কেন লজ্জা কি? চেয়ে দেখ শকুন্তলাদি তাদের কাপড়ের এতবড় পুঁটলিটা মাথায় তুলে নিয়েছেন, আবার কাঁধে ঝুলছে তাঁর শান্-ব্যাগ। তোমার লজ্জা কি? ধর ধর। গৌরী তেমনি সুট্‌কেশটা আমার দিকে ঠেলে

দিয়ে বললে, শকুন্তলাদি'র যে উপায় নেই; দ্বিতীয় পক্ষের বুড়ো স্বামী। সে জন্য কাপড়ের পুঁটলি নিজেরই বইতে হয়। বলে' গৌরী জোর করে' স্যুটকেশটা আমার মাথায় তুলে দিল, বললে, নামুন এবার।

উপায় নেই; স্যুট্‌কেশটা মাথায় তুলে নিলাম। যখন খালের জলে এসে নামলাম; সামনে ওপরের দিকে চেয়ে দেখি পাড় ধ্ ধ্ করছে। আবার এতখানি ওপরে উঠতে হবে। হাঁটু পরিমাণ জল। হেঁটেই পার হওয়া যাবে। জলের মধ্যে এখন আমরা শ'পাঁচেক লোক দাঁড়িয়ে হাত মুখ ধুচ্ছি, শরীর জল দিয়ে ধুয়ে একটু পরিষ্কার হয়ে নিচ্ছি, পথের ধূলি মাখা মাথার রুক্ষ এলো খাড়া চুলগুলিতে জলের ছিটে দিয়ে একটু নরম করে নিচ্ছি। তারপর হাতের আঙ্গুল দিয়ে চিরুণীর কাজ করছি। এ ভাবে আমরা প্রত্যেকেই জংগলী মাথাগুলিকে একটু সুসভ্য করে নিতে লাগলাম।

কম্পাউণ্ডারবাবুর মাথা নাকি একটু গরম হয়ে উঠেছে। তিনি একটা গামছা ভিজিয়ে সেই ভিজে গামছাটা ভাঁজ করে' মাথার চুলহীন তালুর ওপর রেখে দিলেন। ঠাণ্ডা হোক মাথা। শকুন্তলাদির পিঠে ঝুলানো সুদীর্ঘ ঝড়ো এলোচুল। এতগুলি সুন্দর চুল এ ময়লা জলে ভিজানো ঠিক হবেনা। ভিজা গামছা দিয়ে মুছে ফেলা যাক। ভেবে কম্পাউণ্ডারবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—তোমার আবার তালুর মধ্যে হলো কি? গামছা মাথায় কেন? আমাকে একটু দাও। কম্পাউণ্ডারবাবু নি:শব্দে গামছাখানা মাথা থেকে তুলে শকুন্তলাদির হাতে

দিলেন। পরে আবার নিজে নিজেই বললেন, মাথা কি আমার ঠাণ্ডা হবার? বিপদ আমার চারিদিকে। কি কুক্ষণে পড়েছি জানেন একমাত্র ভগবান। শকুন্তলাদি কম্পাউণ্ডারবাবুর কথা লক্ষ্য না করে ভিজা গামছা দিয়ে চুলগুলি মুছে কালো কুচকুচে করে' শিথিল খোঁপা বেঁধে কাঁধের ঝুলিতে গামছাটা রেখে দিলেন।

জলের মধ্যে দাঁড়ানো শ'পাঁচেক লোকের মধ্যে আমরাই শুধু বাংগালী; আর সব অন্যান্য ইন্‌ডিয়ান্। কুলী মজুর-ই সব থেকে বেশী। তারা আবার এ ময়লা পচা জলে স্নান করে নিচ্ছে; সুসভ্য সমাজে এ জল ড্রেইন দিয়ে চলে, দুর্গন্ধময়। কিন্তু আজ সমাজ সংসারহীন আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা পথের ধারে এ জলই অমৃত। বিশ্ববিহীন যে জীবন, বিশ্ববিহীন যে যাত্রীর দল—অজানা সুদূরের পানে যাদের পথ সে পথের ধারে সুগন্ধ দুর্গন্ধ সবই সমান। এ পথের জীবন শুধু এগিয়ে চলার জীবন। পেছন ফিরে চাইবার সময় নাই। ভাল মন্দ বিচার করবার সময় নাই। শুধু এক প্রশ্ন সকলের সামনে--যেতে হবে বহুদূরে।

আমার পার্শ্বে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে গৌরী। বললাম, একি! তুমি হাত মুখ ধুয়ে নিলেনা? দাঁড়িয়ে আছ যে? গৌরী বললে—সুটকেশটা যে আমার হাতে দিয়ে নিজে পরিষ্কার হলেন সে কথা মনে নাই বুঝি। হাত যে আমার বন্ধ। বললাম, বেশ, এবার আমার কাছে দাও। শীগ্‌গীর হাত মুখ ধুয়ে ফেল। গৌরী আমার বুক পকেট থেকে রুমালখানা

টেনে নিয়ে জলে ভিজিয়ে হাত মুখ চুল মুছে নিল। বললাম, এবার চলো। রুমালখানা আমার বুক পকেটে গুঁজে রাখো! বললে, বেশ বুদ্ধি, ভিজা রুমাল বুক পকেটে রাখি আর অমনি ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করুক। বলে' নিজের চুলের খোপায় রুমাল-খানা বেঁধে রাখল। ওপরের দিকে চেয়ে দেখি গাড়োয়ানরা খাল পার হয়ে গরুসহ গাড়ী ওপরে ঠেলে তুলছে। ভয়ানক খাড়া উচু পাড়। গরু এক পা ওপরে ওঠে আবার দু'পা নীচে নেমে পড়ে। গাড়ীর মালপত্র সব নীচের দিকে ঝুলে পড়ে' এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। নীচে মাটীতে পড়ে যায় ভয়ে আমরা আবার মালগুলি পেছন থেকে ঠেলে ধরে রাখছি। কিন্তু সব থেকে ভয় গরু যদি পা পিছলে পড়ে তবে গাড়ীর পিছনে ঠেলে ধরা সব লোক মারা যাবে। কিন্তু গরুগুলি বুদ্ধিমান। সাবধানে পা ফেলে উঠছে।

মেয়েরা এবার যার যার ছেলেপুলে নিয়ে গরুর গাড়ীর রাস্তা থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে উঠছে। গাড়ী উল্টে গেলে যেন তারা গাড়ীর নীচে না পড়ে—এই ভয়ে। শকুন্তলাদি মেয়েদের দলে সকলের আগে। নিজের ছেলেপুলে নাই। বিপত্নীর একটি ছেলে তাঁর কোলে, ডান হাত ধরে' আর একটি। এ ছেলেটি একটু রোগা। মাঝে মাঝে হাটু ভেঙ্গে পড়ে যায়। জননীর স্নেহ শিথিল হয়ে আসে। ধমকদিয়ে জোরে টান দিয়ে তুলে দাঁড় করিয়ে দেন। বোবা কাঁন্না কেঁদে ক্লান্ত রুগ্ন শিশু আবার হাঁটে।

শেষে আমরা এসে তীরে উঠলাম। মনে হলো বাঁচলাম।

চেয়ে দেখি, আবার বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠ সম্মুখে। একধারে কয়েকঘর বর্মীর বাস। মাঠের মাঝে পথের ধারে বর্মী মেয়েরা হাঁট বসিয়েছে—চাল, ডাল, লংকা লবণ, আর কলা। ভারতীয় পথিকদের জন্য এ হাট। কিন্তু এ নিঃস্ব পথের তুলনায় এ হাটের জিনিষপত্র ভয়ানক দুমূ্ল্য। পায়ে হাটা মজুররা সামান্য চাল কিনে পুঁটলি বেঁধে আবার পথ ধরছে। আমাদের চাল ডাল ইত্যাদি সব সঙ্গেই ছিল, কয়েক আনার লবণ কিনে নিলাম। আর ছেলেদের জন্য কয়েক ছড়া কলা। ধানজমির মাঠ। ধান কাটা হয়ে গেছে। পড়ে আছে শুকনো খড়, হাঁটু পরিমাণ উচু, রৌদ্রে শুষ্ক শীর্ণ। একটা দিয়াশলায়ের কাঠি ধরিয়ে দিলে সমস্ত মাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আমরা একটা ক্ষেতে গাড়ী বাঁধলাম। বেলা তখন এগারোটা। ইচ্ছে রান্না করে' খেয়ে নেওয়া। দু'দিন যাবৎ সকলেই উপবাসী। কেবল মাঝে মাঝে চা চলছে। সবাই ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত অবসন্ন। তার মধ্যে এ খালটা পার হয়ে আসতে ক্ষুধাটা যেন আরো বেড়ে গেছে। কিন্তু সকলের মনে একই উদ্দেশ্য, যতক্ষণ না খেয়ে থাকা যায়; কারণ পথ অজানা, সুদীর্ঘ। কোথায় কতদিনে শেষ হবে কে জানে? এক বস্তা মাত্র চাল এনেছি। বেশী আনা অসম্ভব। শেষে চাল না থাকলে না খেয়ে মরব? কাজেই আমাদের সকলের ইচ্ছে যতক্ষণ না খেয়ে থাকা যায়, এবং যত কম করে খাওয়া যায়। পেটভরে কেউ খেতে পারবেনা এ পথে সেকথা আগেই বলে' রেখেছি। কিন্তু এখন এত ক্ষুধা পেয়েছে যে, না খেয়ে আর

পারছিনা। রামকিষণ, বসির, সুরেশ আর ক্ষেত্র চারজনে চারটা জলের টিন নিয়ে বস্তিতে জল আনতে গেল। শৈবকে পাঠালাম রান্নার কাঠ যোগাড় করতে।

গরুগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পেটের অগ্নিক্ষুধায় ক্ষেতের শুকনো খড় ব্যস্ত হয়ে খাচ্ছে। ভয়ানক রোদ। চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। দূরে রোদের তপ্ত মরীচিকা ছুটাছুটি করছে। আমরা গাড়ীর ছায়ায় ক্ষেতের মধ্যে খড়ের ওপর বসে আছি। আমি শুধু একা আমার গাড়ীর ওপর ছাতা মাথার দিয়ে বসে। ছাতাটা আমার নয়। আমার দারোয়ান রামকিষণের। গৌরীর মা বসে বসে পান খাচ্ছেন। বললাম, আমাকে একটা পান দিন; পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। জল নাই, পান খেয়ে গলটা একটু ঠাণ্ডা করি। গৌরী তাড়াতাড়ি মার হাত থেকে পানটা এনে আমায় দিলে। বললাম—ঐখানে রোদে বসেছিলে কেন? মাথা ধরে যদি রোদে? বরং এখানে আমার গাড়ীর ছায়ায় বস। কথাটা শুনে ও যেন খুসী হলো; বললে, বেশ বসি। শকুন্তলাদি কথাটা শুনতে পেয়ে বললেন, শুধু ওর মাথা ধরবে কেন? রৌদ্রে সকলেরই মাথা ধরতে পারে। দয়া করে আপনার ছাতাটা আমায় দিন; পুরুষ মানুষের আবার রোদ্ বৃষ্টি কিসের? পুরুষের পুরুষত্ব রৌদ্র বাদলের বাইরে। নিজের পৌরুষের অসম্মান হয় ভেবে তাড়াতাড়ি ছাতাটা শকুন্তলাদিকে দিলাম। শকুন্তলাদি ছাতা মাথায় দিয়ে ছেলেপুলে সব রৌদ্র থেকে নিজের কাছে টেনে এনে সকলের মাঝখানে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে ধানগাছের খড় দিয়ে বাঁশী

তৈরী করে ছেলেদের হাতে দিয়ে বললেন, বাজা। ছেলেরা মহানন্দে বাঁশী বাজাতে লাগল। এ পথে-চলা-জীবনের পথের ধারে বসে অকারণ পুলকে ক্ষণিক বাঁশী বাজিয়ে জীবনটা ক্ষণিক মধুর করে তোলার যে আনন্দ সেদিন শকুন্তলাদির কাছে পেলাম তা জীবনে অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। আমাদের চারিদিক ঘিরে অনন্ত বেদনা, ক্ষুধাচ্ছন্ন সারা দেহ। তৃষ্ণা-দগ্ধ বুক। রুক্ষ দীন চেহারা। নিরুদ্দেশ পথ। অন্তহীন দুশ্চিন্তা, অসীম মরণ যেন সম্মুখে। সর্ব্ব-আশ্রয়হীন পথিকের কাঙ্গাল বেশ। কোথায় পথ? কোথায় গতি? কোথায় জীবন? ইত্যাদি জটিল প্রশ্নে মন প্রাণ নুয়ে পড়ে। এমন দুঃখের দিনে এমনি করে' শুষ্ক খড়ের বাঁশী বাজিয়ে এ ক্ষণিক জীবনটাকে যদি এতটুকুও আনন্দ দেওয়া যায় তার মূল্য যে কত, আজিও তা ভেবে পাই না। মনে মনে শকুন্তলাদিকে নমস্কার জানালাম। নারীকে সে দিন চিনলাম আনন্দময়ীরূপে।

গৌরী আমার দিকে চেয়ে বললে, শুনছেন, শকুন্তলাদির মনে হয়তো প্রশ্ন জেগেছে। গাড়ী থেকে ঝুলে পড়ে উপুড় হয়ে নীচে গৌরীর দিকে চেয়ে বললাম—কি প্রশ্ন জেগেছে? চুপি চুপি বললে—এই ধরুন আপনি আমাকে একটু········। আর বলতে পারল না। মাথা গুঁজে রইল। বললাম, একটু কি? মাথা তুলে আমার দিকে চেয়ে হেসে একটা ধানের খড় টেনে ছিড়ে হাতে তুলে খড়টা খুঁটতে খুঁটতে বললে, আমাকে একটু আদর যত্ন করেন। রৌদ্র থেকে ডেকে এনে আপনার ছায়ায় বসালেন, বলেই আবার লাজ্জায় মাথা নীচু করে রইল। বললাম,

তাতে কি হয়েছে? আবার চোখ তুলে চেয়ে অভিমানের সুরে বললে—আমার বুঝি লজ্জা করে না? আরো একটু ঝুঁকে পড়ে' হাত বাড়িয়ে ওর গালে ছোট একটা টোকা দিয়ে বললাম—লজ্জাতো মনের মধ্যে বাস করে; কিন্তু গাল দুটো এত লাল হয়েছে কেন? রোদ একেবারে সহ্য হয়না বুঝি? আরও একটু এদিকে গাড়ীর ছায়ায় এগিয়ে বসো। গালে টোকা খেয়ে অমনি মাথা নীচু করল; আর আমার দিকে চোখ তুলে চাইতে পারল না। মাথা নীচু করেই আরো একটু এগিয়ে এসে বসল। বললাম—লজ্জা? কিসের লজ্জা? কাকে লজ্জা। আমরা কি এখন সমাজ সংসারের মানুষ; যে লজ্জা সরমের কথা ভাববো? আমরা এখন বাইরের মানুষ। এ পথের সম্বল শুধু প্রেম ভালবাসা, মানুষে মানুষে হৃদয়ের জানাশুনা। বলে' ওর গালে আর একটা টোকা দিলাম। এবার গৌরী চোখ তুলে চেয়ে বললে—ছি: শকুন্তলাদি এদিকে চেয়ে আছে। আপনি কি। হেসে বললাম—আমি যাই হই এবারতো চোখ তুলে চাইলে? তোমার চোখে যেন কত আলো। মনে হয়, এই পথে চলা জীবনের যেন আলোর স্বর্গ। গৌরী বললে—আপনি আর এদিকে ঝুকে পড়বেন না। এবার সোজা হয়ে বসুনতো। ন'লে আমি উঠে যাব কিন্তু! ছিঃ শকুন্তলাদি চেয়েই আছেন। সোজা হয়ে বসতেই জল আনতে যারা গিয়েছিল তারা এসে বললে—জল পাওয়া গেল না, বস্তিতে একটা পুকুরে সামান্য জল আছে; কিন্তু বস্তির লোক সে জল দিল না।

কথা শুনে আমাদের সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। পিপাসায়

শুষ্ক কণ্ঠ। ক্ষুধায় প্রাণ যায় যায়। ভাগ্যি কয়েক গণ্ডা কলা এখানে পাওয়া গেছে। তাই খেয়ে আবার পথ ধরলাম অবসন্ন দেহে। শকুন্তলাদি আমার ছাতাটা মাথায় দিয়েই সকলের আগে আগে হেটে চলেছেন, বললেন—এ রাস্তাটা বেশ বাঁধানো। হেটেই যাই। সেই মস্ত ঝুলিটা তার কাঁধেই আছে। চুলগুলি আবার কালো মেঘ হয়ে পিঠে উড়ছে। বুকের আঁচল তাঁর কোমরে শক্ত করে জড়ানো। অনাবৃত মুখ। পূর্ণ জ্যোতিঃ। তীক্ষ্ণ আঁখি; স্যানডেল পায়। শকুন্তলাদির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে আছি। অপরাহত জীবন-সঙ্গিনী ঐ বাংলার বধূরাই। জীবন সংগ্রামের পথে এরা শুধু নম্র নত সলজ্জ বধূ নয়—বিজন মরুপ্রান্তরে, পথ হারানো নিঃসঙ্গ পথের মাঝে মূর্তিময়ী জীবনের অধিশ্বরী হয়ে যেন পথ দেখিয়ে চলে আগে আগে, সর্ব বাঁধা বিঘ্ন ধুলিস্যাৎ করে' দুইচরণের ঘায়ে। নারীকে আজ চিনলাম পথের সঙ্গিনী রূপে।

মাইল দুই আসার পর হঠাৎ রাস্তার বাম পার্শ্বে করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলাম। চমকে চেয়ে দেখি পথের পাশে পড়ে আছে একটি মানুষ, মুমূর্ষু। বহ্নিময় রৌদ্রতপ্ত রাস্তার এক পার্শ্বে পড়ে ছট্‌ফট্ করছে। মনে হলো ক্ষুধায় আর পিপাসায় ওর দেহ শুকিয়ে গেছে। মরে গেছে ওর সকল অন্তর। শুধু প্রাণের মৃত্যুময় নিঃশ্বাসটুকু এখনো ক্ষীণ বইছে। জলের অনুসন্ধান করে' জানা গেল—সব টিনই খালি। এক ফোঁটাও জল নেই। পথের পার্শ্বে এই পিপাসিত বুকটিকে উপেক্ষা করে চলে এলাম। জল পেলে হয়তো লোকটা বাঁচতে পারত। নিজেদের

তৃষ্ণার্ত বুক কয়টি এ দৃশ্য দেখে ভয়ে যেন কেঁপে উঠল। যদি সামনে জল না পাই ?

প্রায় মাইল চার আসার পর বাঁ'দিকে একটু দূরে একটা উচু মাটীর ঢিপির কাছে কয়েকজন লোক রান্না করে খাচ্ছে, দেখতে পেলাম। বসিরকে বললাম—দেখে এসো জল আছে কি না ? বসির দেখে এসে বললে—হ্যাঁ, জল আছে। গাড়ী বেঁধে ওখানে রান্না করা যাক। হঠাৎ কম্‌পাউণ্ডারবাবু বলে উঠলেন—আমার বুকটা যেন কেমন করছে ; কিছু বলতে পারছিনা ; মনে হয় মরে যাব। শুনে কষ্ট হলো ; বুড়ো মানুষ ক্ষুধা পিপাসার জ্বালা কি সহ্য করতে পারবেন ? সারা জীবন কাটিয়ে এসেছেন—সুখ শান্তির মাঝে ; হঠাৎ এ প্রলয় পরিবর্তন সহ্য নাও হতে পারে। হয়তো হার্টফেল করবে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললাম—ভয় নেই কিছু। আপনি একটু চুপ করে বসুন। এখনি রান্না হবে।

রাস্তা ছেড়ে তিনচারখানা ক্ষেতের পর একটা কলগাছ, ক্ষেতের আইলের ওপর। গাছের তলায় ক্ষেতের মাটী খড়-পোড়ানো ছাইয়ে নিবিড় কালো। খালি পায়ে হাঁটলে পায়ের তলা কালীময় হয়ে উঠে। শত শত পায়ের চিহ্ন গাছতলায়। কালো ছাইয়ের ওপর পায়ের দাগ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে। ইটগুলি চারিদিকে পড়ে আছে। আমাদের আগে যারা এখানে রান্না করে খেয়ে গিয়েছে ; তাদের এ উনুন। এবং তাদের-ই পায়ের কালো চিহ্ন গাছতলায়। একটু দূরে একটা ভাঙ্গা পাটী। আর তুলো বার হয়ে পড়া ওয়াড়হীন একটা ময়লা ছেঁড়া বালিশ।

আর একটা ছেঁড়া কম্বল দেখে' শান্তিদি' তাঁর বুকের শিশুটিকে স্নেহকম্পিত উদ্বিগ্ন হস্তে জড়িয়ে ধরে' বল্লেন, সর্বনাশ! এখানে যেন কে মরেছে! দেখছেন না মড়ার বালিশ বিছানা! কি ভয়ংকর ব্যাপার! এখানে রান্না না করে' আর কোথাও করা যায় না? বল্লাম, আর কোথায় করব? চারদিকে তো শুক্‌নো খড়ের ক্ষেত। আগুন ধরলে উপায় আছে? মরেনি কেউ, ছেঁড়া বালিশ তাই ফেলে দিয়েছে। মরলে মড়াটা পড়ে' থাকতো নিশ্চয়ই।

শকুন্তলাদি' তাঁর কাঁধের ঝুলিটা কম্পাউণ্ডারবাবুর তত্ত্বাবধানে রেখে কোমরে বুকের আঁচলটা আরো একটু জোরে বেঁধে ভাঙ্গা উনুনটা সাজিয়ে নিতে নিতে বল্লেন, মৃতদেহ পড়ে' থাকলেই বা কি হ'ত? মরা মানুষের ভয় কি? সেতো মরেই গেছে। বলে' উনুনটা তৈরী করে' নিলেন। শান্তিদি' বল্লেন, কিন্তু এ উনুনে রান্না না করে' আর একটা উনুন তৈরী করে' নিলে হ'ত না? এ উনুনে হয়তো কুলীমজুররা নানা অখাদ্য রান্না করে' খেয়ে গেছে। শকুন্তলাদি' উনুনে আগুন জ্বালিয়ে, উনুনে আবার হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে' বল্লেন, কেন, কুলী মজুররা কি মানুষ নয়? তাদের ক্ষুধা কি আমাদের চেয়ে কম? শান্তিদি' চুপ করে' রইলেন। চায়লট্ থেকে আমরা পথে বেরিয়েছি আজ দশ বারোদিন। এর মধ্যেই ছেলেপেলেরা সব অস্থির হয়ে উঠেছে। এখন আর গাড়ীতে থাক্‌তে চায় না। গাড়ী এখানে বাঁধতেই সব নেমে পড়ল। জুতা পায়ে রাখতে চায় না, জামা খুলে' ফেলতে চায়। জোর করে' রাখতে গেলে কান্না সুরু করে'

দেয়। এই রৌদ্র-দগ্ধ ও ছায়াহীন উলঙ্গ মাঠের বুকে উলঙ্গ থাকতে চায়। সত্যের আবরণ নেই, নগ্ন সৌন্দর্যেই সত্যের আবিষ্কার। নগ্ন শিশুদের আজ সত্যই সুন্দর দেখলাম। গাড়ী থেকে খালি পায়ে, খালি দেহে নেমে পড়ে' উনুনের ধারে এসে সব ভিড় করে' দাঁড়াল। মাথার ওপর প্রখর সূর্য, নীচে এই উনুনের আগুন, ছেলেপেলে সব গরমে সিদ্ধ হয়ে উঠছে, তবু উনুনের ধারে দাঁড়াবেই। শকুন্তলাদি' বকুনি দেয় কিন্তু সরে না। শেষে হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেন, কিন্তু পেটের ক্ষুধা-বহ্নি এতো প্রখর যে ভাতের আশায় উনুনের হাঁড়ির দিকে চেয়ে থেকে উনুনের ধারে আবার এসে দাঁড়ায়। ঘামে ধূলোতে বালিতে আর ক্ষেতে পোড়ানো খড়ের কালিতে ছেলেপেলেরা সব নিমিষের মধ্যে ভূত হয়ে' উঠ্‌ল। নিকটেই একটা উঁচু মাটির ঢিপি। আর একটা কূয়ো। ছেলেদের নিয়ে হাত মুখ ধুতে আর সম্ভব হ'লে স্নান করতে গেলাম। কূয়োর জলে মাথা নীচু করে' চেয়ে দেখি, ওরে বাবা! জল প্রায় পঁচিশ হাত নীচে। ছেলেরা নিরাশ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। উপায়? জল তোলা যায় কি করে? রামকিষণ বুদ্ধিমান। তাড়াতাড়ি একটা বিছানা-বাঁধা দড়ি খুলে' নিয়ে এলো। দড়িটা চায়ের কেট্‌লীর গলায় বেঁধে জল তুলে' দিতে লাগ্‌ল। স্নান তো পরের কথা, আগে সকলে মিলে কেট্‌লীতে করে' জল খেলাম প্রাণ পুরে'। তারপর কোন রকমে হাতমুখ আর মাথাটা ধুয়ে, ধূলো কালি মাখা ভূতের দেহ ক'টিকে একটু মনুষ্য দেহোপযোগী করে নিলাম। কম্পাউণ্ডারবাবুর মাথায় দশবারো কেট্‌লী জল ঢেলে দিয়ে রামকিষণ

বল্‌লে, এখন মাথাটা ভাল করে' মুছে' গাড়ীর ওপর চুপ করে' বসুন গিয়ে। খাওয়া-দাওয়া করলেই শরীর একটু ভাল লাগবে। ভাবনা করবেন না বাবু, ঠিক ঠিক দেশে পৌঁছে যাব। কম্পাউণ্ডার-বাবু ম্লান কণ্ঠে বল্‌লেন, তুমি সঙ্গে না থাকলে মারাই যেতাম। তবে স্নান করতে পারলেই সব থেকে ভাল হ'ত। কিন্তু পরণের কাপড় মাত্র একখানা, ভেজালে পরব কি? থাক, ওসব হাঙ্গামার প্রয়োজন নেই। মাথাটাতো একটু ঠাণ্ডা হয়েছে।

গৌরী কাছে এসে একটু হেসে দাঁড়াল, বল্‌লে, আমাকে এক কেট্‌লী জল দেবেন? মাথাটা একটু ধোব। বল্‌লাম, ঐ রামকিষণ জল দিচ্ছে, ওকে বল জল তুলে' দিতে। রামকিষণকে কিছু না বলে' গৌরী আমার কাছেই চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম ও আমার হাতে তোলা জল চায়। কেট্‌লী করে' জল তুলে' বল্‌লাম, মাথা নীচু কর, ঢেলে দিচ্ছি। উপুড় হ'য়ে দেড়হাত লম্বা এলোচুল সহ ওর মাথাটা আমার হাতের সামনে নীচু করে' বল্‌লে, ঢালুন। বাঁ হাতে মাথাটা ঠিক করে' ধরে' ডান হাত দিয়ে কেট্‌লী হ'তে জল ঢাললাম। বল্‌লাম, বেশ এবার মাথা মুছে' চুপ করে' বস গিয়ে। ওর কাছে আমার সেই খালের রুমালখানা আছে। তাই দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে চলে গেল।

এবার শকুন্তলাদির' পালা। তিনি রান্নার ভার শান্তিদি'র হাতে দিয়ে একখানা বাংলাসাবান ও কয়েকখানা ময়লা জামা হাতে নিয়ে স্নান করতে গেলেন। দেখে হেসে বল্‌লাম, একি শহরের বাথরুম? কল ছেড়ে যত খুসী জল ঢেলে কাপড় কাচ্‌বেন। তা ছাড়া জামা আছড়াবেন কিসে? কূয়োর পার

সব কাঁচা মাটী। হ্যাঁ, তবে একটা পাথরের টুক্‌রো আছে, তার মধ্যে যদি পারেন। বল্‌লেন, বেশ ঐ পাথরেই আমার কাজ চল্‌বে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ডাল আর ভাত রান্না হলো। মানে, কোন রকম ডা'লে আর চা'লে একত্র মিশিয়ে আধ সিদ্ধ করে' নামানো হলো। পেটে পেটে দুর্ভিক্ষ। ভাত সিদ্ধ আর অসিদ্ধ। পাডাং থেকে এ পর্যন্ত পেটে মোটেই ভাত পড়েনি। কেবল দু'বার মাত্র চা খাওয়া হয়েছে। কাজেই ক্ষুধার জ্বালায় সবাই অস্থির। এদিকে মাথার ওপরে রৌদ্র খাঁ খাঁ করে' জ্বল্‌ছে। চারিদিকে যেন রোদের আগুন লেগেছে। সেই আগুনের তেজে গা পুড়ে' যাচ্ছে। মাথার ওপরে কুলগাছটার পাতা রোদে শুকিয়ে গেছে। কাজেই রোদের আগুনে আর পেটের ক্ষুধার আগুনে আমাদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সুদূর বাংলাদেশের ছায়া-শীতল শান্তির নীড়, ঘর বাড়ীর কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল দেশের বাড়ীর সেই পত্রঘন ছোট আমগাছটীর নীচে ছোট রান্না ঘরটির কথা। বাড়ীর নিভৃত কোণে যেখানে বসে' মা গৃহের লক্ষ্মীবধূ হ'য়ে সকলের অন্ন রচনা করতেন ঘোম্‌টাটানা লজ্জানত মুখে, কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে। রান্নার পর কত যত্নে কত স্নেহে আমাদের কোলে তুলে' নিয়ে খাওয়াতেন। আর আজ এখানে দেখলাম, রন্ধনশালা, অনলবর্ষী উন্মুক্ত আকাশের তলে। ধূলি আচ্ছন্ন জনমানবহীন প্রান্তরের বক্ষে, পথের পাশে পত্রহীন একটা কুলগাছের নীচে, জলাশয়হীন মরুপ্রান্তে, খড় পোড়ানো কালো মাটির বুকে; ছেঁড়া পাটী, ছেঁড়া

কম্বল, ছেঁড়া বালিশের পাশে; জীবনের জীবন্ত শ্মশানের ওপর যেন।

আর দেখলাম, রন্ধনরত এ কুলবধূ ক'টি, শকুন্তলাদি', শান্তিদি আর গৌরীর মা। রুক্ষ দীন বেশ। অনাবৃত শিরোদেশ; এলোমেলো কেশের-অরণ্যজাল; সীঁথিমূল সিঁদুর-হীন: তপস্বিনীর মত উদাসিনী বেশ। রাশীকৃত আবর্জনা অন্ধকারে বসে' রান্না করছেন নির্লিপ্ত মনে, ঘৃণা-ভয়-লজ্জা-দ্বিধা-শংকাহীন প্রাণে। দেখলাম, বাংলার কুলবধূর কষ্টসহিষ্ণু অন্তরের সুন্দর ছবি।

এক হাঁড়ি ভাত রান্না হয়েছে। একটা কাপড়ের ন্যাক্‌ড়া মাটিতে পেতে ভাতগুলি তার ওপর ঢেলে রাখা হয়েছে। চারিদিকের ধূলো বালি কালি যত খুসী তার ওপর এসে পড়ছে। ছেলেপেলেগুলি সেই ভাতের ন্যাক্‌ড়াটার চারদিক ঘিরে' বসে' আছে—বুভুক্ষিত চোখ মুখ। সে যে কি করুণ কাতর মর্মভেদী দৃশ্য—চোখে না দেখলে বুঝানো যায় না। শান্তিদি' আগে একটি টিনের বাসন করে' এক থালা ভাত আমাকে দিয়ে বল্‌লেন, তাড়াতাড়ি খেয়ে থালাটা দিন। থালা আর দু'একখানা যা আছে তাও শকুন্তলাদি'র বাক্সে। তাঁর স্নান করা এখনো হয়নি। তিনি এলে পর থালা বার করে' দিলে ছেলেদের খেতে দেব। কাজেই আপনি আগে খেয়ে নিন। চেয়ে দেখি, ছেলেরা সব আমার থালাটার দিকে চেয়ে আছে; ক্ষুধা-ক্লিষ্ট-বিষণ্ণ মুখ। চোখের চাহনিতে ক্ষুধার জ্বালা দাউ দাউ করে' জ্বল্‌ছে। থালাটা ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লাম, এ ভাত

আগে ছেলেদের খেতে দিন, পরে আমি খাব। সেই প্রোম নদীতে ভাত খাওয়া হয়েছে তারপর এই ভাত, আজ প্রায় দু'দিন। শীগগীর ছেলেদের আগে খেতে দিন। থালাখানা ফিরিয়ে ক্ষেতের কালিময় মাটির ওপর রেখে ওর মুখে এক গ্রাস, তার মুখে এক গ্রাস, এমনি করে' সকলকে এক সঙ্গে খাইয়ে দিলেন।

শকুন্তলাদি' জামা কেঁচে শুধু মাথা ধুয়ে এলে কম্পাউণ্ডার-বাবু বল্‌লেন, একি বাড়ীঘর পেয়েছ? সাবান মেখে স্নান করার তোমার এই সময়? শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, কেন, সময়টা কি খারাপ হলো, শুনি? পথে বেরিয়েছি, এ পথের পাশেই আমাদের বাড়ীঘর, পুকুর,। বাসন মাজা, কাপড় কাঁচা সব করে' নিতে হবে এই পথে পথে। দুঃখকে আমল দিতে নেই। হেসে খেলে সাবান মেখে স্নান করে' রান্নাবান্না করে' খেয়ে, ঘর সংসার করতে করতে চল্‌তে হবে পথে। হেসে বল্‌লাম, কিন্তু দেখছি স্নান করা হয়নি? রাগ করে' বল্‌লেন, আপনারাই তো সব জল তুলে ফেলেছেন, এখন সামান্য জল যা আছে তাও কাদা মাখা। তাই শুধু মাথা ধুয়ে জামা কেঁচে এলাম।

কম্পাউণ্ডারবাবু বল্‌লেন, ভাগ্যে জলের টিনগুলি আগেই ভরা হয়েছে। এরপর আবার কোথায় জল পাওয়া যাবে কে জানে?

শকুন্তলাদি' তাঁর বাক্স থেকে দু'খানা থালা বার করে' দিলেন। এ দু'খানাই তাঁর সঙ্গে ছিল। আমরা এক একবারে তিনজন করে' খাওয়া শেষ করতে করতে বেলা চারটে বেজে গেল। গাড়োয়ানরা এর মধ্যেই খাওয়া দাওয়া শেষ করে' গাড়ীতে গরু বেঁধে

তৈরী হ'য়ে বসে আছে। আমরা আবার রওনা হ'লাম। এখনো মাথার ওপর দারুণ রোদ। দু'দিন পর ভাত খাওয়ায় সর্ব দেহ যেন শিথিল হয়ে আসছে। বিপুল অবসাদ পায়ের তলে; কেউ আর হাঁটতে চায় না। প্রায় সকলেই গাড়ীর ওপর উঠে বসলাম। ভৃত্য ক'জন বাদে। গাড়োয়ানরা অনেক নিষেধ করলো। ঝগড়া জুড়ে দিল, গাড়ীতে এত লোক বসতে দেবে না। কিন্তু আমরা তবু জোর করেই গাড়ীতে বসে' রইলাম। বল্‌লাম, রোদটা আর একটু কমলেই আবার হেঁটে যাব।

প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে দেখি, সবাই গাড়ীতে বসে' বসে' ঝিমোচ্ছে। একজনের ওপর আর একজন ঢুলে' পড়ছে। যেই গাড়ীর ঝাঁকুনি লাগে অমনি আবার চোখ কচ্‌লিয়ে চোখের জড়তা ঘুচিয়ে সোজা হয়ে বসে। রাস্তা যেন এখন ক্রমেই ঘন ঘন উঁচু নীচু স্থান দিয়ে চল্‌ছে, কাজেই গাড়ীর ঝাঁকুনি ঘন ঘন লাগছে। ছেলেপেলেদের জন্যই সব থেকে বেশী ভয়। গাড়ী থেকে পড়ে' না যায়। মেয়েরা নিজ নিজ ছেলেদের শক্ত করে' ধরে' বসে আছে। মনে করলাম, আর একটু গেলেই হয়তো ভাল রাস্তায় পড়ব। কিন্তু আরো প্রায় মাইল পাঁচেক এগিয়ে দেখি রাস্তা ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠ্‌ছে। ছোট্ট একটা মাটির ঢিপি। তার ওপর দিয়ে রাস্তা উঠে আবার নীচে সমতলভূমিতে গড়িয়ে পড়ছে। নামতেই বাঁদিকে মাটির ঢিপির গায়ে শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তি। সকলে মিলে' গাড়ীতে বসে' বসেই হাত তুলে' প্রণাম জানালাম। কম্পাউণ্ডারবাবু গাড়ী থেকে নেমে মূর্তির চরণতলে মাথা ঠেকিয়ে বলতে লাগলেন, ঠাকুর, তুমি যে

বাণী নিয়ে ধরায় এসেছ, তা কখনো ব্যর্থ হয়নি। সে বাণী আজ ব্রহ্মে, জাপানে, চীনে সর্বত্র বর্তমান। আমরাও তোমার সেই অহিংসাব্রত অবলম্বন করে' সুদূরের পথযাত্রী হয়েছি। তোমার বাণী যেন সারা পথে আমাদেরে সাহসী ও শক্তিশালী করে' রাখে। তারপর আমাদের দিকে চেয়ে আবার বল্‌লেন, আমাদের যাত্রা হবে নিশ্চয় সুফল। ঠাকুর দর্শন কখনো বিফল হয় না।

রৌদ্রের তেজ এখন প্রায় কমে' এসেছে। গাছের আগায় শুক্‌নো ডালের ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্রের ঝিলিক্ এখনো জ্বল্‌ছে। সামনের সমতলভূমিটা পেরিয়ে এসে আমরা একটা জলের নালায় পৌছালাম। নালাটায় হাঁটু পরিমাণ জল। হেঁটে পার হয়ে এসে সমুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! সহসা বুকের তলটা শিউরে উঠ্‌লো। ভয়ে ত্রাসে ও মূর্তিমান বিভীষিকায় ভরে' উঠ্‌ল মন। এক ভয়াবহ চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হলো। সামনেই দেখি উত্তুঙ্গ পর্বত, কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত গভীর অরণ্য-আচ্ছাদিত হ'য়ে আমাদের সমুখে দাঁড়িয়ে। অতি পুরাতন বৃক্ষশ্রেণী নিবিড় ঘন অরণ্যের সৃষ্টি ক'রে আমাদের ভয়-বিহবল চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। বিশাল তরুশ্রেণী, পত্রহীন; শুষ্ক জীর্ণ শীর্ণ শাখা-প্রশাখা চারিদিকে প্রসারিত করে' দাঁড়িয়ে রয়েছে নগ্ন কংকাল, ভয়ংকর মূর্তির মত। একি! এ কোন স্বপ্নাতীত রাজ্যে এসে পৌঁছালাম! এ কোন কল্পনা বহির্ভূত নাম-না-জানা দেশ! স্নিগ্ধ শান্ত সৃষ্টি-সৌন্দর্য বক্ষে এ কোন বিষাদ ভয়ংকর সৃষ্টি! সুন্দর বিশ্ব-সৃষ্টির মাঝে এ কোন প্রলয় উন্মাদনা! এ কোন রুদ্রলীলার উৎচ্ছৃখল কঠোর নির্দয়

উচ্ছ্বাস! শুধু উত্তুঙ্গ তুরারোহ কঠিন প্রস্তরময় পর্বতশ্রেণী! ঘন অরণ্যের-লতাগুল্ম সব শুষ্ক, রৌদ্রদগ্ধ, সর্বরসহীন! শুধু উলংগ মৌন স্তব্ধ বিশাল ভয়ংকর পর্বত। বিশ্বপ্রকৃতির রসময় মূর্তির কাছে পুষ্পপত্র বিভূষিত সরস সৌন্দর্যের বুকে এ কোন মরুময় জ্বালাময় উত্তপ্ত অভিনয়? বিশ্বের বিপুল আনন্দময় রূপের কাছে এ কোন নিরানন্দ, শ্মশান সদৃশ প্রলয়ের ভস্ম-বহ্নি! সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ছায়া-শীতল বাংলা দেশে বাস করে' এসেছি। ঘন অরণ্য পাহাড় পর্বতের কথা পড়েছি বইয়ে। পড়ে' আনন্দে মন প্রাণ ভরে' উঠেছে। ভেবেছি, গিরিশ্রেণী দেখতে না জানি কত সুন্দর। কিন্তু সেই গিরিশ্রেণীর যে এমনি ভয়ংকর চিত্ত বিদীর্ণকর চেহারা তা কোনদিন ভাবতে পারিনি। বৎসর-ব্যাপী অরুণের জ্বলন্ত রৌদ্রতাপে সমস্ত বৃক্ষলতা, গুল্ম, তৃণ পত্র পুড়ে' যেন ছাই হয়ে গেছে। শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে নগ্ন দগ্ধ বৃক্ষশ্রেণী, শুক্‌নো অট্টহাসিতে সমস্ত গিরিবন রোমাঞ্চিত করে'। মনে হলো; শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামল প্রকৃতি এখানে এসে তার শ্মশানবাসিনী রূপ ধরেছে!

সকলেই আমরা স্তব্ধ নেত্রে, নির্বাক মুখে, নিস্পন্দ বুকে সম্মুখের এ দৃশ্য দেখলাম। প্রত্যেকের দিকে প্রত্যেকে নীরব চোখ তুলে' চাইলাম। বিষাদ-মলিন মুখ সবার। সকলের মনেই নীরব প্রশ্ন—এ পথে যেতে হবে? এ পথে মানুষ যায়? উত্তর এলো, মানুষ হয়তো যায় না। কিন্তু ভারতীয় ইভাকুইজ-দের জন্য এই একমাত্র পথ। নিরাশ্রয় গৃহহীন পথের পথিক যারা, তাদের জন্য আর পথ নেই।

এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সম্মুখের ঐ পাহাড়টার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, বহুদূরে আর একটা পাহাড়ের গায় চাঁদ হেলান দিয়ে হাসছে। ভাবলাম, এ মরু-গিরিরাজ্যে আবার আনন্দের হাসি কেন ?

এখান থেকে পথ খাড়া হয়ে পাহাড়ের দিকে উঠেছে। পথের ঠিক এ স্থানে পায়ে হেঁটে-আসা শত শত লোক এসে জমা হয়েছে। ইচ্ছা ; সকলেই একসঙ্গে যাবে। এ সব লোক পেছনের জলের নালাটার তীরে বসে' রান্না করে' খেয়ে বিশ্রাম করছিল। এখন সব একত্র রওনা হবে। পাহাড়ী পথে চলা সকলেরই এই প্রথম। অজানা অনিশ্চিত পথ। বন্যজন্তু যে না আছে এমন কথা বলা যায় না। কাজেই সকলে মিলে' একত্র গেলেই সব থেকে ভাল। আমারও এখন সকলের সঙ্গে একত্র হলাম। পায়ে হেঁটে যারা চলেছে তারা কেহ কেহ আগে আগে হাঁটছে আর কেহ কেহ আমাদের গাড়ীর দু' পাশে। আবার কেহ গাড়ীর পেছনে পেছনে হাঁটছে। এ ভাবে সকলে মিলে আবার পথ ধরলাম। ঠিক যেখান থেকে পথটা আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে ওপরের দিকে উঠেছে—সেখানে গাড়ী থামিয়ে আমরা পুরুষেরা সব গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। পেছন থেকে গাড়ী নাকি ঠেলে ধরতে হবে। মেয়েরা ছেলেদের নিয়ে গাড়ীর ওপরেই রইল। এখান থেকেই নাকি পার্বত্য পথ সুরু হলো। একশো বিশ মাইল এ পার্বত্য পথ। ভয়ে আতংকে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। মনে হলো, দরকার নেই, ফিরে যাই আবার রেংগুন। বোমায় মৃত্যু বরং এ পথে-

চলা-মৃত্যুর চেয়ে অনেক ভাল। কি ভয়ংকর কথা। এ দুর্ভেদ্য পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে একশো বিশ মাইল! কতদিনে? এতদিন কি বেঁচে থাকতে পারবো। এ জটিল পথ। এক পাশেই উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী, অপর পাশে গভীর গিরি-গহবর। মাঝখান দিয়ে এতটুকু সরু পথ? মাত্র একখানা গাড়ী অতি সাবধানে আস্তে আস্তে এগোতে পারে—এতটুকু প্রশস্ত! গরুর পক্ষে কি তা সম্ভব এত সাবধানে চলা? গরুর কি সে বুদ্ধি আছে যে, পা অতি সাবধানে ফেলতে হবে? পা একটু বিপথে পড়লেই গাড়ী সমেত সকল লোক একেবারে ঐ গিরি-গুহায়! অনিবার্য্য মৃত্যু। সর্ব্ব অঙ্গ ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমার গাড়ী সকলের আগে। আমি এখন হেঁটে চল্‌ছি। গাড়ীর ঠিক আগে, পায়ে হাঁটার দল। এ দলে প্রায় দু'শো লোক হবে। সব কুলীমজুর আর চট্টগ্রামের মুসলমান। সঙ্গে নানা রঙয়ের টিনের ছোট স্যুট্‌কেশ—কেউ মাথায়, কেউ কাঁধে বয়ে' নিয়ে চল্‌ছে। কারো মাথায় আবার ছেঁড়া ময়লা বিছানার পুঁট্‌লি। এ যেন গরীব কাঙ্গালের অজানা পাহাড়-অরণ্য-পথে নিঃস্ব মৃত্যুযাত্রা। সহসা আমার আগের লোকগুলো একস্থানে দাঁড়িয়ে ভীতি-বিহ্বল চোখে পথের পাশে চেয়ে কি দেখছে। ভাবলাম, হয়তো সাপ পথে পড়ে' আছে। দেখে, তারা আবার পথ ধরল। সাহস আমার মোটেই নেই। যা ছিল তাও পথের এই ভয়ংকর চেহারা দেখে এতটুকু হয়ে গেছে। ভয় শুধু মরণের। এ পথে মরতে আমি কিছুতেই রাজী নই।

দেশে গিয়ে মরি কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এমন বিশ্ববিহীন ঘন অরণ্য ভরা নির্জন গিরিপথে মরতে কে চায়? আপনজনহীন বিভীষিকাময় এ নির্দয় পথে মরার চেয়ে দুঃখ আর নেই।

পেছন থেকে গৌরী ডেকে বল্‌লো, অশোকদা, আপনি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বসুন। সামনে বোধ হয় সাপ পড়ে' আছে। নইলে ওরা এতক্ষণ চেয়ে চেয়ে কি দেখ্‌ল। শীগগীর গাড়ীতে উঠুন। মায়ায় ভরা গৌরীর কণ্ঠস্বর প্রাণে গিয়ে পশল। ওর কথা রাখলাম। গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ী ঐ স্থানে গিয়ে পেঁছিতেই পথের পাশে চেয়ে সমস্ত শরীর আতংকে কেঁপে' উঠ্‌ল। একি ভয়ংকর দৃশ্য! মানুষ! মড়া! এ পথের দু'জন ইভাকুইজ্‌। অনাবৃত সমস্ত দেহ। একটা বাঁশ ঝোঁপের নীচে পড়ে রয়েছে। পাশে খান দুই ছেঁড়া ধুতি। মনে হ'ল সদ্যমৃত। অনাহারে।

মৃতদেহ অনেক দেখেছি, নিজের ঘরে নিজের বাড়ীতে। নিজের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে। দেখেছি মরে-যাওয়া মানুষের প্রতিও আমাদের অনেক কর্তব্য কাজ থাকে। মৃত-দেহকে আমরা পবিত্র দেহ মনে করে' সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে কত শ্রদ্ধা করে' তার শেষ কাজ সমাধা করি। কিন্তু ঐ মৃতদেহ অসীম ব্যথায় ভরা। লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, তুচ্ছ। আত্মীয়-স্বজন বিবর্জিত বিজন গিরি অরণ্যের ধারে উপেক্ষায় নিপতিত। এ মৃতদেহ যেন শৃগাল কুকুরের মৃতদেহের মত নির্দয় ঘৃণায় পরিত্যক্ত।

শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পেছনে মেয়েদের গাড়ীর

দিকে চাইলাম। চেয়ে দেখি মেয়েদের গাড়ী এর মধ্যেই অনেক পেছনে পড়েছে। খাড়া পথ। গরুগুলি আস্তে আস্তে গাড়ী টেনে' ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠছে। বসির, শৈব, রামকিষণ, মণীন্দ্র, সুরেশ, ক্ষেত্র, নিতাই—এরা সব পেছন থেকে গাড়ী ঠেলে ধর্‌ছে। আমার গাড়ী এগিয়ে এসেছে। মড়া ছেড়ে কিছুদূর গিয়ে গাড়ী থামালাম। ওরা এলে একসঙ্গে আবার চল্‌ব। আমার আগের লোকগুলি অনেক এগিয়ে গেছে। কারণ পায়ে হাঁট্‌লে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া যায়। এখন গাড়ী পেছন থেকে ঠেল্‌তে হচ্ছে তাই আমরা পেছনে পড়ে' গেছি। তা ছাড়া গাড়ী চালাতে হয় অতি সাবধানে, ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে। আমাদের গাড়ীর পাশে পাশে যারা হেঁটে চলছিল তারাও আমাদের পেছনে ফেলে আগে চলে' গেছে।

কিছুক্ষণ পর আমাদের সব গাড়ী এলো। চেয়ে দেখি সবাই মাথা নীচু করে' ভয়-বিহ্বল দেহে চুপ করে' বসে' আছে, বাদে শকুন্তলাদি'। পেছন থেকে তিনি বল্‌লেন, দেখলেন কিছু? বল্‌লাম, ও কিছু নয়, দুটো মড়া। বল্‌লেন, ভয় পাননি তো? মিথ্যা কথা বল্‌লাম। বল্‌লাম, তা ভয় কিসের?

তবে বেচারাদের জন্য এই ভেবে দুঃখ হলো: এমনি করে' পথের পাশে পড়ে' আছে! শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, ভারী তো আপনার দুঃখ! রেংগুন সহরে তো দেখে এসেছেন হাজার হাজার মড়া। মাত্র এ দুটো মানুষের জন্য আপনার দুঃখ। জ্যান্ত মানুষের ওপর আমরা ফেলি বোমা; আর মরে' গেলে কাঁদি আবার তাদের দুঃখে। চলুন, চলুন, আবার গাড়ী থামালেন যে?

আমার গাড়ী এতক্ষণ থামানো ছিল, এবার চলতে সুরু করল। গৌরীদের গাড়ী এবার আমার গাড়ীর ঠিক পেছনে। গৌরীকে বললাম, ভয় পাওনি তো! গৌরী মুখ ভার করে' বললো, আপনি অনেক এগিয়ে এসে পড়েছেন আর আমরা পেছনে, সব একা। ভয় করে না বুঝি? বললাম, এতগুলি লোক তোমরা একত্র, একা হ'লে কি করে? আর ভয়ই বা কিসের? বল্‌লে, এতগুলো লোক একত্র থাকলেই বা কি? আপনি কাছে থাকলে আমার ভয় করে না। আর একা একাও মনে হয় না। এবার আপনার সাথে সাথেই যাব। আপনি আর পেছনে ফেলে যাবেন না কিন্তু? বললাম, সে দোষ কি আমার? আমার গরু দুটো ভাল, সবল সুস্থ আর খুব চালাক। সাবধানে পা ফেলে বেশ তাড়াতাড়ি চলতে পারে। পেছন থেকে ঠেলে ধরতে হয় না। গৌরী এবার রাগ করে বল্‌লে, আমাদের গরু বুঝি খারাপ? আমরা এক এক গাড়ীতে দু' তিন জন করে' বসে' আর মাল-পত্রে বোঝাই। কাজেই পেছন থেকে ঠেলে ধরতে হয়। আর আপনি একা এক গাড়ীতে বেশ চাঁদসওদাগরের মত বসে আছেন। কাজেই গরুর পরিশ্রম কম আর হাঁটে তাড়াতাড়ি। হেসে আর বাঁচি না ওর রাগ দেখে। বললাম, বেশ, তুমি তাহ'লে আমার গাড়ীতে এসে বসো; আগে আগে সাথে সাথে যাবে? গৌরী এবার লজ্জায় মাথা গুঁজে রইল।

গাড়ী চলছে। পাহাড় বেয়ে ক্রমশঃ ওপরের দিকে আস্তে আস্তে উঠছে। আমাদের দল এখন একা। আমার গাড়ীর

আগে আগে আমাদের দলের কয়েকজন হেঁটে চল্‌ছে। সম্মুখের হঠাৎ উচুনীচু পথের পাশে তারা দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের গাড়ী সাবধান করে' দিচ্ছে। দরকার মত কখনো পেছন থেকে টেনে ধর্‌ছে। আবার কখনো ওপরের দিকে ঠেলে ধর্‌ছে। নচেৎ গাড়ী ভেঙে যেতে পারে। যদি দৈবাৎ গরুর অসাবধানতায় গাড়ী উল্টে পড়ে তবে আর রক্ষা নেই। পাহাড়ের অতল গহ্বরে প্রায় এক মাইল নীচে খাদে পড়ে যেতে হবে। এবং সেই পড়ে যাওয়ার পরিণতি যে কি ভয়ংকর ভাবতেই শরীর শিউরে ওঠে। বোমায় মৃত্যু—সে তো এক মিনিটেই। কিন্তু এ মৃত্যু হবে গড়াতে গড়াতে এক মাইল নীচে পড়ে। কত গাছে পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে সারা দেহ নানা ভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে। দেহের নানা স্থান হ'তে নানা ভাবে অতি তীব্র ও অতি ক্ষীণ ধারে রক্তের স্রোত বইবে। শেষে অতল তলে তলিয়ে যেতে হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহাবক্ষে। গভীর নির্জন হবে মৃত্যু। শবদেহ নিয়ে টানাটানি করবে অরণ্যের শ্বাপদকুল। কি ভয়ংকর মৃত্যু! নিজের মনেই নিজে শিউরে উঠ্‌লাম, এ মনুষ্যদেহের পরিণাম ভেবে?

সামনের দিকে চাইলে বেশী দূর দেখা যায় না। সম্মুখেই আবার একটা পাহাড় পথ জুড়ে' দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিকে চেয়ে যেন বলছে, হতভাগ্য পথিক, এ পথে মরতে এলে কেন? এ পথ পার্বত্যময়। দুরারোহ দুর্জ্ঞেয়। এ পথে চলে দেবতা দৈত্যদানব। মর্ত্যের মানুষ তোমরা—এ পথে তোমাদের অধিকার নেই। কিন্তু উপায় নেই, শত নিষেধ সত্বেও আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এই পথেই। যেতে হবে এগিয়ে পথের

সন্ধানে। ভেবেছিলাম পথ বুঝি এখানে এসেই থেমে গেছে। পাহাড়ের বেড়াজালে আর এগোতে পারেনি। কিন্তু তা নয়। পাষাণ কঠিন পথ। সমুখের পাহাড়টার সামনে একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে আবার পাশ কেটে আঁকা-বাঁকা হয়ে চলে' গেছে বহুদূর। মনে হলো পথের গতি চিরন্তন, সর্ব বাধা-বন্ধনহীন। সে চলে' যাবেই। কে তাকে বারণ করবে আর বারণ শুনবেই বা কেন সে। পাহাড়, পর্বত, অরণ্য, সাগর, নদ-নদী তার গতির কাছে যেন কত তুচ্ছ! ভাবলাম, এ পথের যাত্রী যারা তারাও কি তা হ'লে এই পথের সাথেই চিরন্তন ছুটে চলে? সর্ববন্ধনহীন চরণের গতি মিলিয়ে? হয়তো তাই। পথচলা যাত্রীকে বাধা দেয় কে? অনন্ত অজানা পথের কঠিন আহ্বান যে তার শ্রবণে। তাই সে আজীবন ছুটে চলে পথে, পথের সন্ধানে। সে যে চিরকালের যাত্রী!

কি যেন শক্তির মহাবাণী কাণ দিয়ে অন্তরে গিয়ে প্রবেশ করল। মনে হলো আমরাও মহাপথের যাত্রী। আমাদের বাধা দেয় কে? আমরাও আবার ছুটে চল্‌লাম সমস্ত পার্বত্য-কঠিন বাধা পদদলিত করে', ঘন অরণ্যের নিষধ উপেক্ষা করে।' আমাদের চরণতলে আজ টলমল সমস্ত পাহাড়-পর্বত, আর অরণ্য। আমাদের চোখের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠ্‌ছে অন্ধকার গহন বনের সমস্ত আঁধার। আমাদের প্রতি নিঃশ্বাসে শিউরে উঠ্‌ছে যেন সমস্ত গিরিশৃঙ্গ। ভাবলাম, মানুষ ধরায় শুধু ধূলির মানুষ নয়; সে দেবতা, সে অসীম, অনন্ত, সে আদি, অন্তহীন এক মহাতেজ; ছুটে চলার নেশায় ভরা। মানুষের

এমনি একটা সর্বশ্রেষ্ঠ দাবী নিয়ে আমরা পাহাড়ের পর পাহাড়, বনের পর বন, গুহার পর গুহা অতিক্রম করে' অগ্রসর হ'তে লাগলাম।

সহসা গৌরী পেছন থেকে ডাকলে, অশোকদা। ফিরে চেয়ে বল্লাম, ডাক্‌ছ আমায়? গৌরী বললে, হাঁ, জিজ্ঞাসা করছি, চাঁদ কি ডুবে গেছে? ভয়ানক অন্ধকার মনে হচ্ছে।

বল্লাম, অনেকক্ষণ চাঁদ ডুবে গেছে। কেন, তুমি দেখতে পাচ্ছ না? গৌরী বললে, ঘন অরণ্য আর পাহাড় সব ঢেকে রেখেছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শুধু আপনার দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চলেছি। আপনার চোখে যা দেখছেন মনে হয় তাই সত্য। আমার নিজের চোখ যেন অরণ্যের গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। বল্লাম, বেশ, আমিই আগে আগে পথ দেখিয়ে চল্‌বো। তুমি শুধু আমার পেছনে পেছনে আসবে। কিন্তু আমি যদি পথ হারিয়ে খাদে পড়ে যাই তখন তুমি তাড়াতাড়ি আমার পেছন থেকে সরে' যেয়ো। গৌরী বল্‌লে, কিন্তু আমি এত কাছে আপনার যে তখন সরে' যাবার আর সময় থাকবে না। মরতে হয় দু'জনেই মরব। বল্‌লাম, মরবে কেন? না হয় আমিই একটু সাবধান হ'য়ে চলব, যাতে পড়তে না হয়। তবে এই অন্ধকার পথে সর্বদা আলোর দরকার। অন্ধকারে পা ফেলতে একটু ভুল হ'লে অতলে তলিয়ে যেতে হবে, একেবারে খাদের মধ্যে। বলে' পকেট থেকে টর্চ লাইট্‌টা বের করে' জ্বেলে প্রথমে সমুখের পথটা দেখে নিলাম। পরে পেছনে লাইট্‌টা ঘুরিয়ে গৌরীর মুখে চোখে আলোটা ফেল্‌লাম। গৌরী আলোর ঝিলি-

মিলি চোখ বুঁজে সহ্য করে' নিয়ে বল্‌লে, ছিঃ, আপনার লজ্জা নেই। এতগুলি লোককে বাদ দিয়ে শুধু এমনি করে' আমাকে সকলের সামনে প্রকাশ করতে আছে ? নিবিয়ে ফেলুন শীগ্‌গীর। টর্চটা নিবিয়ে পকেটে রাখলাম।

রাত অনেক হয়ে গেছে। বেশ কন্‌কনে শীত পড়েছে। গাড়ীতে বসে' বসে' কাঁপ্‌ছি। রামতনু আমার গাড়ীর আগে হাঁট্‌ছে আর তামাক খাচ্ছে। বুড়োমানুষ—শীত লাগলেই তামাক খেতে থাকে। বল্‌লাম, রামতনু শীতে হাঁট্‌তে কষ্ট হচ্ছে বুঝি ? বল্‌লে, কষ্ট হ'লেই বা কি করব বাবু। গাড়ী যখন করতে পারিনি তখন কষ্ট করেই হাঁট্‌তে হবে। কিন্তু পা দু'টো যেন অবশ হয়ে আসছে। মনে হয় পথেই মারা যাবো। দেশে গিয়ে স্ত্রী পুত্রের মুখ আর দেখতে পাব না। শুনে' ভারী দুঃখ হলো। বল্‌লাম, পেছনের গাড়ীতে তুমি উঠে বসো গিয়ে। রাত ভোর হ'লে আবার হাঁট্‌বে। দিনের বেলা হাঁট্‌তে বেশী অসুবিধা হবে না। বল্‌লে, হ্যাঁ বাবু, দিনের জন্য ভয় করি না। রাত্রে চোখে একটু কম দেখি, তাই ভয় হয় নীচে গর্তের মধ্যে পড়ে' না যাই। বল্‌লাম, বেশ যাও, গাড়ীতে গিয়ে বস। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বল্‌লে, বাবু, পেছনের গাড়ীতে জায়গা নেই। ক্ষেত্র, মণীন্দ্র এরা সব বসেছে। আমাকে উঠতে দিলে না। বল্‌লাম, ওরা কি বল্‌লে ? বল্‌লে, বুড়ো, এ পথে কোন খাতির নেই। গাড়ী করনি, এখন হাঁট্‌তে না পারো তো মর গিয়ে—গাড়ীতে জায়গা হবে না। রামতনুকে টেনে তুলে' আমার গাড়ীতে বসালাম। বল্‌লাম, বুড়ো, ভয় কর'না। দেশে ঠিক পৌঁছে দেব। আমার দিকে

চেয়ে তার চোখ দুটী জলে ভরে' উঠল। দয়া মায়া স্নেহের মূল্য যে কত বড়, বুড়োর অশ্রুসিক্ত চোখ তা গভীরভাবে ব্যক্ত করল।

গাড়ী এবার ঘন অন্ধকার পথ বেয়ে চল্‌ছে। মাথার ওপর আকাশ দেখা যায় না। মাথার ওপর বড় বড় পাহাড়ী গাছ আর শুক্‌নো লতাপাতায় আচ্ছন্ন গভীর অন্ধকার। পথের একপাশে মাইল পরিমাণ উঁচু পাহাড়। অপর পাশে তেমনি নীচু গুহা। বন জংগল পরিপূর্ণ। চারিদিক থেকে গাঢ় অন্ধকার যেন আমাদের গ্রাস করতে চাইছে। মনে হলো, চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা ভরা আলোর বিশ্ব যেন আর নেই। একটা রাত্রি ঘন অন্ধকার তার পরিবর্তে আমাদের সমুখে আমাদের চারিদিকে নূতন জগৎ সৃষ্টি করে' মহানিশার বিভীষিকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যে আলোর জগতের মানুষ, সুসভ্য জগতের বৈদ্যুতিক আলোর দেশের মানুষ সে কথা কে বিশ্বাস করবে? আমরা যেন অসীম অন্ধকারে চিরতরে হারিয়ে গেলাম। মনে হলো, অনন্ত রাত্রির দেশের যাত্রী আমরা। আমাদের কি আলোর দেশে আর মুক্তি নেই? অন্ধকারে পথহারা নিরাশ পথিকের করুণ কণ্ঠস্বরে গৌরী পেছন থেকে ডাকল, অশোকদা, আপনি কোথায়?

এই সময় দেশের বাড়ীতে মা আর ছোট ছোট ভাই বোনদের কথা একান্ত মনে ভাবছিলাম। জীবনে হয় তো তাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। এই অন্ধকার রাজ্যেই হয়তো দু'ফোঁটা জল চোখের কোণে দেখা দিয়েছিল। গৌরীর ডাক কাণে আসছে অথচ সাড়া দেবার প্রবৃত্তি যেন নেই।

অশোকদা, কোথায় আপনি? আমাকে ফেলে গেলেন নাকি?

গভীর নিরাশায় সুর। মনে হলো, ওর চোখ দুটোও যেন জলে ভরে' উঠ্‌ছে। মনে হলো, এ পথে কে কার? কার গৌরী কে আর কার অশোক কে? ঐ অশ্রুভরা মায়াময় ডাকের কোন অর্থ আছে কি? গৌরী কে? আমিই বা কে? প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মায়া, হাসি-কান্না এসব তো শুধু সামাজিক জীবনের ক্ষণিকের বিলাসিতা। সমুখের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন মৃত্যুময় জীবনই তো সকল মানবজীবনের শেষ সম্বন্ধ? হয়তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঐ অতল খাদের অন্ধকারে পড়ে' থাকবে আমাদের সকলের মৃতদেহ। নিমিষের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে আমাদের তুমি-আমি, জানাশুনা। প্রশ্ন জাগল—জীবিত মানুষ সত্য; না মৃত মানুষ? মনে হলো, জীবিত মানুষের আয়ু উর্ধে ষাট বছর। আর মৃত মানুষের আয়ু যুগ-যুগান্তর। তার আয়ুর শেষ নেই। মৃত যে সে অনন্তকালের; সে মহাকালের। ভাবতে ভাবতে নিজের মধ্যেই নিজে হারিয়ে গেলাম। নিজের ভিতরে নিজে ঢুকে নিজেকে আজ চিনলাম, আজ অনন্ত অন্ধকারের সমুখে দাঁড়িয়ে বুঝলাম আমি কে? আর গৌরী কে?

অশোকদা, অশোকদা! মর্মস্পর্শী কণ্ঠস্বর। আর চুপ করে' থাকতে পারলাম না। বল্‌লাম, গৌরী, আমায় ডাকছো? এই যে আমি! বলে' তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে অতল অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া গৌরীর চোখ দুটীকে আবিষ্কার করলাম। গৌরীর ভয়-বিহ্বল চোখ দু'টী আমায় দেখে সহসা যেন হাসির আভায় উঠ্‌ল ঝল্‌মলিয়ে। বল্‌লে, ভয়ানক আপনি! এতো কাছে রয়েছেন অথচ কথা বলছেন না যে? গম্ভীর কণ্ঠে

বল্লাম, পথের কথাই ভাবছি, পথিকের কথা ভাববার সময় নেই। গৌরীর চোখ দু'টো সহসা আবার গাঢ় হয়ে উঠ্ল। কিছু বল্ল না। হয়তো ভাবল, জীবন-মরণ সমস্যার পথে কে কার কথা ভাবে। টর্চটা নিবিয়ে পকেটে রেখে বল্লাম, ভয় নেই, পেছনে পেছনে এসো। আমি ঠিক সমুখেই আছি। গৌরী এবার বল্লে, টর্চটা জ্বেলেই রাখুন না কেন? আপনাকে দেখতে না পেলে মনে হয় হারিয়ে গেলাম। বল্লাম, ব্যাটারী নেই, হয়তো আর দু'একদিন চল্তে পারে। কাজেই সর্বদা জ্বেলে রাখা অসম্ভব।

নোয়া! নোয়া! গাড়োয়ান গরু তাড়া দিচ্ছে। গাড়ী চল্ছে সমুখের সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এতটুকু সরু পথ খুঁজে' খুঁজে'। এতো অন্ধকারে এতো সরু পথ দেখা যায়? গরুর চোখ দু'টি ভগবান কেন যে এতো বড় করে' সৃষ্টি করেছেন আজ তা বুঝতে পারলাম। আমাদের চোখ ছোট, তাই আমরা মানুষকে ছোট চোখে দেখি। মানুষের সাথে করি তাই মারামারি কাটাকাটি। করি যুদ্ধ। ফেলি বোমা মানুষের মাথার ওপরে। গরুর চোখ বড়। তাই গরু মানুষকে বড় চোখে দেখে। পার করে' দেয় অন্ধকারাচ্ছন্ন পার্বত্য-সংকীর্ণ পথ। হাটে সাবধানে পা ফেলে—টিপে টিপে।

চেয়ে দেখি শৈব সহসা সমুখ থেকে পেছনের দিকে ফিরে এসে আমার গাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বল্লে, বাবু, আপনার গাড়ীতে আমাকে একটু উঠতে দেবেন? সামনে

ভয়ানক অবস্থা। রাস্তার দু'পাশে সারিবন্দী মৃতদেহ! ভয় করছে এখানটা দিয়ে হাটতে।

তাড়াতাড়ি নিজে একটু সরে' বসে' ওকে উঠিয়ে বসালাম। রামতনু বল্‌লে, বাবু, আপনার এখন বসতে অসুবিধা হবে। এবার আমি নেমে যাই। বল্‌লাম, সামনে নাকি অনেক মড়া পড়ে' আছে, ভয় করবে না তোমার? বললে, বাবু, জীবন্ত মানুষের দেশে হঠাৎ দু'একটা মড়া দেখলে ভয় করে! এ মড়ার রাজ্যে অসংখ্য মড়ার মাঝে মরার ভয় কি? বলে' রামতনু নেমে হাঁটতে লাগল। কিছু দূর এগিয়ে দেখি, মড়ার অন্ত নেই এবং একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বল্‌ছে। পাহাড়কে পাহাড় পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। অভ্রলেহী রাঙা আগুনের লেলিহান শিখা। একদিকে পথের পাশে অগণিত মড়া, অপর দিকে এই আকাশ-ছোঁয়া আগুন। মনে হলো, পথের পাশে এই অগণিত মৃতদেহগুলির জন্য দিগন্তবিস্তৃত মহা-শ্মশান যেন দাউ দাউ করে' জ্বল্‌ছে। মনে হলো, আমরাও যেন সব মৃত্যুপথের পথিক, ঐ মহা-শ্মশানের পাশে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছি।

চারদিকে আগুন। মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা। সে রাস্তা এখন আগুনের আলোয় দিনের মত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমাদের সবাইকে স্পষ্ট দেখা যায়। একবার পেছনের দিকে ফিরে চাইলাম। আতংক-চকিত সকলের চাহনি! সবাই পলকহীন চোখে ত্রস্তভাবে প্রচণ্ড আগুনের দিকে চেয়ে আছে। সবাই যেন ভাবছে, এ আর কিছু নয়, হয়তো আমাদের মৃতদেহের

অপেক্ষায় এ চিতা জ্বলছে, জ্বলছে এই মহা-শ্মশান। একমাত্র নিতাই ছোঁড়াটা গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে গাছের একটা জ্বলন্ত ডাল হাতে নিয়ে আগুন দিয়ে লাঠি খেল্‌ছে। ওর দিকে চেয়ে এবার একটু শুষ্ক হাসি হাসলাম। কম্পাউণ্ডারবাবু আগে থেকেই অজ্ঞানপ্রায়। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে নিতাইয়ের দিকে চেয়ে নিজে নিজে বল্‌লেন, ছেলেটার যদি একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকতো!

ঘণ্টা দুই চলার পর নামতে লাগলাম আগুনের পাহাড় থেকে ক্রমশঃ নীচের দিকে। সামান্য ঢালু পথ। গাড়ী পেছন থেকে টেনে ধরবার প্রয়োজন হয় না। গরুগুলি বেশ আস্তে আস্তে বিনা পরিশ্রমে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এখন আবার অন্ধকার পথ। টর্চটা জ্বেলে' মাঝে মাঝে সমুখের পথ দেখি। সাঁপের মত সংকীর্ণ রাস্তা। গরুর পা পিছলে গেলে উপায় নেই। পথ দেখে শরীর ভয়ে কেঁপে ওঠে। তাড়াতাড়ি টর্চটা নিবিয়ে ফেলি। এ পথ দেখার চেয়ে না দেখাই ভাল। মাইল দুই এ ভাবে চলার পরে সহসা গাড়ীর গতি আবার শিথিল হ'য়ে এলো। এখন থেকে পথ আবার ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠেছে। ঠিক এখানে এসে আমরা প্রায় পঞ্চাশখানা গাড়ীর যাত্রী একত্র হলাম। মানে আমাদের আগে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে এখানে এসে একত্র হ'লাম। ওপরের পথে ওঠবার সময় গাড়ীর গতি মন্দ হয়ে আসে। কাজেই পেছনে ঢালুপথের গাড়ী তাড়াতাড়ি এসে ওপরের পথের গাড়ীর সাথে একত্র হয়। পথ যখন ঢালু তখন মাইল চারেক পর্যন্ত ঢালু। আবার পথ যখন চড়াই মাইল চারেক পর্যন্ত চড়াই। কাজেই এখানে এসে আমরা প্রায় পঞ্চাশখানা

গাড়ীর যাত্রী একত্র হয়েছি। আমাদের দল ছাড়া আর সব অবাঙ্গালী—মাড়োয়ারী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বেহারী ইত্যাদি। স্ত্রী পুরুষ ও ছেলেপেলে সব গাড়ীতেই আছে। একটির পেছনে আর একটি গাড়ী সারবন্দী হ'য়ে ক্রমশঃ চড়াই পথে উঠছে! বড়দের ভয়-বিহ্বল কোলাহলে ও ছেলেপেলের কান্নার আওয়াজে সমস্ত পথ যেন বিষাদ-ব্যাকুল, মর্ম-পীড়িত। সরু, মোটা, মেয়েলী, প্রভৃতি নানা কণ্ঠের রোদন-ধ্বনি। রাত্রি বারোটা। চারিদিকে পাহাড়ী নির্জনতা। ঘন অরণ্যের অন্তহীন আঁধারের নীরবতা। গুহা—পাতালপুরীর নির্মম অতলতা, আর ওপরে অদৃশ্য অন্ধকারের বিপুল মৌনতা ইত্যাদি সব ভেদ করে' উঠেছে আমাদের আর্ত কণ্ঠস্বর। পলে পলে মৃত্যু আমাদের সমুখে যেন ঘনিয়ে আসছে। প্রতি মুহূর্তেই তাই আমাদের প্রাণ বাঁচানোর আকুল চেষ্টা। সকলের মনে মনে যেন একই প্রশ্ন, সাবধান! গাড়ী যেন পড়ে' না যায়। গরুগুলিও অসীম অধ্যবসায়ের সহিত অতি সাবধানে পা ফেলে গাড়ী টেনে চল্‌ছে। কোথায়? তা তারা জানে না। শুধু জানে তাদের চারটি চরণের ওপর নির্ভর করছে আজ হাজার হাজার ভারতবাসীর জীবন-মরণ প্রশ্ন তাদের কাঁধে আজ ভারতের বোঝা। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবনের বোঝা আজ তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে' বয়ে' নিচ্ছে। তাদের সমুখে আজ শুধু বইবার আর টানবার তাড়া। শুধু এগিয়ে চলবার বিপুল আহবান তাদের কাণে। যেতেই হবে। পৌঁছাতেই হবে। এই শুধু তারা জানে। তাই গরুগুলো আজ চল্‌ছে বিপুল মরণকে উপেক্ষা করে'।

সহসা সমুখের দিকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শোনা গেল। সকলের বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সমুখের সবগুলি গাড়ী সহসা থেমে গেল। মেয়েরা চীৎকার করে' বলতে লাগল, কি হলো ? কাদের গাড়ী পড়ে গেল ? সমুখের দিক থেকে চীৎকার ধ্বনি আসছে। এবার আমরা প্রায় ষাট সত্তরখানা গাড়ী সারবন্দী হ'য়ে এ পথ দিয়ে একত্র চল্‌ছি। মনে হলো, সকলের আগের গাড়ীতে কি হয়েছে ! তাড়াতাড়ি টর্চটা জ্বেলে সমুখের দিকে আলো নিক্ষেপ করলাম। সামনে প্রকাণ্ড পাহাড়। পাহাড়ের জন্য সমুখের সবগুলি গাড়ী দেখতে পারলাম না। আলো ঘুরিয়ে পাশেই নীচের গুহার মধ্যে ফেললাম। কারো গাড়ী গুহায় পড়ে' গেছে কিনা ? নীচের গুহার দিকে চেয়ে মনে হলো—আকাশে প্লেনে উঠে যেন নীচের ধরণীর দিকে চেয়ে দেখছি। গুহার তলদেশ এতো নীচে ! প্রায় মাইলখানেক নীচে অসংখ্য গাছপালা, ঘন অরণ্য। মনে হলো, আর একটি অরণ্যপ্রদেশ যেন ধরণীর গর্ভ ভেদ করে' ওপরে উঠে আসছে।

আমাদের দু'পাশেই এখন গিরি-গহ্বর। মাঝখান দিয়ে মাত্র একখানা গাড়ী চলবার মত সরু রাস্তা। এ রাস্তার ওপরে আমাদের গাড়ী এসে থেমে গেল। কারণ আগের গাড়ীগুলি কি কারণে থেমে গেছে, সেই কারণ জানবার জন্য ব্যস্ত ও ভীত হ'য়ে আছি। এমন সময় জানা গেল সকলের আগে যে গাড়ীখানা চলছে সে গাড়ীর গরু ঘূর্ণিপাক খেয়ে ফিটের মত হ'য়ে পড়ে' রয়েছে। এত বড় জিহ্বা বেরিয়ে গেছে তার।

পথের যে পাশে গহ্বর সেদিকেই গুজরাটী আরোহীসহ গাড়ীখানা কাত হয়ে আছে। এখন সামান্য একটু নাড়াচাড়া লাগলেই আরোহীসহ গাড়ীখানা অতল গুহায় পড়ে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ অবস্থায় আরোহীদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য চীৎকার উঠেছে। অন্য গাড়ীর লোকজন তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে সেই বিপদগ্রস্ত গাড়ীখানাকে সকলে মিলে টেনে ধরে আরোহীদিগকে নামাবার চেষ্টা কর্ছে। এই সংবাদ শুনে কম্পাউণ্ডারবাবু বল্লেন, অশোকবাবু, আর রক্ষা নেই। পাহাড়ী পথে হয়তো মাইল কুড়ি এসেছি, আরো হয়তো শ'খানেক মাইল সামনে আছে। এর মধ্যেই যখন গরুগুলো অস্থির হয়ে পড়েছে, তখন বাকী পথ যাওয়া অসম্ভব। কোন্ সময় যে আমাদের গরুও পাগল হয়ে ওঠে তার ঠিক নেই। আর গরুরই বা দোষ কি? ওরাও তো জীব—রক্তে মাংসে গড়া। আমরা গাড়ীতে বসে আছি। তবু মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে যায়। একি ছায়া-শীতল সমতলভূমির ওপর দিয়ে পথ যে মাথা ঘুরবে না? এ হলো রক্ত জমানো পথ; বুকের রক্ত যেন বরফ হয়ে জমে' আস্ছে। কি ভয়ানক কথা! গাড়ী পড়ে' গেছে! বলে' তিনি আমাদের গাড়ীর মেয়েদের বিশেষ করে' শকুন্তলাদি'কে ডেকে সাবধান করে' দিলেন—যার যার ছেলেপেলে সাবধানে রেখো, সমুখে গাড়ী পড়ে আছে।

কম্পাউণ্ডারবাবুর কথা শুনে আমার হাসি পেল। কিন্তু হাসলাম না। বিপদ সবারই সাম্নে। আমাদের গাড়ীও পড়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় হাসি-তামাসা অন্যায়। কাজেই

চুপ করে' রইলাম ; কিন্তু মন প্রাণ আতংকে ভরে' গেল। মৃত্যু যত কাছে ঘনিয়ে আসে ততই যেন বাঁচ্তে ইচ্ছা করে। কিন্তু আমি বিয়ে-থা করিনি আমার কি? মৃত্যুর জন্য আমার ভয় কিসের? মরে গেলে আমার জন্য দুঃখ করবার কেউ নেই ; বাবা মা, শুনেছি আমি যখন খুব ছোট তখনি তাঁরা চলে' গেছেন। তবে আর মরবার জন্য ভয় কি? পেছন থেকে হঠাৎ কোমল কণ্ঠের ডাক শুনলাম, 'অশোকদা! পেছনে তাকালাম। গৌরী মলিন চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্ল, আপনি গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে যান, গাড়ী পড়ে যেতে পারে।'

এতক্ষণ যে আমার কেউ নেই বলে মৃত্যু নিয়ে philosophy কর্ছিলাম—সহসা তা যেন কোথায় উড়ে গেল। মনে হলো, এই গৌরী মেয়েটিই যেন পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী ও স্ত্রীরূপে আমার পেছনে পেছনে লেগে রয়েছে। কে এই গৌরী? সে আমাকে এমনি করে সাবধানের বাণী শোনায় কেন? আমার উদাসীন ছন্নছাড়া জীবনে মায়াবাদ এনে দিতে চায় কেন? যে জীবনটা তুচ্ছ-তাচ্ছল্যে ভরে' রাখতে চাই, সে জীবনের জন্য সহসা আবার মায়া আসে কেন? আবার বাঁচতে চাই কেন? জীবনটাকে আবার ভালবাসতে চাই কেন? মনে হলো ওর জন্যই যেন বেঁচে থাকা প্রয়োজন। মানুষ শুধু নিজের প্রয়োজনে বাঁচে না অপরের প্রয়োজনেও তাকে বাঁচতে হয়।

এতক্ষণ পর গৌরীর কথার উত্তরে বললাম, আমি হেঁটে যাব আর তুমি গাড়ীতে বসে যাবে। তোমার গাড়ী পড়ে যায় যদি?

—আমি মরে গেলে কাঁদবে বাবা আর মা, তাতে আপনার দুঃখ কি? কথাটা শুনে রাগ হলো। ওর বাবা মা কাঁদবে, আমি যেন কিছুই না। মুখ কালো করে' রাগ করে' বললাম, আর আমি বুঝি আনন্দে লাফিয়ে উঠে হাসব'? আমার মুখ দেখে গৌরী আমার অন্তরের কথা বুঝল। এক গাল হেসে বললে, রাগ হ'লে কিন্তু আপনাকে আরো ভাল লাগে। আরো একটু রাগ করে' বললাম, বেশ আর ভাল যাতে না লাগে তাই করব। এই গাড়ীতে ঠিক হয়ে বসলাম। নামব না। হাঁটব না।

অনেকক্ষণ পর খবর এলো গাড়ীটা বাঁচানো গেছে। আরোহীদের নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু গরুর অবস্থা খারাপ। চোখ উল্টে পা ছেড়ে দিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে' আছে। গাড়োয়ান বহু চেষ্টা করেও গরু দুটোকে ওঠাতে পারছে না। গাড়োয়ান বলছে যে, একটু জল গরুটার নাকে মুখে ছিটিয়ে দিলেই নাকি আবার উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু জল কোথায়? তার গাড়ীতে এক ফোঁটাও জল নেই। কথা শুনে' সকলের গাড়ীতে জলের খোঁজ করা হলো। প্রায় আটদশখানা গাড়ী খোঁজ করে' তারপর একটা গাড়ীতে জল পাওয়া গেল। সে জল নাকে-মুখে ছিটিয়ে দিতেই গরুদুটো চোখ মেলে চাইল। কিন্তু কোন প্রকারেই তাকে আর ওঠানো গেল না। এ অবস্থায় পেছনের সকল গাড়ীই আটক পড়ে রইল। ঐ গাড়ীর পাশ দিয়ে আগে চলে' যাবার মত এ পথ তত প্রশস্ত নয়। কাজেই আজকের মত এখানেই গাড়ী বাঁধতে হলো। শোনা গেল যে, গাড়ী পথের

যেখানে যে অবস্থায় দাঁড়ানো আছে ঠিক সেখানে সে অবস্থাতেই সারা রাত কাটাতে হবে। কারণ কোনদিকেই আর সরিয়ে রাখবার জায়গা নেই। একমাত্র পথের এই স্থানটুকু ছাড়া ডাইনে বাঁয়ে আগে পাছে সরবার বা ঘোরবার ফেরবার মত জায়গা নেই। পথের এই অল্প পরিসর স্থানটুকুই আজকের রাত্রির জন্য আমাদের ঘর বাড়ী হয়ে রইল। এর ওপরেই আমাদের আহার-নিদ্রা ওঠা-বসা সব কিছু কাজ করে' নিতে হবে। এই সংকীর্ণ জায়গাটুকুর মধ্যেই পাততে হবে আমাদের চলার-পথের সংসার। এই পার্বত্য-গুহা-অরণ্য-বিকীর্ণ পাষাণ পথের ওপরেই ছেড়ে দিতে হবে আমাদের জীবনের ভার নিশ্চিতরূপে। বিশ্বাস করতে হবে আজ এই পথকে আমাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন দিয়ে। আমরা আজ শুধু মহাপথের যাত্রী পথের নিশ্বাসে, পথের ইঙ্গিতে আজ আমাদের উঠতে হবে, বসতে হবে। আমরা শুধু পথের দাস, পথ আমাদের প্রভু।

একবার ডাইনে আবার বাঁয়ে চেয়ে দেখলাম। অন্তহীন মরণের সুর ডাইনে বাঁয়ের গুহা অন্ধকার থেকে যেন ছুটে আসছে। পথের ওপর এতটুকু বিশ্বাস হারালে আর রক্ষা নেই। গিরি-গহ্বরের সাথে করতে হবে মৃত্যুর গভীর আলিঙ্গন। টর্চটা জ্বেলে আবার গুহার দিকে আলো নিক্ষেপ করলাম। গুহার নিম্নতা উপলব্ধি করে' মাথায় ঘুর্ণিপাক খেল। চোখ তুলে আবার ওপরে আকাশের দিকে চাইলাম। দু'একটা তারা এবার দেখতে পেলাম। আমাদের যেন উপহাস করে' বললে, "you are the lost travellers!" ব্যর্থ হয়ে আবার সমুখ পানে চাইলাম।

সমুখের পাহাড়টার গায় আবার আগুন জ্বলছে। বড় বড় শুকনো মোটা মোটা ডাল ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে। সে সব ডাল জ্বলছে। সময় সময় উতলা বাতাস লেগে দাউ দাউ করে' জ্বলে উঠে আবার বাতাস থেমে গেলে নিবু নিবু হয়ে' জ্বলে। যখন নিবু নিবু জ্বলে তখন জ্বলন্ত কয়লার মত রক্তরাঙ্গা ঝিলিক দেয়, যেন নিবিয়ে-আসা-শ্মশান। পেছনে একত্র এতগুলি মড়া দেখে এসেছি আর আমরাও যে কখন মরব ঠিক নেই, তাই আগুন দেখলেই মনে হয় আগুন নয়, আমাদের জন্যই জ্বেলে রাখা মহাশ্মশান। পাহাড়ের গায় এ আগুন! নিশ্চয়ই পাহাড়ী আগুন। আপনি জ্বলে' উঠে আবার আপনিই নিভে যায়। মনে হলো এ বিশ্বটা একটা মহাশ্মশান আর বিশ্বের কোটি কোটি লোক সবই মৃত। মনে হলো মানুষের সত্যরূপ ঐ শ্মশান-আলোতেই পরিলক্ষিত। মানবের দেহে যে অংশটুকু জীবন্ত বলে' মনে করি সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যা।

গাড়োয়ান রুক্ষস্বরে বললে, নামো বাবু, গাড়ী আর যাবে না। গরুকে ঘাস দিতে হ'বে, শীগ্‌গীর্ নামো। কিন্তু নেমে যে দাঁড়াব কোথায় সে কথা কে বলে? তবু নামতে হবেই। উপায় নেই। বাধ্য হয়ে জড়োসড়ো ভাবে কোন রকম নেমে পড়লাম। গাড়ী ঘেঁষে গাড়ী ধরে' দাঁড়ালাম। পা একটু অসাবধানে ফেললে গুহায় পড়ে' যাব নিশ্চিত। কাজেই পা যেন কাঁপছে। গাড়ী ধরে' দাঁড়িয়ে আছি। গাড়োয়ান গাড়ীর ওপরের বিছানা ও মালপত্র ঠেলে সরিয়ে নীচে থেকে খড় টেনে' বার করে' গরুকে খেতে দিল। আমাদের প্রত্যেক গাড়ীর

গাড়োয়ান ঠিক এই ভাবে আমাদের সকলকে নামতে বলছে। রাগে শরীর জ্বলে' উঠল। স্বীকার করি গরুর জন্য ঘাস টেনে' বার করা দরকার। কারণ গরুগুলিকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু আমরা পুরুষেরা না হয় নেমে কোন প্রকারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি কিন্তু মেয়েরা আর এই ছোট ছোট ছেলেপেলে এমন রাত একটার সময় পাহাড় অরণ্যের মধ্যে কি করে' গাড়ী থেকে নামে? আর নেমে' পা-ইবা কোথায় ফেলবে? গাড়ীর দু' পাশেই গিরি-গহ্বর। এক পা ফেলবার মত রাস্তার ওপর জায়গা নেই। গাড়ীতেই সব জায়গা জুড়ে' র'য়েছে অথচ গাড়ীও সরিয়ে রাখবার স্থান নেই। তাছাড়া গাড়ী বুক সমান উঁচু। তার ওপর থেকে নামতে হ'লে অপর একজনকে নীচে দাঁড়িয়ে ধরে' নামাতে হয়। সে দু'হাত সমুখে বাড়িয়ে দিলে আরোহী তার গলা জড়িয়ে ধরে' কোনরকম নামতে পারে। এ অবস্থায় নামা সহজ নয়। তার ওপর ক্ষুধায় পা থর্ থর্ করে' কাঁপছে। গলা জড়িয়ে ধরে' নামবার সময় শরীরের ব্যালেন্স ঠিক নাও থাকতে পারে। জড়াজড়ি ভাবে দু'জনেই পড়ে' যাবে অতল গুহায়। বল্‌লাম, মেয়েরা গাড়ীর ওপরই একধারে সরে' বসবে, তোমরা ঘাস টেনে' বার কর, কোন অসুবিধা হবে না। সে কথা কে শোনে? কম্পাউণ্ডারবাবুকে বল্‌লাম, আপনি এদের বুঝিয়ে বলেন, আমার কথা এরা শুনছে না। কম্পাউণ্ডারবাবু কাকুতি-মিনতি করে' বললেন। কিন্তু ওরা আরো চটে' গেল। গুণ্ডাগোছের গাড়োয়ানটা একটা দা হাতে নিয়ে কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে গিয়ে

বল্‌লে, কেটে ফেলব। কম্পাউণ্ডারবাবু চুপ করে' গেলেন। বল্‌লেন, থাক অশোকবাবু, ঐ পাষণ্ডগুলোর সঙ্গে ভাল কথা বলাও মহাপাপ। এখন আমাদের দেখবার কেউ নেই। এ ভাবেই তো মরে' গেছি, তার মধ্যে আবার দা'র কোপ? বললাম, ভয় কি? ব্যাটাদের মেরে খুন করব। আমরা এতগুলো লোক রয়েছি, আটজন গাড়োয়ানের সঙ্গে পারব না? কম্পাউণ্ডারবাবু ব্যস্তকণ্ঠে বল্‌লেন, ওসব সর্বনাশের কথা তুলে' আর বিপদ ডাকবেন না। ওদের হাতে রয়েছে পাঁঠা-কাটা রাম দা। আমাদের কি আছে? তার ওপর আমাদের দেহে এখন কোন শক্তি-সামর্থ্য আছে? পিপাসায় বুক গেছে শুকিয়ে, ক্ষুধায় পেটে আগুন জ্বলছে। পাহাড়ী শীতে দাঁত ঠক্ ঠক্ করছে। আর এ ব্যাটারা তাড়ির ওপর তাড়ি চালাচ্ছে, বদ্ধ মাতাল। আপনারা ছেলেমানুষ, রক্ত অযথা গরম করে' লাভ নেই। মারা পড়ব নিজেরাই। ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয়। তার চেয়ে মেয়েদের নামিয়ে দিই, সেই ভাল। ঘাস টানা হ'লে আবার উঠে বসবে।

কম্পাউণ্ডারবাবু শেষে গাড়ীর ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লজ্জাসরম ত্যাগ করে' পরনের কাপড়খানা উরুর ওপর পর্যন্ত উঠিয়ে কষে' কোমরে বেঁধে' প্রায় আধঘণ্টা সময় নিয়ে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে' নামতে নামতে নিজে নিজে বল্‌লেন, যে রকম ভাবে পা কাঁপছে, পড়েই যাই না কি। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে টর্চটা জ্বালিয়ে পায়ের নীচে মাটি দেখিয়ে বল্‌লাম, পড়বেন কেন? এখানে পা রাখুন, গাড়ীটা শক্ত করে' ধরে' শেষে

দাঁড়ান। বল্‌লেন, নীচে মাটি আছে তো না, ফাঁকা ? বল্‌লাম, হ্যাঁ আছে, নামুন। নেমে' দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে ছেলেপুলে নামিয়ে নিয়ে শেষে শকুন্তলাদি'কে বল্‌লেন, এবার তুমি নেমে এসো। সাবধানে পা ফেল। নইলে গর্ত্তে পড়ে' যাবে কিন্তু। না হয় এসো, আমি ধরে' নামিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তোমার ভার কি আমি সইতে পারব ? শেষে দু'জনেই পড়ে' মরব। তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, অশোকবাবু, আপনি ওকে একটু ধরুনতো। শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, আমি কি কচি খুকী যে ধরে' নামাতে হবে ? জায়গা থাকলে এতটুকু ওপর থেকে লাফ দিয়েই পড়তে পারতাম। শহরে চল্‌তি ট্রাম থেকে লাফিয়ে নামি, আর এটা তো গরুর গাড়ী। বলে' গাড়ীর ওপর সোজা হয়ে' দাঁড়িয়ে চুল খুলে' চুল বেঁধে' বুকের আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে, গাড়ীর চাকার ওপর এক পা রেখে' উপুড় হয়ে' দু'হাতে গাড়ীটা শক্ত করে' ধরে' ফট্ করে' নেমে' পড়লেন। বল্‌লেন, পড়লাম না তো গুহায় ? পায়ের নীচটা শক্ত যার পাহাড় পর্বত পাড়ি দিতে কতক্ষণ লাগে তার ?

কম্পাউণ্ডারবাবু আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, ওকে দেখে আজ আমার কত আনন্দ। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাবার পর যখন ওকে বিয়ে করলাম, দেখলাম, আমি পঞ্চাশ আর ও কুড়ি। তিরিশ বছরের ছোট। দেখে' দুঃখ করে' ওকে বল্‌লাম, কাজটা ভাল করিনি। দু'জনের বয়সের বড্ড ব্যবধান। তখন ও হেসে' বল্‌লে, শুধু কি বয়সের মাপ দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ ? বরং অল্প বয়সের স্বামীতে অনেক সময় ভয় বেশী। তার

কাছে শুধু বন্ধুত্বের দাবী করা চলে। জটিল সংসারধর্মে চাই জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য, সংযম। বয়সের অভিজ্ঞতা সংসারজীবনে মস্ত বড় পাথেয়। সে অভিজ্ঞতা চঞ্চলমতি বালক স্বামীর থাকে না, তা-ই তো আমার কোন দুঃখ নেই। তোমার আগের তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ে রয়েছে, ওরাই আমার সন্তান; তার বেশী চাইনে। তাইতো ও নিঃসন্তান, এতো স্বাধীন; এতো সুন্দর, এতো আপদ-বিপদ পরিপূর্ণ এই পাহাড়ী পথের দুরন্ত সাথী।

শান্তিদির গাড়ীর কাছে গিয়ে বল্‌লাম, একটু নেমে দাঁড়াতে হবে। ব্যাটারা শুনছেনা, গরুকে ঘাস দেবে। শান্তিদি' দু' চক্ষের জল ছেড়ে দিয়ে বল্‌লেন, অশোকবাবু, খোকা তো চল্‌ছে, আর বাঁচাতে পারলাম না। দেখুন, দু'চোখ উল্টিয়ে রয়েছে; আগুনের মত জ্বর। তার ওপর পেটের অসুখটা বেড়ে গেছে। আমার কোলেই দু'তিনবার মল ত্যাগ করল। কম্পাউণ্ডারবাবুকে ডেকে আনলাম। তিনি এসে বল্‌লেন, আহা! বৌমা, তাহলে খোকা আর বাঁচবে না। হায় ভগবান, তোমার এই ইচ্ছা! এ দৃশ্য দেখতে হবে পথের মাঝে এসে। ওষুধের বাক্সটা কোথায় রেখেছি, তাকি আর মনে আছে? এই হারামজাদা গাড়োয়ান ব্যাটারা মালপত্র টেনেটুনে কোথাকার জিনিষ কোথায় ফেলেছে। আর ব্যাটাদেরই বা দোষ কি? গরুকে ঘাস দিতে হবে তো। রাজায় রাজায় যুদ্ধ আমাদের অসময়ে অস্থানে মৃত্যু। থাক বৌমা, তোমাকে আর নামতে হবে না! খোকাকে কোলে করে' বসে

থাক। ঠাকুরের নাম কর, তিনিই একমাত্র আমাদের সহায়। হ্যাঁ, ঘাস নামাতে হবে, তা আমিই নামিয়ে দিচ্ছি। বলে' তিনি জোরে জোরে টেনে বিছানার নীচে থেকে ঘাস নামিয়ে দিলেন। এ গাড়ীর গাড়োয়ান তখন তাড়ি খেয়ে পড়ে' আছে।

গৌরীদের গাড়ীর কাছে গিয়ে বল্‌লাম, তুমি নাম। তোমার মা বুড়োমানুষ, তিনি গাড়ীতেই থাকুন—নামতে পারবে তো? নীচে কিন্তু পা রাখবার জায়গা নেই, খুব সাবধান। গৌরী অভিমানের সুরে বল্‌লে, না, আমি নামতে পারব না। ভয়ানক ভয় করছে। বল্‌লাম, ভয় কি? আমরা সবাই নেমেছি। তবে খুব সাবধান। গৌরী বল্‌লে, কিন্তু নামব যে, নীচে তো মাটী দেখছি না; প্রকাণ্ড গর্তের মত দেখা যায় যে! বল্‌লাম, হ্যাঁ, নীচে একেবারে অতল গুহা। পড়ে' গেলে কিন্তু রক্ষা নেই। খুব সাবধানে পা ফেলবে। ও হেসে বল্‌লে, বেশ, তা হ'লে আপনার হাতটা বাড়িয়ে দিন, ধরে' নামি। হাত বাড়ালাম। হঠাৎ লজ্জা এসে বাধা দিল। হাত সরিয়ে নিলাম। গৌরী দোল সাম্‌লে নিয়ে চমকে বললে, একি! হাত সরিয়ে নিলেন যে! পড়ে' মরব নাকি! এতো দূরে নয়, আরো একটু এগিয়ে আসুন। এবার আরো একটু এগিয়ে গিয়ে গাড়ী ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দু'হাত ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধর। বেশ আল্‌গোছে নামিয়ে দিই। ও কতক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে থেকে বললে, অমন বিশ্রীভাবে নামতে আমার ভয়ানক লজ্জা করে। কথা শুনে' চুপ করে' রইলাম। রাগ হলো। ধন্য এই মেয়ে জাতটা। পড়ে' মরে'

যাবে, তবু পরপুরুষের ছোঁয়া নেবে না। রাগ করে' বল্‌লাম, বেশ, তাহ'লে নিজেই লাফিয়ে পড়ে' মর। আমি সরে' যাচ্ছি। ব্যস্ত হয়ে বললে, না, দাঁড়ান। ফিরে দাঁড়িয়ে আবার হেসে দু'হাত বাড়ালাম। গৌরী এবার চোখ মুখ বুঁজে দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে' ঝুলে' পড়ল। আঠার উনিশ বছরের গৌরী। স্বাস্থ্যসম্পদে সারা দেহ তার উজ্জ্বল। ওর সমস্ত দেহটা আমার সকল দেহের ওপর ঝুল্‌ছে। বেশ ভারী মনে হলো। যুদ্ধ-বিগ্রহহীন শান্তিময় মনুষ্যসমাজের একটা নিভৃত কোণে হ'লে আজকের এ অঙ্গাঙ্গী ভাবটা বুকের মধ্যে হয়তো কত শিহরণ তুলত! কিন্তু আজ এই অরণ্য, গুহা, গহ্বর পরিবেষ্টিত নিশীথ রাতের মৃত্যুময় পার্বত্য পথে গৌরীর দেহের ও নিজ দেহের দোল সামলাতে না পারলে গুহায় পড়ে' গিয়ে মরব, শুধু এ শংকা বুকে বয়ে' শেষে গৌরীকে আল্‌গোছে নামিয়ে দিয়ে বল্‌লাম, এবার টানো। বল্‌লে, কি টানব? হেসে বল্‌লাম, গরুর ঘাস। ও বল্‌লে, ইস্! আমার বড় গরজ পড়েছে কিনা? আমি গরুর জন্য ঘাস টানব কেন? হেসে বললাম, দুষ্মন্ত-প্রিয়া শকুন্তলা মুনির আশ্রমে হরিণশিশুর জন্য ঘাস আহরণ করত। আমার চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে হেসে বললে, বেশ, আমি যদি শকুন্তলা, তবে দুষ্মন্ত কে? বলে' আবার নিজেই লজ্জায় মাথা নীচু করে' কোমরে কাপড়ের আঁচল শক্ত করে' জড়িয়ে বেঁধে ঘাস টানতে লাগল। বললাম, থাক্ থাক, ও তোমার কাজ নয়, আমিই টানব। এখন তুমি বরং এখান থেকে সরে' গিয়ে দাঁড়াও। এ জায়গাটা বড্ড সংকীর্ণ। পা পিছ্‌লে

কোথায় পড়ে' যাবে জান? পকেট থেকে টর্চটা জ্বেলে দেখিয়ে বললাম, ঐখানে অতল গিরি-গুহায়। গৌরী অভিমানের সুরে বললে, না, আমি এখান থেকে কোথাও যাব না। ভয়ে আমার পা কাঁপছে। আপনি বড় নির্দয়; আলো জ্বেলে এমনি করে' মরণের পথ দেখাতে আছে? বলে' একটু চুপ করে' আমার মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবল। তারপর ম্লানগম্ভীর কণ্ঠে বল্‌লে, মৃত্যুকে এখন আমি ভয় করি। মনে হয় যুগযুগান্তর এমনি করে' এই পথেই যেন বেঁচে থাকি। মৃত্যু যে কি ভীষণ, আজ যেন তা বুঝতে পার্‌ছি। বলে' আমার মুখ থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে মাথা নত করে' রইল। ওর মনের গভীর কথাগুলি বুঝতে পারলাম। কিছুক্ষণ আগে সে বল্‌ছিল আমি মরি তাতে ক্ষতি নেই; আমার জন্য বাবা ও মা হয়তো একটু দুঃখ করবে, আর কেউ নয়। আমার ওপর কতবড় অভিমান করে' সে যে এ কথা বলেছিল তা এখন বুঝতে পারলাম। এখন সে যুগযুগান্তর বেঁচে থাকতে চায়। মৃত্যু! সে নাকি অত্যন্ত ভয়ংকর। গৌরীকে কিছুক্ষণ আগেও ভেবেছি, হাজার রিফিউজিদের মধ্যে সেও একজন—অজানা অচেনা। পথে যেতে যেতে দেখা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে শুধু পথের নয়, পথ ছাড়িয়ে যুগযুগান্তরের সাথী। গভীর প্রেম যে দেশকালের অতীত, এক মহা অনন্ত পথের সাথী, সে কথাই যেন ওর মরণভীতু অন্তর হ'তে বেরিয়ে এলো। নিজেও সঙ্গে সঙ্গে এক অমর অনুভূতিতে ভরে' উঠলাম।

ওর হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় তুলে' নিলাম। নীরব

নিস্তব্ধ দু'জনেই। কেউ কিছু বলতে পারলাম না। ও মাথা গুঁজে চুপ করে' রয়েছে। ও যেন মুগ্ধ। মনে হলো এ গিরি-অরণ্যের রাজ্যে শুধু আমরা দু'জন। আর যেন কেউ নেই। ওকে ক্ষণকাল পূর্বে গাড়ী থেকে অঙ্গাঙ্গী ভাবে নামাবার সময় সারা দেহ ভরে' ওর দেহের পরশ পেয়েও ওকে তেমনি করে' পাইনি ; পেয়েছি শুধু গিরি-গহ্বরে পড়ে' যাবার ভয়। শংকা আর আতংক তখন সারা প্রাণ জুড়ে' কম্পন্ তুলছিল। গৌরীর দেহের পরশ ছিল তখন সর্ব অনুভূতিহীন। এখন পথের ওপর নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে গৌরীর হাতখানি নিজের হাতে তুলে' নিয়ে কি এক নিবিড় পাওয়ায় গভীর নীরব হয়ে' গেলাম। কিছু বলতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম, শুধু তুমি আর আমি। দু'জনেই দু'জনের মধ্যে হারিয়ে যাবার সময়টুকু নিমিষের মধ্যে এভাবে কেটে গেল। সহসা গৌরীর হাত ছেড়ে' দিয়ে বললাম, এবার তুমি শকুন্তলাদি'র কাছে গিয়ে দাঁড়াও। তোমাকে এখানে সারা রাত দাঁড়িয়ে রাখবার দায়িত্ব আমি নিতে পারি না। এ স্থানটা ভয়াবহ সংকীর্ণ। পা একটু এদিক ওদিক হ'লে আর রক্ষা নেই। টর্চটা জ্বেলে' আবার দেখাব কত গভীর ঐ পাতালপুরী ? গৌরী বললে, না, আর দেখাবার দরকার নেই , আমি যাচ্ছি। বলে' গাড়ীর পাশ ঘেঁষে গাড়ী ধরে' ধরে' সাবধানে পা ফেলে' শকুন্তলাদি'র কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মাতাল গাড়োয়ানটা এবার এসে ঘাস টেনে বার করে' গরুকে খেতে দিল।

প্রত্যেক গাড়ীর সামনে পথের ওপর দুটো করে' গরু দাঁড়িয়ে।

একটার সামনে আর একটা। পাশাপাশি দাঁড়ানোর মত জায়গা নেই। গরুগুলি ঘাস খেতে লাগল অসহ্য ক্ষুধায়। এখন আমরা কি করবো তাই ভাবছি। ক্ষুধায় প্রাণ সারা। অথচ রান্না করবার জল নেই, জায়গাও নেই; খাওয়া-দাওয়া তো দূরের কথা। কোন রকমে রাতটা কাটাতে পারলে বাঁচি। রামকিষণ এসে বল্‌লে, কি রকম শীত পড়েছে দেখেছেন বাবু? একটু আগুন জ্বেলে' যে পোহাব তারও জায়গা নেই। শীতেই মারা যাব। রামতনু একটা গাড়ীর নীচে বসে' ঠক্ ঠক্ করে' শীতে কাঁপছে আর তামাক খাচ্ছে। রামকিষণ, বসির, শৈব রামতনুর কাছে গিয়ে বসল তামাক খাবার আশায়। তামাক খেলে নাকি শরীর গরম হয়। বল্‌লে, তারা সারা রাত তামাক খেয়েই কাটাবে। চেয়ে দেখলাম সুরেশ, নিতাই, ক্ষেত্র, মণীন্দ্র আর গৌরীর বাবা সুধাংশুবাবু পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে' ঘুমোচ্ছে। কাছে গিয়ে ধমক্ দিয়ে সুধাংশুবাবুকে বল্‌লাম, আপনার কি এ ভাবে ঘুমাবার সময়? গৌরী আর তার মা ওখানে একা রয়েছে পথের ওপর দাঁড়িয়ে, আর আপনি দেখছি এতটুকু রাস্তা হেঁটেই ভেঙ্গে পড়েছেন। যে ভাবে গাড়ীগুলো রয়েছে, গরুগুলি একটু অসাবধানে নড়লে চড়লে গাড়ী কাত হয়ে' নীচে পড়ে' যাবে। সবাইকে জেগে থেকে গাড়ী পাহারা দিতে হবে। সুধাংশুবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাদের গাড়ীর পাশে দাঁড়ালেন। চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, গৌরী কোথায়? বল্‌লাম, সে জন্যই বলি নিজের গাড়ীর খোঁজ খবর রাখবেন। গৌরী শকুন্তলাদি'র কাছে আছে। ঘাস নামানো হ'লেই আবার গাড়ীতে উঠে বসবে।

এমন সময় কম্পাউণ্ডারবাবুর মেয়ে আভা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চুপি চুপি আমার কাছে এসে বল্‌লে, অশোকদা, আপনার গাড়ী থেকে আমাকে একটু জল দেবেন? তেষ্টায় আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। বল্‌লাম, আমার গাড়ীতেও জল নেই। আচ্ছা, তুমি দাঁড়াও, ঐ গৌরীদের গাড়ীতে জল আছে, এনে দিচ্ছি। আভা দাঁড়িয়ে রইল। জল আনতে গেলাম। গৌরীর মা চায়ের কাপে করে' আধ কাপ জল দিলেন। জলটা নিজেই খেয়ে ফেললাম। আমারো গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। আর এক কাপ চাইলে গৌরীর মা বল্‌লেন, জল আর কে খাবে? জল কিন্তু আর নেই। বল্‌লাম, আভা খাবে। এবার সিকি কাপ জল দিলেন। আভাকে এনে দিলাম। বললাম, আর নেই, এটুকুই খাও। আর কিন্তু জল পাবে না। আভা জলটুকু মুখে ঢেলে' দিয়ে বললে, আচ্ছা, জল আর চাইব না। জল খেয়েই আভা ভীষণ বমি করতে লাগল। ভাবলাম, কলেরার পূর্ব লক্ষণ। ভয়ে শরীর কাঁপতে লাগল। বললাম, কি হলো আভা? বমি কর্‌ছ কেন? আমার কোমর জড়িয়ে ধরে' বললে, ভীষণ পচা দুর্গন্ধ পাচ্ছি, তাই বমি আস্‌ছে। আমার ভয় করছে। আমাকে গাড়ীর ওপর উঠিয়ে দিন। নীচে ভয়ানক পচা গন্ধ। তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বেলে' আলো ধরলাম। অমনি আবার নিবিয়ে ফেলে ওকে পাঁজা কোলে করে' তুলে নিলাম। কিসের পচা গন্ধ বুঝতে আর বাকী রইল না। দুটো মড়া একত্র জড়াজড়ি অবস্থায় পড়ে' আছে। রাস্তা থেকে একটু নীচে গুহার ধার ঘেঁষে। একটা গাছের গোড়ায় ঠেকে'

রয়েছে। পাছে আভা দেখে ভয় পেয়ে চীৎকার করে' ওঠে ভেবে' ওকে আর কিছু বল্‌লাম না। পাঁজা কোলে এনে ওকে ওদের গাড়ীতে বসিয়ে দিলাম। শকুন্তলাদি' গাড়ীতে উঠে বসেছেন। গৌরী নীচে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইছে। শকুন্তলাদি' বললেন, একি! আভা বমি কর্‌ছে কেন? বল্‌লাম, কিছু নয়, খালি পেটে জল খেয়েছে কিনা তাই। কম্পাউণ্ডার-বাবু তাড়াতাড়ি তার পকেট্‌ থেকে কর্পূরের শিশিটা বার করে' আভার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, নাকের কাছে ধরে' টান। টানতেই আভার বমি থেমে গেল। কম্পাউণ্ডারবাবু বল্‌লেন, ভাগ্যি কর্পূরের শিশিটা পকেটে ছিল। ওষুধের বাক্সটা যে কোথায় গেল তার কোন হদিশ নেই। আভা সুস্থ হলো কিন্তু ওদিকে শান্তিদি'র ছেলেটা যায় যায়। শান্তিদি' বসে' বসে' কাঁদ্‌ছেন। বললেন, একটু গরম জল দিতে পারবেন? বাঁচবে তো নাই, না খেয়ে মরবে কেন। হরলিক্‌স্‌ আছে? একটু খাইয়ে দিতাম। রামকিষণ, বসির এরা সব গাড়ীর নীচে বসে' তামাক খাচ্ছে। ধমক দিয়ে বল্‌লাম, শীগগীর এসো, গরম জল করতে হবে। পকেট্‌ থেকে দেশলাইটা বার করে' দিলাম। ওরা গরুর খড় দিয়ে অগুন জ্বেলে' গরম জল করে' দিল। হরলিক্‌স্‌ খেয়ে ছেলেটা একটু ঘুমিয়ে পড়্‌ল। মনে বেশ ভরসা পেলাম।

গৌরীর কাছে গিয়ে বল্‌লাম, যাও, এবার গাড়ীতে উঠে বস গিয়ে, ঘাস টানা শেষ হয়ে গেছে। গৌরী গিয়ে গাড়ীতে বসে' বললে, আপনিও যান। ভয়ানক শীত পড়েছে। এই শীতের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? বললাম, কিন্তু তোমাদের জন্যই

তো ভয়। গাড়ী যে অবস্থায় রাখা হয়েছে, কোন্ সময় যে কাত্ হয়ে' পড়ে' যায়! ও বললে, তাহ'লে আপনার দারোয়ান আর চাকরগুলো রয়েছে কি জন্য? তাদের ডেকে দিন্। আপনি গাড়ীতে বসে' একটু ঘুমিয়ে নিন, নইলে শরীর টেঁক্‌বে না।

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। প্রতিটি পা ফেলে চলি অতি সাবধানে। কোন্ সময় গুহায় পড়ে' যাই। পা তো সর্বদাই কাঁপছে। ওদের নাম ধরে' ডাকলাম। কেউ সাড়া দিলে না। শেষে টর্চ জ্বেলে' খুঁজতে লাগলাম। দেখি পেছনে অনেক দূরে সরে' গিয়ে পাহাড়ের গায় হেলান দিয়ে সবাই জড়ো হয়ে' বসে' ঘুমোচ্ছে। অনেক রাগারাগি করলাম। ধমকিয়ে অনেক ভয় দেখালাম যে, তোমাদের ফেলেই যাব। এক পয়সাও খরচ দেব না। কিন্তু সবই ব্যর্থ। আজ কে শোনে কার কথা? কে প্রভু কে ভৃত্য? এ পথে আজ সবাই সমান। তাছাড়া সমস্তদিন এরা সব গাড়ীর সাথে সাথে হেঁটে এসেছে। এক কাপ জল পর্যন্ত কেউ খেতে পায়নি। সামান্য জল যা আছে তা ছেলেপেলের জন্য। এ অবস্থায় সারা রাত বসে' জেগে থাকা অসম্ভব। যে যেখানে আছে সে সেখানেই বসে' বসে' ঘুমোচ্ছে। বাধ্য হয়ে চুপ করে' রইলাম। কম্পাউণ্ডারবাবুকে বল্‌লাম, তা হ'লে আপনি আর আমিই জেগে থেকে গাড়ী পাহারা দিই।

কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, জেগে তো আছিই। ঘুম কি আর আমার চোখে আছে? সর্বদাই মাথা গরম। শকুন্তলাদি' বললেন, কোথায় তুমি জেগে থাকো? বার বার ঘুমে ঢুলে' ঢুলে' আমার ওপর এসে পড়ছ। আর গাড়ীটা অমনি দুলে' উঠে।

গাড়ীটা যদি পড়ে' যায় ? যে তটস্থ অবস্থায় গাড়ী রয়েছে, আমার তো সর্বদা ভয় করছে। এর চেয়ে নেমে দাঁড়িয়ে থাকা ভাল। কথা শুনে' কম্পাউণ্ডারবাবু তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চোখ কচ্‌লিয়ে সোজা হয়ে' বসে বললেন, বল কি, গাড়ী দুল্‌ছে ! শীগগীর্ নেমে পড়। শকুন্তলাদি' এবার ধমক দিয়ে বললেন, নামতে হবে না। তুমি সোজা হয়ে' চুপ করে' বস, ঢুলতে পারবে না।

রাত তখন গোটা তিনেক। কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, অশোকবাবু, আগুন আছে ? একটু আগুন যোগাড় করতে পারেন ? শীতে একেবারে বরফ হয়ে' গেছি মশায়। রক্ত জমে' হিম হয়ে গেছে। বললাম, আচ্ছা, আমি আগুন জ্বেলে' দিচ্ছি। তাড়াতাড়ি কতকগুলি গরুর খড় টেনে' পকেট্ থেকে দে'শলাই বাক্সটা বার করে' আগুন জ্বেলে' দিলাম। কম্পাউণ্ডারবাবু আস্তে আস্তে গাড়ী থেকে নেমে একেবারে আগুনের ওপর এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বললাম, কাপড়ে আগুন ধরে' যাবে যে ; একটু সরে' বসুন। বললেন, সমস্ত শরীর পুড়ে' গেলেও সহ্য হবে, কিন্তু এ শীত আর সহ্য হয় না।

সারা রাত গাড়োয়ানরা কে কোথায় ছিল জানি না। রাত্রি ভোর হ'লে ওরা এসে তাড়াহুড়ো আরম্ভ করে' দিল। আগের গাড়ীর গরু নাকি ভাল হয়ে' গেছে। রাস্তা এখন পরিষ্কার। এখনই গাড়ী ছাড়বে। শান্তিদি'র কাছে গিয়ে বললাম, খোকা কেমন আছে ? এখন ঠিক হ'য়ে বসুন। আমাদের আগের সব গাড়ী নাকি রাত চারটেয় রওনা হয়ে' গেছে।

আমরা তাড়াতাড়ি করে' সকলেই গাড়ীতে উঠে বসলাম।

এবার কেউ আর হাঁট্‌তে চায় না। সারা রাত কেটেছে খানিক বসে' খনিক দাঁড়িয়ে পাহাড়ের গায় হেলান দিয়ে গভীর অন্ধকারে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আর শীতে অর্ধেক মরে' গিয়ে। এখন আর হাঁট্‌তে এক পাও সরে না।

গাড়োয়ানদের অমানুষিক বকাবকি সত্ত্বেও প্রায় সকলেই গাড়ীতে উঠে বসলাম। ভোরের শীতটা যেন গায় কাঁটা বিঁধে দিচ্ছে। রোদ উঠলেই আবার হাঁটা যাবে একথা বলে' গাড়োয়ানদের শান্ত কর্‌লাম। কিন্তু রোদ আর উঠে না। হয়তো সূর্য উঠে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু সে যে কোন্ পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে তা বোঝা দুঃসাধ্য। বেলা তখন আটটা বেজে গেছে। হঠাৎ দেখি সূর্যদেব পাহাড় ছাড়িয়ে ওপরে উঠছেন। রোদের ঝিলিক্ ঘন অরণ্যের আড়ালে উঁকি দিচ্ছে। একটু আলোর উত্তাপ সকল দেহে পাবার জন্য মনের ভিতর কত কাকুতি-মিনতি পূর্বদিকে চেয়ে। কিন্তু পেলাম্ না, শীতেই কাঁপছি। কারো সঙ্গে শীত বস্ত্র নেই, সূতোর সামান্য জামা গায়। পথ চল্‌ছি নিঃস্ব হ'য়ে, ভিখারীর বেশে। রোদ গায় না লাগুক, কিন্তু এই পৃথিবীতে যে সূর্য আছে, আলো আছে, রাত্রির অন্ধকারের পর আবার যে উষার আলোক নেমে আসে—এই আনন্দেই যেন সমস্ত দেহ মন উত্তপ্ত হয়ে' উঠ্‌ল। ওপরে আলো ভরা আকাশের দিকে চেয়ে এখন কত আনন্দ! সারাটা রাত যে ভাবে যে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীতে কেটেছে। ভেবেছিলাম, সমস্ত পৃথিবী বুঝি এমনি চির অন্ধকারে ডুবে গেছে। পৃথিবীতে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ভরা আলো বুঝি আর নেই।

আমরা শুধু অন্ধকার দেশের অন্ধ জীব। আলোর দেশের মানুষ আমরা আর নই, অন্ধকার অরণ্য-গুহা-বাসী চির রাত্রি-বন্দী জীবশিশু মাত্র।

কাজেই এবার আলো দেখে' আবার যেন নূতন ধরা ফিরে' পেলাম। ফিরে' পেলাম নূতন প্রাণ, নূতন দেহ; নূতন চোখ; আর নূতন চলার আনন্দ। আমরা একে একে আবার সবাই গাড়ী থেকে নেমে' হাঁটতে লাগলাম। গাড়োয়ানরা দেখে খুসী হলো। তার চেয়ে বেশী খুসী হলো গরুগুলি। গাড়ী হাল্‌কা হ'লেই গরুগুলির পথে চলার আনন্দ। কারণ পায়ের গতি হয় তখন তাদের সহজ এবং দ্রুত। বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কে চলতে চায়? ঘাড়ের বোঝা, মাথার বোঝা, সংসারের বোঝা যত কমানো যায় পথে চলতে তত আনন্দ তত সুখ। জীবন যত হয় হাল্‌কা সমুখের পথে, জীবনের পথে, আলোকের পথে, অগ্রসর হওয়া তত হয় সোজা। সহসা সাধু সন্ন্যাসী ও সর্বত্যাগী পরিব্রাজকের কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল তাদের গৃহহীন বাধাহীন বোঝাহীন সুন্দর জীবনের কথা। তারা পেছনে ফেলে আসে বাইরের সমস্ত আয়োজনের অর্থশূন্য বোঝা, ছুটে চলে জীবনের পরম আনন্দময় পথে, খুঁজে' পায় স্বর্গীয় সুষমা মহিমা। কিন্তু ঘরের মানুষ সংসারের মানুষ চিরকাল ভারবাহী পশুর মত অন্ধ। বোঝার ভারে নুয়ে-পড়া-পা দু'খানা কোন প্রকার ঠেলে নিয়ে চলে সামনের দিকে। সহসা একদিন মাঝ-পথে এসে ভেঙ্গে পড়ে, আর সমুখের পথে, পরম আনন্দময় জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে পারেনা। পথের মাঝে

হারিয়ে ফেলে জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন। পড়ে' থাকে পেছনে ঘর সংসারের মৃত্যুময় মায়াময় অর্থশূন্য কোলাহলের মাঝে। সেথায় কর্ণ হয় তার বধীর, পরম জীবনের বাণী কোনদিনও তার কানে পৌছেনা।

নিজেদের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। আমরা সাধু নই; সন্ন্যাসী নই; পরিব্রাজকের গৌরিক বেশও আমাদের নাই তবুও আমরা গৃহত্যাগী, সংসার ত্যাগী নিঃস্ব সর্বশূন্য কাঙ্গাল পরিব্রাজক। মাথায় সংসারের বোঝা নাই, পরনে নাই অনাবশ্যক বস্ত্র! ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া ক্যানভাসের জুতো পায়ে। অনাবৃত মস্তক, অর্ধ উলঙ্গ দেহ সকলের। পেছনে ফেলে এসেছি সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি। জীবনের বোঝা অনেকটা হাল্‌কা হয়ে' গেছে। সামান্য অস্থাবর বোঝা এখনো সঙ্গে আছে। পরিব্রাজকের লোটা কম্বল ছাড়া বিছানাপত্র ট্রাংক্ সুট কেশ ও সামান্য দু'একখানা থালা বাটিও সঙ্গে আছে। সংসারের ঘোর কালো মায়া এখনো এসব জিনিষ পত্রের সঙ্গে আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরছে। গৃহত্যাগী সংসারত্যাগী আমরা, এখনো ঘোর গৃহী, ঘোর সংসারী। এখনো আমাদের পথের ধারে সংসারের ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনের সুর। কিন্তু সুখের বিষয় সেই সুর এখন ক্রমশঃ যেন ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হ'য়ে কানে বাজছে; আমাদের এগিয়ে চলার গতির কাছে সেই সুর যেন ক্রমশঃ মন্দীভূত হ'য়ে আসছে। আমরা যেন কি এক নূতন সন্ন্যাসী জীবনের সুর সর্বদা সমুখের পথে শুনতে পাচ্ছি। সমুখের উচ্চ গিরির শিখরে দাঁড়িয়ে এক অচিন্তনীয় বিরাট

সন্ন্যাসী মহাপুরুষ যেন ডেকে বলছেন, এগিয়ে এসো এ পথে ; এ পথ ভয়ের নয়, দুঃখের নয়। এ পথ ত্যাগের, শান্তির মহা-মিলনের—এ পথ মুক্তির। ভুলে যাও তোমাদের সংসারের সমাজের সভ্যজগতের শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন শিল্প-সাহিত্যের কথা। এ পথের শিক্ষা অসীম অনন্তকে জানা : এ পথের জ্ঞান, তোমার নিজের আত্মাকে জানা ; এ পথের বিজ্ঞান তোমার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মহাশক্তিকে বুঝা ; এ পথের শিল্প-সাহিত্য ঐ দিগন্তব্যাপি নীরব নিস্তব্ধ গিরিশ্রেণী আর চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা খচিত ওপরের অনন্ত আকাশ।

আজ এ পাহাড়ী পথে বার হ'য়ে এসে আমরা হাজার হাজার লোক সত্যি এক নূতন অনুভূতিতে যেন ভরে' উঠলাম। মনে হলো, সত্যি আজ আমরা নূতন দেশের নূতন সন্ন্যাসী। পেছনে ফেলে-আসা-সভ্য সমাজের সমস্ত আচার বিচার রীতি নীতি সংস্কার ধর্ম জ্ঞান বিজ্ঞান বিবর্জিত পরম বিশুদ্ধ মানুষ-আমরা ; সন্ন্যাসীর বেশে অসীমের সন্ধানে এগিয়ে চল্‌ছি।

চট্টগ্রামের শত শত মুসলমান আমাদের সাথে সাথে পায়ে হেঁটে চল্‌ছে। মানে তারা অনেক পেছন থেকে এসে এবার আমাদের সাথে একত্র হয়েছে। সকলের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে বেদনা-ক্লিষ্ট প্রাণ ; অনাহারে অনিদ্রায় সকলের দেহ যেন ভেঙ্গে পড়েছে। ধূলি ধূসরিত অর্ধ নগ্ন দেহ। নিপীড়িত জীবনের মর্মভেদী আর্তনাদ সকলের চাউনিতে ; ক্ষীণ দীন মৃত্যুময় নিঃশ্বাস সকলের বুকের তলে স্পন্দিত। পায়ের তলে বন্ধুর পার্বত্য পাষাণ পথ। প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যু যেন জেগে উঠে পায়ের নীচ থেকে।

বেঁচে থাকবার বিপুল স্পর্ধা তবু আমাদের সকলের।

সম্মুখে চেয়ে দেখি প্রায় ষাট সত্তর বছরের এক বৃদ্ধ মুসলমানকে তার দুটী জোয়ান ছেলে ছিঁকায় ঝুলিয়ে কাঁধে করে' নিয়ে চলেছে। অবাক হয়ে' চেয়ে ভাবছি ; পিতার প্রতি পুত্রের এ কর্তব্যের দৃষ্টান্ত দেখে মনে সন্দেহ হলো। এ পথ কি সাধারণ মনুষ্য সমাজের পথ ? কর্তব্য অকর্তব্য বিবেচনা করে' পথ চলতে হবে ? এ পথে কে কার ? কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ……। এ পথ শুধু যাত্রীর পথ, এক মহা-সত্যানুসন্ধানের পথ। প্রত্যেকেই এখানে অসীম একা, সাথী নেই, সঙ্গী নেই, পিতা নেই মাতা নেই, স্ত্রী পুত্র কন্যা নেই ; এখানে শুধু তুমি একা। তবে ? মনে প্রশ্ন জাগল। হটাৎ পেছন থেকে গৌরী ডাকলে, অশোকদা। পেছনে ফিরে চেয়ে বললাম, কিছু বলবে ? ও বল্‌লে, হ্যাঁ জিজ্ঞেস করছি, পথ আর কতদূর ? প্রশ্ন শুনে' চম্‌কে উঠলাম ; এ পথ আর কতদূর ? এ পথের শেষ কোথায় ? কে দেবে তার উত্তর ? শুধু বল্‌লাম, পথ যতদূরই হোক ; ভয় কি তোমার ? আমিই তো রয়েছি সঙ্গে। গৌরী আশ্বস্ত হ'য়ে চুপ করে' রইল ; শত শত মাইল পথের দূরত্ব যেন এক মিনিটে ওর কাছে এতটুকু হ'য়ে গেল, এমনি হাসি খুসী মুখের ভাব নিয়ে গৌরী চুপ করে' রইল। অবাক্ হয়ে' ভাবলাম গৌরীর বাইরের জগৎটা যেন ওর কাছে এতটুকু এবং একেবারে অর্থশূন্য হ'য়ে গেছে। ওর চোখের সামনে আমিই যেন এতবড় একটা বিরাট কিছু হয়ে' দাঁড়িয়েছি। আমি যা বলি সবি যেন সত্য, আকাশ বাণীর মতই ধ্রুব। অধীর বিস্ময়ে ওর

দিকে ফিরে আর একবার চাইলাম। যতবার ভাবি, আমরা এ পথে সবাই একা, কেউ কারো নয় ; এ পথ মহাপ্রস্থানের পথ ; চলতে হবে একা, ততবারই গৌরী যেন পিছন থেকে আমাকে মায়ার সুরে ডেকে আমার সে সব দার্শনিক ধারণা ভেঙ্গে চুরমার করে' দেয়। গৌরী যেন বলতে চায়—যে প্রেম অসীম মিলনের পথে, সে প্রেম পথে একা চলতে পারে না ; সমুখের পশ্চাতের, ডানে বাঁয়ের পথের মাঝের সব মানুষকে সাথী করে' তাকে চলতে হয় পথ। তাই আমার এই একলা পথে চলার জীবনটার সমুখে গৌরী এক বিরাট প্রেমের মূর্তি ধরে আমাকে যেন বার বার বল্‌ছে, কেউ একা নয়, এ অনন্ত পথের সাথী অনন্ত প্রেম।

এবার আমার গাড়ীর ঠিক আগে আগে সিঁকায়-বয়ে-চলা ঐ বুড়ো মুসলমানটি চল্‌ছে। তাকে বল্‌লাম, বুড়ো, তোমার তো বেশ বয়েস হয়েছে, জীবনে পথে-চলার অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট আছে, বলতে পারো এ পথ আর কতদূর ? বুড়ো চুপ করে' কতক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বল্‌লে, হ্যাঁ বাবু, জীবনের অভিজ্ঞতা যথেষ্টই ছিল কিন্তু আজ এ পথে বেরিয়ে সব চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেছে। আগে বলে' দিতে পারতাম কোন্ পথটা কতদূর। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সেদিনকার আমার পথ চেনাটা ছিল কত বড় ভুল করা। সেদিনকার পথ চেনা, মানুষ চেনা, সমাজ সংসার চেনাটা আজ মনে হয় সবই যেন ভুল চোখে চিনেছিলাম। আজ বনের এই পথে এসে মনে হয় সেদিনের চেনার সঙ্গে আজকের চেনার অনেক পার্থক্য। বল্‌লাম, কি

রকম? বুড়ো আবার একটু চুপ করে' কি একটু যেন চিন্তা করে বল্‌লে, আজ মনে হয় পথ অনন্ত, এ পথের শেষ নেই—পথিক শুধু প্রেমিক মানুষ, সমাজ সংসার শুধু মহামানবের। বলে' সে কেঁদে ফেল্‌ল। বৃদ্ধের চোখের জল খুব ভাল লাগ্‌ল। সে চোখের জলের মাঝে গৌরীকে যেন আরো একটু ভাল ভাবে দেখতে পেলাম। বুড়োকে বল্‌লাম, বড় দুঃখ হয় তোমাকে এই ভাবে বয়ে' নিতে দেখে। এ ছেলে দু'টী বুঝি তোমারই? সে চোখ মুছে বললে, আজ মনে হয় শুধু এরা ছেলে নয়, পথে চলার পরম সহায়। তার কথা শুনে' নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম আর কিছু বলতে ইচ্ছা হলো না। নীরবে পথ চল্‌ছি।

বেলা যত বাড়ছে পাহাড়ের কঠিন প্রস্তরময় মূর্তি তত রুদ্র-বেশে চোখের সামনে ভেসে' উঠ্‌ছে। আগ্নেয়গিরি নয়, সামান্য রূঢ় ও বাস্তব পাহাড়। কিন্তু মনে হচ্ছে প্রত্যেক পাহাড়ের চূড়ার চারিপাশময় যেন আগুন জ্বল্‌ছে। আগুন মিশ্রিত ধোঁয়াগুলি যেন সমস্ত পাহাড়শ্রেণী বেষ্টন করে' এক মহা বিভীষিকার সৃষ্টি করছে। সূর্যের প্রচণ্ড বহ্নি-কিরণ পাহাড়ের গায়ে গলে' পড়ছে। চারিদিকে চেয়ে চোখ ঝল্‌সে' গেল। চোখের পাতায় অনল-উত্তাপ এসে যেন লাগ্‌ল। চোখে জল এসে পড়্‌ল। ঝাপ্‌সা চোখে আবার চেয়ে দেখি শুধু জ্বলন্ত পর্বতমালা আর অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষশ্রেণী রোদের তাপে বৃক্ষের লতাপাতা সব জ্বলে' পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মনে হয় আগুন লেগে পাহাড় আর অরণ্য সব ভস্মীভূত হ'য়ে

গেছে। গাছের ডালপালা সব অর্দ্ধদগ্ধ মসীকৃত। দাবানল কেমন তা কোনদিন দেখিনি শুধু শুনেছি একটা ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু আজ এই দগ্ধীভূত পাহাড়-পর্বত-অরণ্যশ্রেণী দেখে মনে হলো, একেই বলে দাবানল জ্বালা, একেই বলে পার্বত্য-হোমানল। দিক্-দিগন্তব্যাপী ঠিক একই ভস্মীভূত পাহাড়ের রূপ। একই মহাশ্মশানের মৃত্যুময় মহাকালের পরিপূর্ণ রূপ। প্রকৃতিজননীর স্নিগ্ধ-শীতল শান্ত সবুজের রূপ দেখেছি, দেখেছি তার প্রাণপুঞ্জ শ্যামল সুন্দর পুষ্পিত লতাকুঞ্জের স্নেহময় মায়াময় মাতৃ-মাধুরী। দেখে জুড়িয়েছি মন-প্রাণ, স্নিগ্ধ করেছি নয়ন দু'টী। কিন্তু আজ এখানে এসে সেই বিশ্বপ্রকৃতির এই বহ্নিঝরা মরুতপ্ত জ্বালাময় রূপ দেখে মনে হলো, প্রকৃতিজননী বুঝি পাহাড়-পর্বত-গুহা আর অরণ্যের ধারে এসে এমনি শ্মশানবাসিনী প্রলয়ংকরী বেশে জগৎ কাঁপায়; কাঁপায় এই পাহাড় পর্বতবাসী দৈত্যদানবের পাষাণ-আত্মা। মনে করলাম, প্রকৃতি হয়তো জননীরূপে বাস করে সেখানে যেখানে সমাজ সংসার নিয়ে বাস করে মানুষ। মাতৃরূপে হয়তো সেই মনুষ্য আবাস স্নিগ্ধ শ্যামলা সুফলা করে' রাখে। আবার হয়তো মনুষ্য-আবাস ছেড়ে এই বহুদূরে পাহাড় পর্বতে এসে বাস করে সংহারিণী রূপে।

আমাদের গাড়ী এবার সোজা খাড়াই হয়ে ওপরের পাহাড়ে উঠছে। ছেলেমেয়েদের এবার গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়েছি শুধু মালপত্র গাড়ীর মধ্যে আছে। কিন্তু গাড়ী এত খাড়া হয়ে উঠছে যে মালপত্র সব গাড়ীর সমুখ দিক থেকে পেছনের দিকে

গড়িয়ে পড়ে' সব ওলট্‌পালট্ হয়ে যাচ্ছে। জলের শূন্য টিনগুলো ঠন্‌ঠন্ শব্দ করে' গড়াগড়ি যাচ্ছে। বিছানা আর কাপড়ের গাঁটগুলি গাড়ী থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে' যাচ্ছে। আমরা গাড়ীর সাথে সাথে হেঁটে সেই সব জিনিষপত্র ধূলো-মাটী সহ তুলে' আবার গাড়ীতে রাখছি। কম্পাউণ্ডারবাবুর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাক্সটা এবার গাড়ীর এক অজ্ঞাত কোণ থেকে গড় গড় করে' গড়িয়ে নীচে পড়ে' গেল। ওষুধের ছোট শিশিগুলি ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। গাড়ীর অনেকটা পেছনে কম্পাউণ্ডারবাবু তাঁর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহখানি টেনে নিয়ে আসছেন। শিশি ভাঙ্গার শব্দ শুনে' মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়লেন। বল্‌লেন, আমার সর্বনাশ হলো! এত কষ্ট করে' ওষুধগুলি এনেছিলাম, সব গেল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবার বল্‌লেন, যেতে যখন বসেছে সবই যাবে। ওষুধের বাক্সটা এনেছিলাম ছেলেপেলের অসুখ-বিসুখের জন্য। শান্তি বৌমার ছেলেটার কি অসুখটাই গেল। এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারলাম না। তখন বাক্সটা খুঁজেই পেলাম না! এখন পড়্‌ল কোথা থেকে? আর পড়ল তো পড়ল একেবারে সব নষ্ট হয়ে গেল। বলে' কম্পাউণ্ডারবাবু আবার উঠে পথ চলতে লাগলেন। বৃদ্ধ রামতনু হুঁকা হাতে তামাক খেতে খেতে সকলের আগে আগে চল্‌ছে। তার সঙ্গে সুরেশ, বসির, রামকিষণ; এদের সবার কোলে-কাঁখে দু'একটি তাঁর ছেলেপিলে। এই খাড়াই পাহাড়টা পেরিয়ে গেলেই আবার সকলে উঠে গাড়ীতে বসবে। শান্তিদি'র ছেলেটি এবার বেশ সুস্থ হয়েছে। মার কোলে হাত

পা নেড়ে মাঝে মাঝে খেলা কর্‌ছে। শান্তিদি' সেই আনন্দে হেসে বল্‌লেন, এখন রান্না করে' খেয়ে নিলে হয় না ? খোকা এখন বেশ খেলা কর্‌ছে। বল্‌লাম, এই দুর্জয় খাড়াই পাহাড়টা পেরিয়ে গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করব। তাছাড়া এই পাহাড়টার ওধারে নাকি জল আছে ; এখানে তো এক ফোঁটাও জল নেই। রান্না হবে কি দিয়ে ? শান্তিদি' বল্‌লেন, কিন্তু খোকাকে আবার একটু হর্‌লিক্‌স দিলে হ'ত। জল কি একেবারেই নেই ? বল্‌লাম, সঙ্গে নেই তবে পাওয়া যাবে। এখন খোকাকে না হয় একটু বুকের দুধ দিন। শান্তিদি' বল্‌লেন, বুকে দুধ থাকবে কোত্থেকে ? আজ কতদিন হয় পথে বেরিয়েছি, অনাহারে অনিদ্রায় সমস্ত শরীর শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ; দেহে রক্ত আছে কি না আছে—এই মরা দেহ থেকে খোকা কি দুধ বার করতে পারবে ? শান্তিদি'র দিকে একবার চেয়ে দেখলাম, রক্তমাংস-বিবর্জিতা এক কংকাল মূর্তি। ছায়ার মত দেহটা যেন কোনপ্রকারে বয়ে' নিয়ে পথ চল্‌ছেন। শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, শান্তিদি'র দিকে চেয়ে আমারও দুঃখ হয়। কি চেহারা হয়েছে ! এতটুকু পথ আসতেই এমন চেহারা—আরো কত পথ এখনো সামনে। তখন যে তাঁর কি অবস্থা হবে সেই কথাই ভাবছি। শরীরে যেন রক্তমাংস নেই, থাকবেই বা কোত্থেকে ? এ বয়সেই শান্তিদি'র আটটি সন্তান হয়েছে। বছর বছর নাকি একটি করে' সন্তান। এতো রোগা শরীরে এত সন্তান ! সন্তানগুলিও হয়েছিল সব রোগা। তাই সব মরে' গেছে, বাকী আছে মাত্র কোলের এই ছেলেটি। নিজের দেহের রক্তমাংস ক্ষয়

করে' কতগুলি রোগা সন্তানের মা হ'তে চাইনে বলেই তো বৃদ্ধ স্বামী বিয়ে করলাম। আগের পক্ষের তিনটি ছেলে আর একটি মেয়ে—ওরাই আমার সন্তান—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনআর সীতা করে' গড়ে' তুলব সবাইকে। স্বাধীন আমি সেই নারীকেই বলি, যে শক্তিসঞ্চয়ে স্বাধীন।—হাঁটুন, হাঁটুন, আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছেন?

শকুন্তলাদি'র কথা শুনে' পা আর চল্‌ছিল না। পথের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম আবার চলতে লাগলাম। বল্‌লাম, আপনি কি তাহ'লে জননী হ'তে চান না? শকুন্তলাদি' একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, না। অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? একটু চুপ করে' কি ভেবে বল্‌লেন, বিধ্বস্ত বর্তমান ইউরোপ ও এশিয়ার দিকে চেয়ে এ কথাই মনে হয়—পৃথিবীতে অত্যধিক লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই দেশে দেশে যুদ্ধ, দেশে দেশে ধ্বংস-লীলা। আজ পৃথিবীতে দু'শো কোটি লোক না থেকে বিশ কোটি লোক থাকলে প্রতি লোকের দশগুণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যেতো। অভাবের তাড়নায় দেশবাসীকে এমনি করে' কাটাকাটি মারামারি করে' মরতে হ'ত না। দেশে থাকত শান্তি।

বিরুদ্ধ জবাব কিছু খুঁজে' না পেয়ে বল্‌লাম, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবন যেখানে সেখানে জননী হ'তে হবেই, লোক-সংখ্যা বেড়ে যাবেই। কথা শুনে' শকুন্তলাদি' আমার মুখের দিকে চেয়ে শুধু হাসলেন। মনে হলো, লজ্জা পেলাম। বল্‌লাম, হাসছেন যে? ভগবানের নিয়মে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে সন্তান হবেই, লোক-সংখ্যা বাড়বেই। শকুন্তলাদি' বল্‌লেন,

কিন্তু বিধি যে আবার এ কথাও বলেছেন—অপরিমিত লোক-সংখ্যা যাতে না বাড়ে সে দিকেও লক্ষ্য রাখবে।

—কি করে?

শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, আমার মতে যদি দেশ চল্‌ত তবে আগামী দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে অন্ততঃ পঁচিশ কোটি লোক কমে' যেত।

—বলুন, শুনি আপনার মতটা।

শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, এখন থেকে অন্ততঃ এই পৃথিবীতে পাঁচ কোটি মেয়েকে অবিবাহিতা থাকতে হবে।

বল্‌লাম, বেশ। কিন্তু এই পাঁচ কোটি মেয়ের জীবনের উদ্দেশ্য তাহ'লে হবে কি? বল্‌লেন, বোকা সেজে যে জননীরা অধিক সন্তানের প্রসবিনী হয়েছেন তাঁদের ছেলেপেলে এদের মধ্যে ভাগ করে' দিতে হবে। তাদের লালন-পালন ও সুস্থ সবল করে' তোলবার ভার থাকবে এ পাঁচ কোটি মেয়ের ওপর। তারাই হবে কোটি কোটি সন্তানের জননী।

বল্‌লাম, বেশ কথা। কিন্তু খরচ চালাবে কে?

—দেশের সরকার।

কথা শুনে' গভীর চিন্তায় কিছুক্ষণ নিমগ্ন হয়ে রইলাম। পরে বল্‌লাম, পৃথিবীর শান্তিস্থাপনের জন্য এমনি করে' পাঁচ কোটি মেয়ের জীবন-উৎসর্গ—খুবই ভাল কথা। কিন্তু যুবতী মেয়ের বয়স কি সে কথা শুনবে? তাদের এক-আধটু পদস্খলন হবেই। তাতে দেশের করাপ্‌শেন্ যে আরো দশ গুণ বেড়ে যাবে।

শকুন্তলাদি' হাসতে হাসতে বল্‌লেন, করাপ্‌শন কথাটায়

আপনার দেখছি গা জ্বালা কর্‌ছে। কিন্তু বলতে পারেন, করাপ্‌ট কে নয়? স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা কি? করাপ্‌শনের শেষ সীমা নয় কি? আইন করে' একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে যথেচ্ছাচারী হ'তে দেওয়া—এ ছাড়া আর কি? বরং ছেলে-মেয়ের অবিবাহিত জীবন যতদিন ততদিনই তারা সংযমী। ততদিনই তারা স্বচ্ছল ও সুখী। মানবজীবনের সর্বশেষ অধঃপতন আর দারিদ্র্যের কারণ ছেলেদের চল্লিশ ও মেয়েদের তিরিশের আগে বিবাহ।

চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ পা থেমে' গেল। পথের ওপর দাঁড়িয়ে শকুন্তলাদি'র দিকে তিরস্কার ভরা চোখে চেয়ে আছি দেখে বল্‌লেন, থামলেন কেন, হাঁটুন। এই দুর্জ্জেয় কঠিন পথের চেয়ে মানবচরিত্র আরো দুর্জ্জেয় আরো কঠিন। আবার আজ আইন করে' আদালত করে' সমাজ থেকে বিবাহ-প্রথা উঠিয়ে দিন, দেখবেন মানবসমাজ আবার ঠিক ভাবেই চল্‌বে।

শকুন্তলাদি' যেন জোর করে' এক রকম ধম্‌কিয়েই আমাকে তাঁর কথাগুলি স্বীকার করে' নিতে বাধ্য কর্‌লেন। তাঁর বিরুদ্ধে আর কিছু বল্‌তে পারলাম না। চুপ করেই আবার হাঁটতে সুরু কর্‌লাম। বেলা তখন প্রায় বারোটা বাজে। মাথার ওপর প্রখর সূর্য। পাহাড়ের চড়াই পথে মানে খাড়াই পথে প্রায় আড়াই হাজার ফুট ওপরে উঠেছি। চারপাশের পর্বতশ্রেণীর দিকে তাকালে মনে হয় পৃথিবী যেন ক্রমশঃ ওপরে উঠে এসে আকাশে ঠেকিয়েছে তার মাথা। পৃথিবীতে সমতলভূমি বলে' কিছু আছে কিনা সে কথা

বিশ্বাস করতে পার্‌ছি না। ডাইনে বাঁয়ে সমুখে পেছনে শুধু আকাশ ছোঁয়া বড় বড় পাহাড় আর পাহাড়। শুধু জন-মানবহীন পাহাড় পর্বত আর ঘন অরণ্যের একচ্ছত্র আধিপত্য। মানুষ তো দূরের কথা—এমন কি একটা বন্য পশু পাখীর পর্যন্ত কোন সাড়া নেই—এমনি ভীতিময় নীরবতা। মাঝে মাঝে শুধু আমাদের গাড়ী চলার শব্দ সে নীরবতা ভঙ্গ করে' মনে একটু আশার সৃষ্টি কর্‌ছে।

পাহাড়ের চড়াই পথে উঠতে উঠতে পা দু'টো ফুলে' উঠেছে। ব্যথায় পা টন্ টন্ করে' ছিঁড়ে পড়ছে যেন। শিরা-উপশিরাগুলি ছিঁড়ে পড়তে চায়। কম্পাউণ্ডারবাবু পা থেকে জুতো খুলে' ফেলে দিয়েছেন। পায়ের পাতা এত ফুলে উঠেছে যে, জুতো আর পায়ে লাগছে না। জুতোর চাপে পা আগুনের মত জ্বল্‌ছে। পায়ে ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে' গেছে। মেয়েদের পায়ের দিকে চেয়ে দেখি সকলেরই পা শুধু। শুধু পা কেন? পায়ের দিকে চেয়ে সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হলো না। কিন্তু সব চেয়ে বেশী কষ্ট পাচ্ছি ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায়। ক্ষুধাটা কোনরকম সহ্য করে' নিচ্ছি, কিন্তু পিপাসা যেন সারা দেহে আগুনের মত জ্বল্‌ছে। নিশ্বাসপ্রশ্বাসে আগুনের উত্তাপ যেন বের হচ্ছে। বুকের ভেতরে যেন আগ্নেয়গিরি। হা হা কর্‌ছে দেহের সমস্ত ভিতরটা। দেহের জলীয় পদার্থ সব শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটা চড়ুই পাখীকে ধরে' হাতের মুঠোয় চেপে ধরলে তার বুকটা যেমন ধর্ ফর্ করে, তেম্‌নি আমাদের সকলের বুক ধর্ ফর্ কর্‌ছে পিপাসায়। Thy necessity

is greater than mine—যে তৃষ্ণার্ত সৈনিক পুরুষ জলের গ্লাস ফিরিয়ে দিয়ে এ কথা বলেছিল তার ত্যাগ যে কত বড় ভয়াবহ সে কথা ভাবতে গিয়ে প্রাণ শিউরে উঠ্ল। মনে হলো, পৃথিবীতে যদি কেউ প্রকৃত বীর থাকে তবে সে সেই সৈনিক পুরুষ। কিন্তু আমরা বীর নই, পিপাসা-কাতর সাধারণ মানুষ। জল নেই এক ফোঁটা। এ পাহাড়ের রাজ্য কতদিনে শেষ হবে জানিনা। কিন্তু জলের অভাবে যে আমরা শেষ হব সে কথা ভাবতে পারলাম না। পথের ওপর পায়ের নীচে পাহাড়ের উত্তপ্ত পাথর, ওপরে অনলবর্ষী সূর্য। মাঝখানে আমরা শ্মশানের মত জ্বল্‌ছি। কিন্তু উপায় নেই। চারিদিকের এই সাহারা-লীলা মাঝে মাঝে চোখ বুজে সহ্য করে' পথ চল্‌ছি। কিন্তু বুকের ভেতরের সাহারা-নৃত্য কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। তার ওপর অসহ্য পেটের ক্ষুধা। চাল ডাল সঙ্গে আছে ঐ পেছনের গাড়ীটায়। কিন্তু চাল তো চিবিয়ে খাওয়া চলে না; রান্না করার জল নেই আজ তিন চার দিন যাবত। জলশূন্য জলের টিনগুলি রোদের তাপে আগুন হয়ে আছে। একটু নাড়াচাড়া করলেই ঠন্ ঠন্ শব্দ করে' ওঠে। সে শব্দে মন ভয়ে কেঁপে ওঠে—হায় জল কোথায়!

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক—এই পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এক রকম বন্ধ। পিপাসায় জিহ্বা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে যেন। কর্ণ যেন বধির। নাসিকায় শ্বাস প্রশ্বাসের বেগ মন্দীভূত আর চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা। ত্বকে চিম্‌টি কাটলে ব্যথা পাই না। শিথিল বিকল সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

বাইরের চেহারা মৃত মানুষের মত। কিন্তু বুকের ভেতরে এখনো চল্‌ছে কাতর প্রাণ-স্পন্দন। মনে হয় বেঁচেই আছি। কিন্তু বাইরের আকৃতি দেখলে তা বিশ্বাস হয় না, মনে হয় মরে' গেছি। হঠাৎ জলের টিনগুলি ঠন্‌ঠন্ করে' বেজে উঠ্‌ল। গাড়ীর গরুগুলি পর্যন্ত এবার সেই শব্দে কাণ খাড়া করে' আমাদের দিকে চাইল। জল চায় তারা। কে বলে গরু বোবা জাত, গরুর ভাষা নেই। আজ গরুগুলি মাথা তুলে' কান খাড়া করে' চোখের জল ফেলে যে চাহনিতে আমাদের দিকে চাইছে, সে চাহনির ভাষার কাছে মানুষের সমস্ত ভাষাই ব্যর্থ বলে' মনে হলো। হায়! এক ফোঁটা জল যদি গরুগুলিকে দিতে পারতাম! আমাদের মত ওরাও যে পিপাসায় মরে' যাচ্ছে।

আজ দু'দিন যাবত শুনে' আসছি আর একটু সামনেই জল আছে। কিন্তু এ দু'দিনে প্রায় কুড়ি পঁচিশ মাইল পথ এলাম, তবু সেই "একটু সামনে" আর ফুরায় না। যত যাই ততই শুনি আর একটু এগিয়ে গেলে জল পাওয়া যাবে। গাড়ীর পেছন ঠেলে ঠেলে দৈনিক বারো তেরো মাইলের বেশী পাহাড়ের খাড়াই-পথে এগিয়ে যাওয়া যায় না। নিজের দেহভার টেনে পাহাড়ের ওপরে ওঠাই দায় তার ওপর আবার গাড়ী ঠেলে ওঠা—সে যে জীবনের কত বড় অভিশাপ—ক্ষুধিত তৃষিত শ্রান্ত অবসন্ন দেহের ওপর কত বড় বোঝা—সে কথা আজও ভাবতে পারি না। এ অবস্থায় দু'তিন দিন হেঁটেও যখন সেই একটু এগিয়ে গিয়ে জল পাচ্ছি না, তখন

মনে হলো, আমরা যেন সাহারার বুকে পথ-হারানো তৃষিত পথিক; জলের অভাবে দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই সকলে মিলে' মারা যাব। হা-হা কর্‌ছে বুকের তল! খাঁ খাঁ কর্‌ছে সমুখের শুক্‌নো ঘন অরণ্য আর পাহাড় পর্বত। প্রায় এক মাইল ওপর থেকে গুহার গভীরতা দেখা যাচ্ছে। স্বচ্ছ-শীতল-জল-ব্যাকুল কোন নিভৃত ঝরণা-ধারাই চোখে ঠেক্‌ছে না। চোখে ভাসে শুধু সূর্যকিরণ-তপ্ত গিরি-গহ্বরের তলদেশ। রোদে তপ্ত বালুকণা ঝাঁ ঝাঁ কর্‌ছে। ব্যর্থ হয়ে গিরিগুহা থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে আবার পথ চল্‌ছি। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি সমুখে মড়ার রাজ্য। পথের দু'ধারে সারবন্দী মৃত মনুষ্যের দেহ। জিব্‌ বার করে' চোখ উল্‌টে পড়ে' আছে। কারো দেহে ময়লা ছেঁড়া কাপড় আবার কারো দেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত। জলের অভাবে মরেছে তারা। ভয়ে থর থর করে' পা কাঁপতে লাগল। সহসা কম্পাউণ্ডারবাবু চীৎকার করে' উঠে বল্‌লেন, আমার যেন কেমন কর্‌ছে। চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, সবই যেন অন্ধকার। তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে' একটা গাছের নীচে বসিয়ে শান্ত ও সুস্থ কর্‌লাম। তিনি বল্‌লেন, অশোকবাবু, আর বাঁচব না—জলের অভাবে লোক এমনি করে' মরে! পথের দু'ধারে এতো মড়া! জলের পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠ হয়েই যে এই লোকগুলো মারা গেছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কথা গোপন করে' কম্পাউণ্ডারবাবুকে সাহস দিয়ে বল্‌লাম, জলের অভাবে নয়, এরা সব কুলি-মজুর লোক,—আমাদের মত গাড়ী করতে পারেনি, সঙ্গে চাল

ডাল আনেনি, তাই অনাহারে আর পথশ্রমে মরেছে। আর একটু সামনেই আমরা জল পাবো। আপনি এবার গাড়ীতে উঠে বসুন। বলে' তাঁকে ধরাধরি করে' গাড়ীতে বসিয়ে দিলাম।

আমরাও এখন সবাই মিলে গাড়ীতে উঠে বসলাম। হাঁটতে আর পারছি না। পা দু'টো ফুলে' আর ফেটে রক্ত পড়ছে। প্রতিক্ষণেই আমার মনে হচ্ছে—ফিট হয়ে যেন পড়ে' যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি চোখ বুঁজে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থেকে নিজকে সামলিয়ে নিই। এবার পাহাড়ের ওপর প্রায় তিন হাজার ফুট উঠেছি। এখন পথ ক্রমশঃ সোজা ও সমতল! মনে হলো: গিরিরাজ্যে সমতলভূমির পৃথিবী পেলাম। সমতল-ভূমির ওপর দিয়ে হাঁটতে পারলেই এখন মন খুসীতে ভরে' ওঠে। পাগুলি যেন একটু জুড়োয়, পায়ের টন্‌টনে ব্যথা একটু কমে। বুকের ঘন শ্বাস একটু হাল্‌কা হয়। আজ চার পাঁচদিন যাবত কেবল খাড়াই পথে উঠছি। পাহাড়ের খাড়াই পথে উঠতে হ'লে যে দেহের সমস্ত ভার কতভাবে রক্ষা করতে হয় তা পদে পদে টের পাচ্ছি। আশী বছরের বুড়োর মত কখনও উপুড় হয়ে দু'হাতে মাটি ধরে' ধরে' উঠছি। এ সময় মনে হলো: আমরা যেন উষ্ট্রজাতীয় কোন জীব; পাহাড়-পর্বতেই আমাদের জন্ম। এ ভাবে প্রায় হাজার চারেক ফুট ওপরে উঠে শেষে আবার সমতলভূমির ওপর দিয়ে সোজা রাস্তা পেলাম এবং সকলেই সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ উপুড় হয়ে এসে এসে হঠাৎ এবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে কোমরে বেশ লাগল। ব্যথায় উহু করে' উঠলাম।

হ্যাঁ, এখন আমরা পাহাড়ের ওপর সমতল-ভূমি পেলাম। মনে হলো : পৃথিবী থেকে চার হাজার ফুট ওপরে যেন স্বর্গরাজ্য পেলাম। মাটির পৃথিবীর মানুষ এখন আর আমরা নই, আমরা যেন মানুষের পৃথিবী ত্যাগ করে' কলম্বাসের মত কোন নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করে' নূতন দেশে নূতন মানুষ হয়ে পথ চল্‌ছি। এখানে সমস্ত পাহাড়ের শিরোদেশ সমতলভূমির ওপর থাকায় এখন পথ কখনও সোজা কখনও আবার একই পাহাড় শতবার ঘুরে ফিরে বেষ্টন করে' কোথায় গিয়ে মিশেছে কে জানে? কিন্তু এই পথটা এখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় আর একটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে আঁকা-বাঁকা হয়ে অনেকদূর চলে' গেছে। দেখতে পাচ্ছি অনেক লোক পায়ে হেঁটে আর অনেক লোক গাড়ী করে' সেখান দিয়ে চলে' যাচ্ছে। পথ চল্‌তে চল্‌তে বেলা প্রায় একটার সময় হঠাৎ সমুখের গাড়ী থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাড়ীও। ব্যাপারটা তখনও বুঝতে পারলাম না। তবে কি বন্যজন্তু সামনে পড়ল? সমুখের দিকে অসংখ্য লোকের কোলাহল শুন্‌ছি কিন্তু লোক দেখ্‌ছি না। শুধু একটা কোলাহল সামনের পাহাড়টার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে। দেখলাম, সামনের কয়েকটা গাড়ীর গাড়োয়ান অর্ধমৃত গরুগুলিকে গাড়ী থেকে ছেড়ে পাহাড়ের গায়ে বেঁধে ঘাস দিচ্ছে। কিন্তু গরুগুলির অন্তরে আগুনের মত পিপাসা। শুক্‌নো খড় নাকে শুঁকে মুখ ফিরিয়ে এনে জলের শুক্‌নো টিনগুলির দিকে বারবার করুণ চোখে চাইছে। গাড়ী থেকে নেমে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখি প্রায়

হাজার পাঁচেক লোক রাস্তার ওপর বসে'। এত লোক এখানে জমা হবার কারণ কি? রাস্তা-ঘাট বন্ধ কি? শুনেছি মাঝে মাঝে সরকার থেকে পথ বন্ধ করে' দেবার আদেশ আসে। সে রকম কিছু কি? তবেই তো গেছি! এখানে এক মুহূর্ত দেরী করলে আর রক্ষা নেই। প্রাণ যে পিপাসায় যায়। আরো কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, লোকগুলি রাস্তার ওপর বসে' রান্নাবান্না কর্‌ছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে' জানলাম, এখানে নাকি জল পাওয়া যায় পথও বন্ধ নয়। রান্না করে' খাবার জন্যে এখানে এতো লোক জমা হয়েছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে আমাদের লোকের কাছে এ সুসংবাদ দিলাম। সংবাদ শুনে' সব গাড়ী থেকে নামবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। ছেলেপেলেরা আমার কথা শুনে' তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে মলিন-কাতর চোখে চেয়ে বল্‌লে, আমাকে গাড়ী থেকে আগে নামিয়ে দিন, আমি আগে জল খাবো। পিপাসায় মরে' যাচ্ছি। অশোকদা, আমি পিপাসায় কথা কইতে পার্‌ছি না, আমাকে আগে নামিয়ে দিন। মেয়েদের দিকে চেয়ে দেখি—তারাও জলের খবর শুনে' তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে আসছে, প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করে' জলের টিন। আমাদের বক্ষে জ্বলন্ত আগুনের মত মরু-পিপাসা। সাহারা যেন আমাদের প্রত্যেকের বুকে খাঁ খাঁ করে' জ্বল্‌ছে। এই মরুভূর আগুন নির্বাপিত করতে প্রয়োজন অনন্ত জলরাশি, অনন্ত সাগর-বারি। কাজেই আমরা জলের অন্বেষণে ছুটে চলেছি পাগলের মত। কোথায় জল? কোথায়

সাগর ধারা ? চারিদিকে দেখছি শুধু হাজার হাজার লোকের ক্ষুধাতুর ও তৃষাতুর ভীড়। তিন চারটা পাহাড়ের মাঝখানে যে সমতলভূমি আছে, তার মধ্যে সকলেই ভীড় জমিয়েছে। আমরাও সবাই এই ভীড়ে যোগ দিলাম। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলাম—বড় বড় পুরাতন বৃক্ষের মূল মাটি ফুঁরে' ওপরে উঠে এসে পড়েছে। তার ওপর উনুন করা হয়েছে। গাছের শুকনো ডালপালা দিয়ে আগুন ধরানো হয়েছে। প্রায় হাজারখানেক উনুন এ ভাবে চারিদিকে আছে। যারা চাল ডাল নিয়ে এসেছে তারাই রান্না করে' খাচ্ছে। আর পায়ে হেঁটে এসেছে হাজার হাজার যারা, তারা এখানে সেখানে মাটির ওপর, ঘাসের ওপর, লতাপাতার ওপর শুয়ে পড়ে' বিশ্রাম করছে, এবং রান্না করে' খাচ্ছে যারা তাদের ভাতের দিকে চেয়ে চেয়ে ঢোঁক গিলছে। ভাত দু'এক মুঠো কেউ কাউকে দিচ্ছে না। কারণ দেবার মত এক মুঠো ভাতও কারো বেশী নেই। সামান্য যা আছে নিজেদেরই তা'তে হবে না। কাজেই দিতে হ'লে নিজে মরতে হয়। পরের জন্য নিজের প্রাণ-দান এ হিতোপদেশ এ পথের বাণী নয়।

আমরা জল খুঁজছি। জল কোথায় ? শেষে একজন বললে, পাহাড়ের এ ঢালু পথে নীচে নেমে যান, জল পাবেন। সামনে চেয়ে দেখি—গভীর অরণ্য ! পুরাতন বৃক্ষশ্রেণী—লতা ; গুল্মে আচ্ছাদিত। বৃক্ষের নীচে আগাছার বন। ঘন বন অন্ধকার। তার ভেতর দিয়ে মাত্র একজন চলার মত সংকীর্ণ পথ, ভীষণ খাড়া। সাঁপের মত আঁকা-বাঁকা হয়ে কোথায়

কোন্ অতল নীচে নেমে গেছে। ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে লতাপাতা ধরে' ধরে' আমরা কয়েকজন জলের টিন নিয়ে নীচে নাম্‌ছি। মানে, পথ এতো খাড়াই যে পথ যেন আমাদের টেনে' নীচে নামাচ্ছে। আস্তে আস্তে পা ফেলে' নামতে চাই, কিন্তু পথই যেন ঠেলা দিয়ে এক সেকেণ্ডে অনেকখানি নামিয়ে দেয়। ভয়ে তাড়াতাড়ি আগাছার বন ধরে' বেগ সামলাই। যত নীচে নামি ততই আগাছার শুক্‌নো বন ক্রমশঃ সবুজ কচি পাতায় শ্যামল হয়ে' উঠছে যেন। নীচের মাটি নরম থাকায় গাছপালা বন-জঙ্গলও নরম তাজা পাতায় ঘন আবৃত। এ সব জায়গায় নাকি বাঘ ভাল্লুকের ভয় বেশী। ইচ্ছা হলো ফিরে আসি—জলের জন্য কি শেষে বাঘের পেটে যাব? কিন্তু বাঘকে এখন তৃণজ্ঞান করি। জলের পিপাসা বুকের তল শ্মশান করে' দিয়েছে, জল চাই-ই। অনেকক্ষণ নামছি কিন্তু পথ আর ফুরায় না। জল যে কোন পাতালপুরে আছে জানেন ঈশ্বর। সোজা দাঁড়িয়ে এখন আর নামতে পার্‌ছি না। হাঁটু পর্যন্ত এবার টন্ টন্ করে' ছিঁড়ে' পড়তে চায়। মাঝে মাঝে বসে' বসে' নামতে লাগলাম। কিন্তু পথ এত খাড়াই যে শরীরের ভার সামলাতে পারছি না। হঠাৎ পিছলে পড়ে' অনেকখানি নীচে নেমে যাই। তাড়াতাড়ি সামনের একটা কিছু ধরে' নিজকে সামলিয়ে নিই। শেষে প্রায় সিকি মাইল নীচে গিয়ে জল পেলাম। স্নিগ্ধ শীতল স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী বা স্রোতস্বিনী নয়, অকূল অম্বুধিও নয়—স্ফটিক নির্মল সরোবরও নয়। জল দেখে চোখে এলো জল, কণ্ঠ গেল আরো শুকিয়ে। জিহ্বা মুখে আছে কিনা

সন্দেহজনক। শুষ্ক তালুতে যেন শুষ্ক জিহ্বা হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠে গেছে। হায় ভগবান, এরি নাম জল? ছোটবেলার সেই কবিতার লাইনটা মনে পড়ল: "গোষ্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ"। গোষ্পদ-পরিমিত ছোট ছোট গর্ত, তার মধ্যে টল্‌টলে সামান্য সাদা জল। হয় তো বহু শতাব্দী পূর্বে এখানে কোন জল ভরা ঝরণার গভীর গতি ছিল আজ আর তা নেই, শুকিয়ে মরে' গেছে। আছে শুধু সামান্য জলভরা কয়েকটা ছোট ছোট গর্ত। গর্তের জলের পরিমাণ দেখে' মনে হলো: অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। কিন্তু ভাল করে' চেয়ে দেখি, একি! গর্তের চারপাশে এত মড়া! দশ বারোটা গর্ত! প্রত্যেক গর্তের ধারে চার পাঁচটি করে' মরা মানুষ, সবই কুলী মজুর। পাহাড়ের ওপরের রাস্তা থেকে আমাদের মত নীচের গুহার মধ্যে জলের জন্য এসেছিল, জল খেয়ে হয় তো পথশ্রান্ত শরীরের ভার রাখতে না পেরে এখানেই শুয়ে পড়েছিল— আর উঠে যেতে পারে নি। ভাবলাম, হায় রে জল, তুমি মানুষের জীবন দাও, না নাও? ভয়ে ত্রাসে আমাদের পা কাঁপতে লাগল। এই মরা মানুষ ঠেলে' জল তুলি কি করে'? কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেও চলবে না। আমাদের আগে যারা এসেছে তারা যেমন মড়াগুলির ওপরে বসে' বসে' জল তুলছে, আমরাও তেমনি করেই তুল্‌ব।

আজ চৌদ্দ পনরো দিন যাবত আমরা স্নান করি না। চুল, দাড়ি, চোখের ও নাকের চুল আর ভুরু ধূলায় একেবারে সাদা হয়ে গেছে। কাঁধের ওপরের চেহারা ঠিক বানরের মত।

সেদিন ডারউনের কথা মনে পড়ল—মানুষ বানরের বংশধর—কথাটা সত্য। কিন্তু বানরের বংশধর হই বা বাঘ ভাল্লুকের বংশধর হই—সে কথা ভাববার এ সময় নয়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জলের গর্তের ধারের জীবন্ত মানুষগুলিকে ঠেলেঠুলে' এবং মরা মানুষগুলির ওপর বসে' আগে নিজেরা পেট ভরে' জল খেয়ে নিলাম। পরে ভিজে হাত দিয়ে চুল দাড়ি ইত্যাদি মুছে' পরিষ্কৃত হয়ে' বানরের চেহারা ঘুচিয়ে আবার সুসভ্য মানুষ হ'লাম। পরে চায়ের কাপে করে' গর্ত থেকে একটু একটু করে' জল তুলে জলের টিনগুলি ভরলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সবাই মিলে' আমরা যত জল তুল্ছি, জল যেন কমছে না। গর্তের যেমন জল তেমনই আছে—এ যেন অফুরন্ত ধারা। যতই তুলি জলের যেন আর শেষ নেই। মনে হলো, অন্তঃসলিলা ধরণী। সহসা ঝগড়ার সুর কাণে এলো। চেয়ে দেখি, অপর গর্তের ধারে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়েছে। কয়েকটি মুসলমান মজুর গর্তে পা ডুবিয়ে পা ধুচ্ছে। তাই দেখে পরমহংসদেবের এক চেলা—গেরুয়া বসন পরা স্বামীজিটি মজুরদের গালাগালি কর্ছেন। হাজার হাজার লোক যে জল খেয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছে সে জলে আবার পা ধোয়া কেন? কিন্তু স্বামীজির কথায় কর্ণপাত না করে' তারা পা ধুয়ে' জল নিয়ে চলে' গেল। তারা চলে' গেলে পর চেয়ে দেখলাম, আবার স্বয়ং স্বামীজিই সে জলে পা ধুচ্ছেন। বল্লাম, আপনি নিজে এ কি করছেন? তিনি বল্লেন, পা জ্বলে' যাচ্ছে, একটু ঠাণ্ডা করে' নিচ্ছি—তারপর হেসে বল্লেন, আমরা প্রচার করি নীতির বাণী, কিন্তু

নীতি এখানে মূল্যহীন। স্বামীজির দিকে একবার ঘৃণার চোখে চেয়ে আবার ভীতি-বিহ্বল চোখে পাতালপুরীর এ গতের চারপাশের মরা মানুষগুলির দিকে চেয়ে দেখলাম, শুধু জলের ধারে নয় গর্ত ছাড়িয়ে আরো দূরে যেখানে কচি তাজা পাতা ভরা আগাছার জংগল সেই জংগলের ভিতরে আগাছার ফাঁকে ফাঁকে মড়া পড়ে' আছে আরো অসংখ্য। জল খেয়ে পিপাসাক্রান্ত অবশ-বিহ্বল দেহভার সহ্য করতে না পেরে একটু ঘুমাবার আশায় ছায়াশীতল আগাছার বনে ঢুকে' শুয়ে' পড়েছে কিন্তু আর জাগতে পারে নি, অনন্ত নীরবতায় এখন তাদের দেহভার রক্ষিত। পলকহীন চোখে তাদের দিকে চেয়ে আছি ; ওপর-পৃথিবীর মানব বিশ্বের মহাকলরবের ধ্বনি শুনেছি, কিন্তু পাতাল-পৃথিবীর মনুষ্যবিহীন জড় বিশ্বের মহা নীরবতার ধ্বনি কোনদিন শুনিনি। আজ এখানে চুপ করে' দাঁড়িয়ে সে ধ্বনি শুনলাম। শুনলাম, এক শব্দহীন মহাবাণী। দেখলাম, সমস্ত পৃথিবী যেন এখানে এসে বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি ; বন্ধ হয়ে গেছে পৃথিবীর চলৎ-শক্তি, স্তব্ধ হয়ে গেছে পৃথিবীর জীব-প্রবাহ। কোটি কোটি জীবনের প্রাণশক্তি নিমিষে এখানে এসে হয়ে গেছে নিবিড় নীরব। এখানে জীবন স্পন্দনহীন, কম্পনহীন এক নিশ্চল গতিসম্পন্ন। মানব পৃথিবীর তুমুল সংগ্রাম এখানে নেই। সুসভ্য জগতের মানব বক্ষের উৎপীড়িত বেদনার করুণ দীর্ঘশ্বাস এখানে নেই। ধনৈশ্বর্য-গর্ব-স্ফীত বক্ষের অট্টহাস্য এখানে কঠিন নীরব। বাহির পৃথিবীর মানবের সর্বপ্রকার মান অভিমান এখানে

বাত্যাহত গুল্মলতার ন্যায় শতচ্ছিন্ন। রক্তময় বহ্নিময় মানবের পিপাসা এখানে শ্রান্ত ক্লান্ত। বাহির জগতের সমাজ-সংসার, ঘর-বাড়ী, পুত্রকন্যার পরম মায়াময় স্নেহের সুর এখানে পরম সুপ্ত। জীবনের হাসি-কান্না, আশীর্বাদ-অভিশাপ এখানে গভীর করে' টেনে দিয়েছে তার যবনিকা। এখানে রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, জ্ঞান-গৌরব, শিক্ষা-দীক্ষা, সংঘ-সমিতি ইত্যাদি সর্বপ্রকার বিভীষিকাময় আধুনিক মানব চরিত্র গঠনের যতপ্রকার ব্যবস্থা আছে, সব এখানে এসে মুহূর্তে ক্ষান্ত হয়ে গেছে। সহসা অর্জুনের বিশ্বরূপ দেখার কথা মনে পড়ল। যেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মুখের ভেতর অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন বিশ্বরূপ। অর্জুন দেখতে পেল—বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন পরিপূর্ণ সমস্ত বিশ্ব-সংসার শ্রীকৃষ্ণের মুখ-গহ্বরে, আর সমস্ত আত্মীয় অনাত্মীয় মানব-সংসার সেখানে মৃত—এক মৃত্যুময় ভয়াবহ জগৎ। তেমনি এই পাতাল-প্রদেশে ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর তলদেশে বিশ্বের মৃত্যুরূপ দেখলাম।

এবার জল নিয়ে পাহাড় বেয়ে' ওপরের ভুবনে উঠছি। জল নিয়ে পাহাড় বেয়ে' সিকি মাইল সোজা ওপরের দিকে ওঠা যে কি ব্যাপার—জীবনে হয়তো সে কথা কোনদিন ভুলব না। পাঁচজনের মাথায় পাঁচ টিন জল। আমাদের মত আজ চৌদ্দ পনর দিনের উপবাসী অর্ধমৃত দেহধারী লোকের মাথার ওপর এক এক টিন জল যে কি বোঝা—জানে আমাদের পিঠের মেরুদণ্ড। আমি নিজে জল বহন করিনি। পেছন থেকে ওদের চেয়ে দেখছি, ওদের মেরুদণ্ড যেন ফুলে' পিঠ থেকে ছুটে

পড়তে চায়। তখন ওদের বুকের যে দীর্ঘশ্বাস শুনেছি মনে হলো, প্রত্যেকের বুকের ভেতর হাপানী রোগের ঝড় তুফান উঠেছে। পায়ের শিরা-উপশিরাগুলি ফুলে' উঠে কেঁচোর মত এঁকে-বেঁকে রয়েছে। পা সামলাতে পারছে না, নীচের দিকে পড়ে' যেতে চায়। পেছন থেকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে ধরে' রাখি। এমনি মৃত্যু-অভিযান শেষ করে' প্রায় ঘণ্টাখানেক পর এসে উঠলাম ওপরে। মানে, উঠলাম এসে আর এক মৃত্যুরাজ্যে। ওপরে আমাদের হাজার পাঁচেক লোকের ভীড়ের ফাঁকে ফাঁকে চারিদিকে পড়ে' আছে মৃতদেহ, সেগুলো পচতে আরম্ভ করেছে; ঠেকে' রয়েছে গাছের গোঁড়ায় পাহাড়ের ঢালু ভূমিতে, পথের এপাশে ওপাশে। পথের পাশে নীচে গুহার গায়ে আগাছার বনেই ঠেকে' রয়েছে প্রায় বিশ পঁচিশটি মৃতদেহ। সদ্যমৃত নয়, অনেক দিনের; উলঙ্গ। ফুলে এত বড় মোটা হয়ে রয়েছে। এখন পচতে আরম্ভ করেছে। দাঁতের পোকার মত এক প্রকার ছোট ছোট পোকা সর্বশরীরে কিল্‌বিল্‌ করে' ঘুরে' বেড়াচ্ছে। দেখে সমস্ত শরীর শিউরে' উঠ্‌ল। স্তব্ধনেত্রে চেয়ে দেখলাম, মানুষের মৃত্যুর পরিণাম। দেখলাম, আমাদের জীবন্ত দেহ ঘেঁষে আছে অসংখ্য মৃত্যু-পোকা। দেখলাম, আমাদের জন্ম-মৃত্যু একই মৃত্যু-পোকার লীলাভূমি। দেখলাম, সব মানুষ মৃত; জীবন যেন মৃত্যুর কালোছায়ায় ভরা। আমাদের জীবন্ত দেহের প্রতি নিঃশ্বাসে যেন নেমে আস্‌ছে মৃত্যুর দুর্গন্ধ।

এখন একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-ভাবে রান্নাবান্না করে'

খেতে চাইলাম। সেজন্য একটু পরিষ্কার জায়গা খুঁজে' বেড়াচ্ছি। কিন্তু এমন কোন জায়গা পাচ্ছিনা যেখানে মড়া নেই। নিজেদের দেহেই যেন সর্বদা মড়ার গন্ধ পাচ্ছি। তবু মৃতদেহকে এখনো আমরা ঘৃণা করতে চাই। মনে করি আমরাই শুধু মৃত্যুহীন অমর মানব, আমরাই যেন এ মৃত্যু-রাজ্যে জীবন্ত দেবতা। আমরা এখনো চাই শহরের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন প্রগতিশীল আভিজাত্য নিয়ে রান্না করে' খেতে। কিন্তু অসম্ভব। এখানে আভিজাত্যসম্পন্ন বিশিষ্ট লোকের কোন বিশিষ্ট স্থান নেই। এখানে অর্থনীতিজ্ঞ, রাষ্ট্রজ্ঞ, কোটিপতি, সমাজপতি বা ধর্মগুরুর জন্য নির্দিষ্ট কোন উচ্চ আসন নেই। এখানে রাষ্ট্র. অর্থ, ধর্ম, সমাজ-সংস্কৃতি সর্ব প্রাধাণ্যহীন। বিদ্বান মূর্খ ব্যবসায়ী কৃষিজীবী শ্রমজীবী ছোটবড় সব একত্র একাসনে মড়ার পাশে বসে' হাসিমুখে রান্নাবান্না করে' খাচ্ছে। এখানে আমরা সব সমান হয়ে গেছি। সবাই এক মানুষ, এক জাতি, এক সমাজ ; এক বৃহৎ সোণার সংসার। মাদ্রাজী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, বাংগালী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সম্প্রদায় আজ এখানে এসে এক বৃহৎ অখণ্ড ভারত-জাতিভুক্ত হয়ে গেছি ; হয়ে গেছি এক মহা-মানব ধর্মে সবাই দীক্ষিত। আধুনিক রাষ্ট্রের ও সমাজের উৎকর্ষিত বা পরিচালিত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ধ্বংসময় কোলাহল পরিপূর্ণ অসংখ্য বিদ্বেষ ও বিদ্রোহবাদী মানব আজ আর আমরা নই। ঐ পিছে-ফেলে-আসা বর্তমান জগতের মানুষের রক্তাক্ত, উন্মত্ত বিদ্রোহী রূপ আজ আমাদের দেহ থেকে খসে'

পড়ে' গেছে। আজ আমরা আমাদের এই নব আবিষ্কৃত পাহাড়-পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি অখণ্ড এক মহামানব জাতির বেশে। মানুষের এই অখণ্ড অপরিসীম প্রেমময় রূপ জীবনে আর কোনদিন দেখিনি। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতিসম্পন্ন পৃথিবীর মানবসমাজে বাস বরে' মানুষকে দেখেছি পদে পদে ঘৃণিত লাঞ্ছিত হ'তে। মানুষের আসল রূপকে দেখেছি খণ্ড বিখণ্ড হ'তে, শতভাবে ঘাত প্রতিঘাত পেতে। রাষ্ট্র এবং সমাজ তাকে বিভক্ত করেছে শত ভাগে। তার সমস্ত মন ও প্রাণকে ভেঙ্গে করেছে শতধা। তার শিক্ষা, তার বিজ্ঞান, তার সংস্কৃতি, তার সাহিত্য, তার ধম তাকে করেছে পদে পদে মর্মাহত; শতভাবে ছিন্ন-বিচ্ছন্ন। তার অন্তরের অসীমত্ব আঘাতের পর পেয়েছে আঘাত, তাই সে হয়ে গেছে বিদ্বেষী ও বিদ্রোহী। এনেছে সে সর্বাঙ্গে প্রলয়ের রূপ বহন করে' সমাজ সংসারে, দেশ-বিদেশে। এনেছে সে মহা সংগ্রাম, মহা ধ্বংস, মহা মৃত্যু, মহা শূন্যতা। সমস্ত পৃথিবী তাই আজ হয়ে গেছে মহা-শ্মশান। পৃথিবীর মানুয় রেফিউজি, যাযাবর!

কাজেই আমরা আজ এই পাহাড়ের পৃথিবীতে সেই রাষ্ট্রীয় সুসভ্য জগতের শতছিন্ন মানুষ নই। আমাদের দেহ-মন-প্রাণে আজ জন্মেছে অখণ্ড অনাদি সনাতন মানুষ। আমাদের সমাজ আজ একের সমাজ, আমাদের সংসার আজ এক ঘরের সংসার, আমাদের বিজ্ঞান এক বিশ্বসৃষ্টির বিজ্ঞান, আমাদের ভাষা এক মহামানবের ভাষা। আমরা আজ সর্ব স্বাতন্ত্র্যহীন এক অখণ্ড পরিপূর্ণ মানুয।

আমরাও শেষে আমাদের সেই রাষ্ট্রীয় সমাজের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আভিজাত্য দূরে ফেলে দিয়ে সবার সাথে এক মানুষ হ'য়ে রান্না করতে লাগলাম। পাঁচ টিন মাত্র জল, সংক্ষেপে কাজ করতে হবে। সংক্ষেপে রান্না, সংক্ষেপে খাওয়া ও সংক্ষেপে হাত মুখ ধোয়া। বিশেষতঃ চাল ডাল যা আছে সামান্যভাবে খরচ না কর্‌লে তিন চারদিনের মধ্যেই সব টান পড়ে' যাবে। কাজেই সামান্য জলে সামান্য চাল ডাল একত্র সিদ্ধ করে' নামানো হলো। আমরা ভাতের হাঁড়ির চারপাশে ঘিরে আছি; কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে' ক্ষুধাতুর চোখে হাঁড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে বার বার ঢোক গিল্‌ছি। দারুণ ক্ষুধায় আমাদের পেট শুকিয়ে গেছে। পিপাসায় জিহ্বা আর কণ্ঠতালু হ'য়ে গেছে সাহারা। কাজেই ভাত খাবার আগেই ছেলেমেয়েরা পেট ভরে' জল খেয়ে নিল। আমরা যে ক'জন নীচে জল আনতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই পেট ভরে' জল খেয়ে এসেছি। জলের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ-সংশয় ছিল, কারণ জলের ধারেই অনেক পচা-গলা মৃতদেহ দেখেছি। তারা যে কলেরায় মরেনি সে কথা কে জানে? কিন্তু জল আমাদের খেতেই হবে, সে সব বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে' লাভ নেই। জলগুলি সিদ্ধ করে' খেলে হয়তো ভাল হ'ত। কিন্তু সে ভাল হওয়ার অর্থ এখন আমাদের কাছে নেই। আমাদের চারিদিকে মৃত্যু দাঁড়িয়ে। শুধু ভাল জল খেয়ে বেঁচে থাকব, সে আশা এখন আমাদের নেই। জল খাওয়ার পর ভাত খাওয়া হলো। কিন্তু পেট

ভর্তি নয়, প্রত্যেকে এক মুঠো করে'। কারণ কতদিনের অজানা পথ সমুখে কে জানে? যে চাল ডাল আছে তাতে সমস্ত পথ চালানো চাই। খাওয়ার পর জলের অপব্যয়ের ভয়ে এঁটো হাত-মুখ জামা-কাপড়ে মুছে' নিলাম। পরণের সেই একখানা কাপড়; একটা জামা—তার মধ্যে এতটা পুরু হয়ে ধূলো জমে' উঠেছে যে তার ওপর আমাদের এঁটো হাত মুছে' নেওয়ায় জামা কাপড়ের রং আরো অদ্ভুত হ'য়ে উঠল। মানে, হাতের হলুদের রঙে আর ধূলোর ময়লায় আমরা অদ্ভূত জীব সেজে' উঠলাম। কিন্তু শরীরের চেহারা আমাদের যাই হোক্ সেদিকে আর লক্ষ্য করছে কে? এখন একটু শু'য়ে থাকতে পারলে যেন বাঁচি। সাপ যেমন অনেকদিন পর একদিন আহার করে' যেখানে সেখানে গা ছেড়ে দিয়ে পড়ে' থাকে আমাদের অবস্থাও এখন ঠিক সে-রকম। অনেকদিন পর সামান্য এক মুঠো খাওয়ার পর মনে হলো, আমরা যেন আফিঙ খেয়ে ক্রমশঃ লুপ্তচেতন হয়ে পড়েছি। সর্বদেহ অবসন্ন, নিশ্চল। মেয়েরা ও ছেলেরা গাড়ীতে উঠে পা ছেড়ে' দিয়ে বসে' সুট্‌কেশ আর ট্রাংকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। গরুগুলিও পেট ভরে' ঘাস জল খাবার পর লোকের সঙ্গে একত্র হ'য়ে পথের ওপর শু'য়ে পড়ল। দেখে মনে হলো, গরু আর গাড়ী টানতে চাইবে না, এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মনে হলো, গরুগুলিও বোধ হয় ওখানে পড়ে' মরে' থাকবে। পথের ধারেই শেষ হবে তাদের সুদূর পথের যাত্রা। গরুর প্রাণের মূল্যের কথা মনে করে' আমাদের প্রাণও আবার সহসা মূল্যহীন হ'য়ে ভয়ে কেঁপে

উঠল। ভাবলাম, নিজেরা বাঁচতে চাইলে সকলের আগে এই গরুগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। গাড়োয়ানদের বল্‌লাম, গরুগুলি ভাল করে' ঘুমাক, এখন আর রওনা হব না। সন্ধ্যার আগে আগে আবার পথ ধরব। বলে' আমরাও শেষে পথের ধারে পাহাড়-ঘেঁষে মাটির ওপর গা ঢেলে দিলাম। বিষণ্ণ ও অবসন্ন দেহের ভার একমাত্র এ ধরণীর মাটিই বহন করতে পারে। সর্বাঙ্গে সেদিন যে ধরণীর মাটির পরশ পেলাম, সে পরশ স্বর্গের স্বর্ণ-ধূলিতেও নেই। কিছুক্ষণ পর আবার মাথা কাত করে' চেয়ে দেখলাম, আমার পাশে আমাদেরই একটা গরু শু'য়ে আছে এবং গরুটার ওপাশে একটি মরা মানুষ। কতদিনের মরা জানি না, তবে ফুলে উঠেছে। জীবিত মানুষ, জীবিত গরু আর মৃত মানুষ এমনি করে' একত্র মাটির শয্যায় শুয়ে। চোখে জল এলো। দার্শনিক কল্পনায় ভরে' উঠলাম, মানুষ ঐ মাটির পৃথিবী হ'তে যে যত ওপরে উঠে আসতে পারবে সেইই দেখবে পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ—জীবিত আর মৃত—সব এক। সব এক অনন্ত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ। বিরহ-বিচ্ছেদ, ও তোমার আমার দ্বন্দ্ব-কোলাহল শুধু মাটির পৃথিবীর অর্থশূন্য আয়োজন।

শকুন্তলাদি' অদ্ভুত মেয়ে। ভাত খাবার পর অপরিসীম শক্তি যেন তিনি ফিরে পেয়েছেন। আর সকলে গাড়ীতে উঠে ঘুমাচ্ছে তিনি তাঁর সেই কাঁধের ঝুলিটী কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে রেখে বেড়াতে বেরিয়েছেন। হাজার পাঁচেক যাত্রী হেঁটে চলেছে যেখানে সে স্থান ছোট নয়। সকলের কাছে গিয়ে ঘুরে-

ফিরে এসে বল্‌লেন—আজ মনের মানুষ খুঁজে' পেলাম। বিস্মিত চোখ তুলে' চেয়ে দেখি শকুন্তলাদি'। এতো দুঃখেও তাঁর কথা শুনে হাসি পেল। একটু রসিকতা করে' বললাম, অবিবাহিত বয়সে মেয়েরা মনের মানুষ খুঁজে' বেড়ায়—কিন্তু আপনি? তিনিও হেসে বল্‌লেন, কিন্তু আমি যে বিয়ে করেছি তারই বা প্রমাণ কি? মাথায় একরাশি ঝড়ো এলো চুল; সিঁথিতেও নেই সিঁদূর; বয়সটাও অনেক কম। শাড়ীর আঁচলও স্বাধীনচেতা কুমারী মেয়ের মত কোমরে বাঁধা। কে বল্‌বে আমি বিবাহিতা? তেমনি হেসে বল্‌লাম, কিন্তু সেই ভাগ্যবান পুরুষটি কে—যাকে মনের মানুষ করে' নিলেন?

এবার গভীর কণ্ঠে বল্‌লেন, আজকের এ জায়গার এই হাজার পাঁচেক লোক সকলেই আমার মনের মানুষ। এদের প্রত্যেকের কাছে আমার অন্তরের অসীম প্রেম বিলিয়ে এসেছি। স্তব্ধ নেত্রে শকুন্তলাদি'র দিকে চেয়ে আছি। তিনি আবার বল্‌লেন, ঐ সুসভ্য সমাজের মানুষের কাছে যে মন, যে প্রাণ, যে চোখ খুঁজে' বেড়াচ্ছিলাম তা আজ এখানে এসে এই অনির্দিষ্ট পথে-চলা পথিকদের কাছে পেলাম। পেছনে-ফেলে-আসা আমাদের ঐ শহরের সমাজের মানুষের মনে দেখেছি সর্বদাই একটা অতৃপ্ত কামনার আগুন জ্বল্‌ছে। কিন্তু আজ এখানে সকলের মনের খবর নিয়ে দেখলাম, তাদের মনের কোণে একটা বিরাট বৈরাগ্য তাদের উদাসীন করে' দিয়েছে। মনে হয় সমাজের মানুষ এখানে এসে ঋষি-তূল্য হয়ে গেছে।

হেসে আবার বল্‌লাম, এই আপনার মনের মানুষ?

শকুন্তলাদি' আবার বল্‌তে লাগলেন—আর একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম। এই হাজার পাঁচেক লোকের ভেতর ভদ্র-অভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিদ্বান-মূর্খ, কুলী-মজুর—সব রকমের লোকই আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সকলের মুখেই জীবন ও মরণের প্রশ্ন। সকলেই আজ খুঁজে বেড়াচ্ছে জীবন কি আর মৃত্যুইবা কি?

শকুন্তলাদি'র মুখের দিকে চেয়ে সম্ভ্রমে মাথা নত করলাম।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে' আবার সকলেই পথ ধরলে। কারণ বেশীক্ষণ বিশ্রাম করবার সময় নেই। কিন্তু যারা সঙ্গে চাল ডাল আনতে পারেনি—এই কুলী মজুর যারা তারা শুধু নীচে নেমে' জল খেয়ে আবার ওপরে এসে গাছতলায় ছেঁড়া কাপড়ের আঁচল পেতে শু'য়ে পড়ল। তাদের পা ফুলে উঠেছে; ব্যথায় আর যন্ত্রণায় মাটিতে পা ফেলা যায় না। হাঁটতে গেলেই শরীর থর থর করে কাঁপে তাদের; মাথা ঘোরায়, চোখে অন্ধকার দেখে। এ অবস্থায় এখানে এই জলের ধারে পড়ে' থাকাই ভাল। যতক্ষণ জীবিত আছে অন্ততঃ একটু জল খেতে পারবে। কিন্তু এগিয়ে গেলে নাকি আর ত্রিশ চল্লিশ মাইলের মধ্যে জল নেই। সন্ধ্যা হয় হয়। আমাদের গাড়ীও চল্‌ল। মেয়েরা সবাই গাড়ীতে উঠে বসেছে। আমরা কেউ হেঁটে কেউ গাড়ীতে যাচ্ছি। আমি আমার গাড়ীতে আগেই উঠে বসেছি। গাড়ীতে উঠে বসতে পারলেই যেন বাঁচি। আমাদের আগে অপর সকলের গাড়ী একে একে সব চলে' গেছে। এখন আমাদের আগেও গাড়ী নেই, পেছনেও নাই; এবং সঙ্গে সঙ্গে

পায়ে-হাঁটার দলও নেই। সব চলে' গেছে—সেই একই বন্ধুর পথে, শুধু অরণ্য আর পাহাড় পর্বত ভেদ করে'। সেই একই মমতাহীন পথ। কখনও সমতল কখনও বন্ধুর, কখনও উঁচু কখনও নীচু। এখান থেকেই পথ আরম্ভ করেছে তার ভয়ংকর লীলা। এখান থেকে পথের দু' পাশে আর মড়ার অন্ত নেই। কেবল মৃত মানুষ। প্রাণহীন পচা দেহ রাস্তার দু' ধারে সমানে পড়ে' আছে। মৃত্যুর পাষাণ-শীতল গতি এবার সত্য সত্যই বুকের তলে হিমের পরশ ঢাল্‌ল। শিরা-উপশিরাগুলি যেন আস্তে আস্তে থেমে যেতে চাইল। মৃত্যুর এমন অবিশ্রান্ত ছায়াময় কালো রূপ দেখে নিজের দেহটাকে আর বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে হলো জীবনের সত্য রূপ, মরণের সত্য রূপের কাছে কত মিথ্যা। আমার গাড়ী আগে আগে চল্‌ছে। মড়ার দুর্গন্ধ সকলের আগে আমিই পাচ্ছি। দুর্গন্ধে পেটের নাড়ীভূড়ি উল্টে আসতে চায়। গা বমি বমি কর্‌ছে। দেখতে পেয়ে শান্তিদি' তাঁর স্যুটকেশের ভেতর থেকে এক শিশি কর্পূর বার করে' সকলকেই দিলেন। আমরা রুমালে ও কাপড়ের আঁচলে সে কর্পূর বেঁধে নিলাম। এখন কর্পূরের রুমালটা অবিরত নাকে ধরে' পথ চল্‌ছি। যারা দুর্গন্ধের জন্য নাক মুখ দু'হাতে চেপে ধরে' হেঁটে চল্‌ছিল—তারা এখন মড়ার ভয়ে গাড়ীতে উঠে বসতে চায়। কিন্তু গরু ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। এখন গাড়ীতে বোঝা কমানো ছাড়া বাড়ানো যায় না। বিশেষতঃ গাড়োয়ানগুলি এখন দা হাতে ভয় দেখায়। এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে হেঁটেই চল্‌তে হচ্ছে। মড়া ডিঙ্গিয়ে,

লাফিয়ে লাফিয়ে তারা এ পাশে পাহাড়ের পাড় ঘেঁষে আবার ও পাশে গিয়ে গুহার তীর ঘেঁষে পথ চলছে। আবার গুহায় পড়ে যাবার ভয়ে গুহার ধার থেকে গাড়ীর ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ের ধারে এসে পাহাড় ধরে' ধরে' পথ চল্‌ছে। কিন্তু পাহাড়ের ধারে পা ফেলবার যথেষ্ট জায়গা না থাকায় আবার ও পাশে গুহার ধারে গিয়ে পড়ে' যাবার ভয়ে গাড়ী ধরে' ধরে' পথ চল্‌ছে। কিন্তু এ অবস্থায় পড়েও গাড়ীর আগে আগে হাঁটবার সাধ্য নাই ; কারণ পথ এত সংকীর্ণ যে গাড়ী গুহায় পড়ে' যাবার যথেষ্ট ভয় আছে। কাজেই গাড়ীর দু'পাশে থেকে থেকে গাড়ী ঠেলে' ধরে' রাখতে হয়।

পাঁচ ছয় মাইল এ ভাবে আসবার পর রাত হয়ে গেল। জ্যোৎস্না রাত। আকাশে সুস্পষ্ট চাঁদের আলো। কিন্তু আমাদের পথের ওপরে যেন গভীর নিশীথ রজনী। পাহাড়-অরণ্য ভেদ করে' চাঁদের আলো এতদূর পৌঁছে না। আকাশে চাঁদ আছে চোখে দেখছি, কিন্তু তার আলো কোথায়? অমাবস্যা রজনীর অন্ধকার বুকে তারকাপ্রদীপের মত চাঁদের প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ জ্বলছে যেন বহু উর্দ্ধে। কাজেই বার বার টর্চ জ্বেলে' পথের সন্ধান কর্‌ছি। আরো মাইল পাঁচেক আসার পর গরু আর হাঁটতে চায় না। বারবার শুয়ে পড়ে। গাড়োয়ান বাধ্য হ'য়ে গাড়ী থামিয়ে দিলে। কিন্তু যেখানে এসে থামালে সেখানে মৃতমানুষের অন্ত নেই! গাড়ী থেকে সকলে মিলে নেমে পড়ছি। কিন্তু এখন দেখছি, এ মড়ার মধ্যে রাত্রিতে থাকা অসম্ভব। কি দুর্গন্ধ! মৃত দেহগুলির কাছেই আবার

এক বৃদ্ধ বয়সের মানুষ শুয়ে' শুয়ে' বমি করছে। জানা গেল লোকটার কলেরা হয়েছে। এ অবস্থায় বেশ বুঝা গেল এই মরা মানুষগুলির মধ্যে হয়তো অনেকেই কলেরায় মৃত। ভয়ে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। গাড়োয়ানকে বল্‌লাম, এখানে থাকলে সবাই মিলে কলেরায় মারা যাবো। গাড়ী ছাড়ো। আরো দু'তিন মাইল এগিয়ে গিয়ে গাড়ী বাঁধব। গাড়োয়ান বল্‌লে, সামনের চার পাঁচ মাইলের মধ্যে সব জায়গায় বাঘের ভয় আছে, সেখানে গাড়ী বাঁধা যাবে না। বল্‌লাম, বেশ। ঐ চার পাঁচ মাইল পেরিয়ে গিয়ে গাড়ী বাঁধবে। তবু এখানে থাকব না। ছাড়ো গাড়ী। গাড়োয়ান বল্‌লে, কিন্তু গরু যে এখন হাঁটতে চায় না, শু'য়ে পড়ে। বল্‌লাম, বেশ, আমরা সব হেঁটে যাব, মেয়েরা শুধু গাড়ীতে যাবে। গাড়োয়ান শেষে গাড়ী ছাড়ল। সামনে বন্যজন্তুর ভয়, কি আর করা যায়। কোমর কষে' পাহাড়ের বাঁশবন থেকে মোটা মোটা বাঁশের লাঠি কেটে কাঁধে ফেলে বীরপুরুষ সেজে আবার পথ ধরলাম। কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, বাদ্যযন্ত্রের কাছে বাঘ ভল্লুক আসে না—আপনারা কিছু বাজান। কথা শুনে' এতো বিপদের মধ্যেও হাসি পেল, বল্‌লাম, কি বাজাব? আমাদের আছে কি? সহসা মনে পড়ল—আমাদের সঙ্গে এগারটা জলের টিন। পেছনের ঐ পাতালপুরীতে নেমে পাঁচ টিন মাত্র জল আনা হয়েছে। বাকী টিনগুলি শূন্য। তাই বাদ্যযন্ত্র করে' নিলাম। টিন বাজিয়ে লাঠি কাঁধে নিয়ে ধরলাম বাঘের পথ। গাড়োয়ানও গাড়ীতে বসে' সিঙ্গা বাজাতে লাগলো। এবার কঠিন পাহাড়ের বন্ধুর

পথের কথা ভুলে' যেতে হলো। ভুলে' গেলাম পথের পাশে দুর্গন্ধযুক্ত এ মরা মানুষগুলির কথা। এখন করতে হবে বাঘের সঙ্গে লড়াই। কম্পাউণ্ডারবাবুর পায়ের দিকে চেয়ে বল্‌লাম, আপনার পা যে রকম ফুলে উঠেছে হাঁটতে পারবেন কি সামনের এই চার পাঁচ মাইল পথ? চারপাশের ঘন অরণ্যের দিকে ভীতি-বিহ্বল চোখে বারবার চেয়ে বল্‌লেন, এসব বাঘ ভাল্লুকের জংগলে এখন কি আর পায়ের কথা মনে আছে? না মনে আছে আমরা যে সুসভ্যজগতের মানুষ? সমস্ত শরীরে এক ইঞ্চি পরিমাণ ধূলো। একখানা জামা একখানা কাপড় সেই ১৩ই ফেব্রুয়ারী থেকে পরা। আজ তা' হ'লে ক'দিন হলো? আজ মাসের ক'দিন? বলে' আমার দিকে তাকালেন।

আজ মাসের ক'দিন সে কথা কেউ জানিনা। জানবইবা কি করে'? আমরা কি এখন সভ্যজগতেয় সেই দিনক্ষণ তিথিনক্ষত্রের মানুষ? সমস্ত মানব পৃথিবী এখন আমাদের কাছে বিলুপ্ত। সমস্ত পৃথিবীর পাঁজিপুঁথি অর্থশূন্য। আমরা এখন আদি-অন্তহীন এক মহাকালের মহামানব যাত্রী। আমাদের পৃথিবী সেই মানব জন্মের আগের পৃথিবী। আমাদের বিশ্ব প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশ্ব। শুধু অগ্নি মরুতের বিশ্ব। আধুনিক নগ্ন-সংস্কৃতি-বিহীন স্বাভাবিক বিশ্ব। কাজেই আমাদের চেহারা হয়ে উঠেছে সেই আদি মানুষের। সমস্ত শরীরে ময়লা ও ঘামের গন্ধ। জামা কাপড় ঘামে ভিজে রোদে শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে। মনে

হয় গাছের বাকল পরে' আছি। চুল দাড়ি ধূলায় শাদা ও জট্ ধরে' উঠেছে। রুক্ষ চোখা চোখা চুল দাড়ি। একেবারে বনমানুষের চেহারা। বন্যপশুর মত আকৃতি-প্রকৃতি। যাক্ সে কথা—কম্পাউণ্ডারবাবু হঠাৎ বলে' উঠলেন, আপনারা একটু সতর্ক হয়ে হাঁটবেন। চারদিকে টর্চ ফেলে ভাল করে' নজর রাখবেন। কোন্ সময় কোনদিক দিয়ে বাঘ এসে পড়ে তার কিছু ঠিক আছে? পাহাড়ী বাঘ বড় দুর্দান্ত। এক লাফে এসে ঘাড়ে চড়ে' বসবে। জলের টিনগুলি খুব জোরে বাজাতে থাকুন। আর আমাদের মধ্যে যদি কেউ গান গাইতে পারেন তবে এ সময় গান করুন।

আমাদের দলের ক্ষেত্র ছেলেটি ছিল আধুনিক সংগীত-প্রিয়। গলাটিও বেশ মিষ্টি। সে সিনেমার গান গাইতে লাগল: 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায়' ঐ। চারিদিক নিঝুম নীরব। সেই নিঝুম নৈশ-নীরবতা ভগ্ন করে' ক্ষেত্রের কণ্ঠস্বরে অরণ্য পাহাড় পর্বত ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। মনে হলো, বাংলার সেই গান আজ এ সুদূর ব্রহ্মদেশের পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে' বেড়াচ্ছে। কিন্তু কম্পাউণ্ডারবাবু বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন। ক্ষেত্রকে ধমক্ দিয়ে বল্লেন, ভক্তি-তত্ত্বহীন ওসব সিনেমার গানের দরকার নেই, গাইতে হয় তবে ভক্তিরসের গান কর। যে বিপদে পড়েছি, ভগবানে ভক্তি না থাকলে আর উদ্ধার নেই। যদি গাইতে হয় নাম-সংকীর্তন কর। রাধাকৃষ্ণের গান। ধমক্ খেয়ে ক্ষেত্র থেমে' গেল। শ্রীমান্ সুরেশ গাইতে লাগল:

"জয় রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ মধুসূদন
রাম নারায়ণ হরে"

সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই মিলে তাল ধরেছি। কৃষ্ণ নামে যেন সমস্ত রাস্তা ঘাট অরণ্য পাহাড় পর্বত প্রেমময় হয়ে উঠল। বাংলাদেশের সেই রাধাকৃষ্ণের প্রেম ব্রহ্মদেশের এই নির্দয় পাহাড়ে অরণ্যে লতা পাতায় তৃণে ধূলিতে যেন অমৃত বর্ষণ করল। ভক্তিকোমল কণ্ঠে কম্পাউণ্ডারবাবু বল্লেন, মারে কৃষ্ণ রাখে কে? রাখে কৃষ্ণ মারে কে? সমস্ত পৃথিবীতে আছে মাত্র একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক। কৃষ্ণ আর রাধা। প্রেমময় প্রশান্ত যুগল মূর্তি। আমরা আর সব তো চির বিরহে মৃত।

এসব বিরহ-মিলনের কথা শুনতেই মনটা হু হু করে' কেঁদে উঠল। মনে হলো, কাকে যেন পেয়েছি কাকে যেন পাইনি। আশা-নিরাশায় মিলনে-বিরহে বুকের ভিতর যেন ঢেউ খেল্‌তে লাগল। সহ্য করতে না পেরে সহসা পেছনে ফিরে চেয়ে ব্যস্ত স্বরে ডাকলাম, গৌরী! গৌরী! কোন সাড়া শব্দ নেই। আবার ডাকলাম, গৌরী! গৌরী! সেই ধ্বনি যেন ঐ রাধাকৃষ্ণ নামের মতই অরণ্য পাহাড় পর্বতের এ নৈশ-নীরবতা ভেদ করে' চারিদিকে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। সেই "গৌরী" শব্দটা প্রতিধ্বনিত হয়ে বার বার ফিরে' এসে আমার কানের ভেতর দিয়ে যেন অন্তরে প্রবেশ করল। সমস্ত মন প্রাণ ও প্রেমময় অন্তর-আত্মা কি এক বিশ্ব-ব্যাপী বিপুল প্রেমে তন্ময় হয়ে রইল। আমারও মনে

হলো, পৃথিবীতে আছে একটি মাত্র পুরুষ আর একটি মাত্র নারী—হর আর গৌরী। অনন্ত প্রেমের পূজারী। আর সব অসীম বিরহ-অন্ধকারে ঢাকা। আজ আমাদের সহযাত্রী সুধাংশুবাবুর মেয়ে গৌরীকে সামান্য গৌরী বলে' মেনে নিতে মন চাইলনা। মনে হলো, সে যেন সেই হরপ্রিয়া গৌরী। কোন্ ভুলে আমাদের দলে এসে মিশেছে। কিছুক্ষণ পর মনের এ ভাবটা কেটে গেলে আবার ডাকলাম, গৌরী! এবার অনেক পেছন থেকে সুধাংশুবাবু ডেকে বল্‌লেন, গৌরী গাড়ীতে বসে' একটু ঘুমাচ্ছে। ডাকছেন কেন? দরকার আছে কিছু?

দরকার যে কত বড় এবং দরকার যে আবার মোটেই নেই, ভেবে লজ্জিত হয়ে বল্‌লাম, না কিছু না, এমনিই। বলে' চুপ করে' রইলাম।

রাত্রি তখন বারোটা কি একটা হবে। আমরা রাধাকৃষ্ণের নামের জোরে অক্ষত দেহে বাঘের মুল্লুক পার হয়ে এসেছি। আরো এগিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গাড়ী আবার হঠাৎ থেমে' গেল। কারণ সমুখের পথ বন্ধ। এই পথের যাত্রী যারা তারা পদে পদে হয় পথহারা। ক্ষণে ক্ষণে শোনে নিষেধের বাণী। পথ বন্ধ। কারণ সমুখের পথ জুড়ে পঞ্চাশ ষাটখানা গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর এগিয়ে যাবার সাধ্য নাই। কারণ ঠিক সামনের একটা স্থান ভীষণ ভাবে ভাঙ্গা; এখানে অনেক গাড়ী পড়ে' গিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই নাকি একটি গুজরাটী পরিবার গুরুতর ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। একটি ছেলে নাকি মারাও গিয়েছে। জ্যোৎস্না অস্ত গিয়েছে।

পাহাড়ী অন্ধকার। চারিদিকে বন-জঙ্গল। এদিকটায় আবার বাঁশ বনও আছে। সামান্য বাতাসেই বাঁশ বনের শো শো শব্দ শুনা যাচ্ছে। এখানে আবার হাতীরও নাকি উপদ্রব আছে। মাঝে মাঝে পথ বন্ধ করে' পথের ওপর নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই সব নানা বাস্তব ও কাল্পনিক কারণে আমাদের আগে চলে'-আসা সমস্ত গাড়ী এখানে এসে থেমে রয়েছে। রাত্রি ভোর হ'লেই আবার রওনা হবে। আমরাও বাধ্য হয়ে গাড়ী বাঁধলাম। গাড়োয়ান গরু ছেড়ে দিয়ে পথের ওপর রাখল এবং আমাদের আবার গাড়ী থেকে নামতে বল্‌ল। গরুর জন্য ঘাস বার করতে হবে। আমরা মেয়েছেলে সব রাস্তার ওপর নামিয়ে দিলাম। ছেলেরা সব ঘুমিয়ে পড়েছিল। এখন গাড়ী থেকে নামবার হট্টগোলে সকলের ঘুম গেল ভেঙ্গে। পাহাড় পর্বত কাঁপিয়ে ছেলেপেলের ক্রন্দন-ধ্বনি উঠল। স্তন্যপায়ী মাতৃক্রোড়ে ক্লান্ত সুপ্ত শিশুর নিদ্রাহারা কাতর অশ্রুজল কঠিন পর্বতশ্রেণীকেও যেন কাঁদাল।

আমরা গাড়ী থেকে নেমে পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। কোথায় যাই, কোথায় বসি, কোথায় শুই, ভাবছি। ঠিক এই সময় গাড়োয়ানরা গরুগুলিকে ঘাস জল খাইয়ে পথের ওপর যে জায়গাটা ভাল, সেখানে এনে গরুগুলিকে রাখল। আমরা বার বার নিষেধ করে' বল্‌লাম, গরু সরিয়ে বাঁধ, আমরা এখানে থাকব। কিন্তু তাড়ি খাওয়া রক্তচক্ষু মাতাল গাড়োয়ানগুলি সে কথা শুনল না। গরুগুলি সেখানেই বাঁধল। ক্লান্ত অবসন্ন গরুগুলিও সাথে সাথে শুয়ে পড়ল।

বরফ পড়া পাহাড়ী বাতাস বইছে। শীতে সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্ করে' কাঁপছে। প্রত্যেকের গায়ে একটিমাত্র জামা। শরীরের হাড়গুলির ভিতরে গিয়ে যেন শীত ও ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুক্‌ছে। বিছানার সুজনী চাদরখানা গাড়ী থেকে টেনে বার করে' গায়ে দিলাম। নিজেদের কাপড়ের আঁচল ছেলেদের গায়ে টেনে দিয়ে মেয়েরা আবার গাড়ীতে উঠে বসল। কম্পাউণ্ডারবাবু কম্বল মুড়ি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাছে এসে বললেন, অশোকবাবু, শীগ্‌গীর আগুন। চারদিকে পথের ধারে পাহাড়ী শুকনো কাঠের অন্ত নেই। রামকিষণ ও বসির কাঠ কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বেলে দিল। কম্পাউণ্ডারবাবু আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে পা সেঁকতে লাগলেন। চেয়ে দেখি, তাঁর পা কলাগাছের মত ফুলে উঠেছে। দেখে ভয় হলো। বল্‌লাম, আপনার আর হাঁটবার দরকার নেই, এখন থেকে আপনি গাড়ীতে বসে' যাবেন। রামতনু কাপড়ের আঁচল গায়ে দিয়ে হুঁকা হাতে আগুনের কাছে এসে বসল। বল্‌লাম, বাকী পথ হেঁটে যেতে পারবে তো? এখনো প্রায় সত্তর আশী মাইল পথ আছে। বল্‌লে, বাবু; আমাদের মত গরীব কাঙ্গালের হাতে পায়ে যাদের রক্ত মাংস নেই, দারিদ্র্য পীড়িত সর্বদেহ, তাদের কি পা ফুলে ওঠার ভয় আছে? যে ক'খানা হাড় আছে বেশ শুক্‌নো আর শক্ত, পচে গলে পড়বার ভয় নেই। তবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শীত এই তিনটিকে বড় ভয় করি। দয়া ক'রে যে দুটো ভাত খেতে দিচ্ছেন, এই বড় পুণ্যের কাজ করছেন। দেশে গিয়ে খোকার মাকে আপনার কথা বলব যে, বড় দয়াল মানুষ।

শীতে মেয়েরাও এখন গাড়ীর ওপর বসে' ঠক্ঠক্ করে' কাঁপছে। ছেলেপেলের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় এখন জল জল বলে' সবাই চীৎকার করে' কাঁদছে। ভাবলাম, এখন জল কাউকেও দেব না। সকলে মিলে চা খাব। তাতেই পিপাসা কমবে। কাজেই সকলে মিলে চা খেলাম। শরীরটা বেশ একটু তাজা হলো। বসে' বসে' গল্প চল্‌ল অনেক রাত পর্যন্ত। শেষ রাত্রির দিকে ঘুমে শরীর অবসন্ন হয়ে এলো, আর বসে' থাকা যায়না। মেয়েরা গাড়ীর ওপর শুয়ে' পড়ল, অনাবৃত গাড়ী। বৃষ্টির মত হিম পড়ছে। হিমে মেয়েদের ও ছেলেদের গায়ের জামা কাপড় ভিজে জল হ'য়ে উঠেছে। মনে হলো, তারা যেন বরফ ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছে। পাহাড়ী ক্ষুধা-তৃষ্ণাঅবসন্ন দেহে ঘুম আসে মৃত্যুর পরশে। মেয়েরা তাই মড়ার মত ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়ে' রয়েছে। আমরাও আর বসে' থাকতে পার্‌ছিনা। কিন্তু শোব কোথায় ? পথের ওপর যেখানে শোব সেখানে গরু বাঁধা। যে জায়গাটুকু বাঁদিকে আছে, সেখানে আবার তিন চারটে মড়া। অসহ্য দুর্গন্ধ। শু'তে যদি হয় তবে এই মড়াগুলির পাশ দিয়ে শুতে হয়। আমাদের সঙ্গে এখনো সেই বাঘ তাড়ানো বাঁশের লাঠি আছে। তিন চারজন মিলে সেই লাঠি দিয়ে গলিত মৃতদেহগুলি ঠেলে ঠেলে অতল গুহায় ফেলে দিলাম। প্রকাণ্ড পাথরখণ্ডের মত মড়ার দেহখণ্ড গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে পড়তে লাগল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই গড়গড়ানো শব্দ শুনলাম। সেই মর্মান্তিক শব্দে আমাদের দেহের প্রতিটি হাড় যেন কেঁপে উঠ্‌ল। কেঁপে উঠ্‌ল ভারতীয় ইভাকুইজদের প্রতিটি নিঃসহায় পথহারা প্রাণ।

মড়া ঠেলে ফেলে যে জায়গাটুকু পাওয়া গেল, আমাদের মধ্যে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে' গেল। কার আগে কে শোবে গাড়ী থেকে গরুর খড় টেনে বার করে' ঐ জায়গাটুকুর ওপর পেতে সুরেশ, ক্ষেত্র আর সুধাংশুবাবু বিছানার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। রামতনু তাদের পাশে বসে ঝিমোতে লাগ্‌ল। তার শোবার জায়গা নেই। রামতনু বললে, কি ভয়ানক পচা গন্ধ। এখানে আপনারা ঘুমোবেন কি করে'? চাদরের নীচ থেকে ওরা বল্‌লে, এ-রকম পচা গন্ধতো আমাদের প্রতি নিশ্বাসেই বইছে। বুড়ো, তোমার জীবনের মূল্য যদি তার চেয়ে বেশী হয়ে থাকে তবে এখান থেকে উঠে গিয়ে ঐ আগুনের কাছে বস। নইলে শীতে আর হিমে মারা যাবে। রামতনু চুপ করে' বসে' থেকে শুধু তামাক টান্‌তে লাগ্‌ল। রামকিষণ, বসির আর মণীন্দ্র গাড়ীর নীচে যে সামান্য জায়গা আছে, সেখানে শুয়ে পড়ল। কম্পাউণ্ডারবাবুকে ধরাধরি করে' আমার গাড়ীতে তুলে' দিলাম। শকুন্তলাদি'র গাড়ীতে আর জায়গা নেই। প্রথম পক্ষের চারটি সন্তান নিয়ে তিনি দুটী চোখ মেলে শুয়ে আছেন। বল্‌লাম, ঘুমাচ্ছেন না যে? বল্‌লেন, নির্বাসনকালে পাণ্ডবজননী কুন্তীর চোখে কি ঘুম ছিল? নিদ্রিত ছেলেপেলে দেখিয়ে আবার বল্‌লেন, এরা আমার যুধিষ্ঠির, ভীম…। হোক সপত্নী সন্তান, গর্ভে ধরিনি সত্য, কিন্তু এরা আমার অন্তরের শিশু তাই এদের পাহারা দিচ্ছি।

শকুন্তলাদি'র কথা যত শুনি ততই মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, এই নারী কে?

একে একে সবাই কেউ গাড়ীর ওপর, কেউ গাড়ীর নীচে রাস্তার ধূলোর ওপর, কেউবা মড়া ঠেলে ফেলে দিয়ে যে যেখানে পারল শুয়ে' পড়ল। এমনি করে' আমাদের আর আমাদের সমুখে পথ-বন্ধ-করে-দাঁড়ানো গাড়ীর লোকদের শোবার বন্দোবস্ত হলো। আমার চোখে ঘুম নেই, ক্লান্তি আছে। শরীর অবসন্ন ও মৃতপ্রায়। কিছুক্ষণ মাটির ওপর রাস্তায় পড়ে' থাকতে পাড়লেও ভাল হ'ত। কিন্তু সে পড়ে' থাকবারও জায়গা নেই। কিছুক্ষণ আগুনের ধারে বসে' বসে' আগুন পোহালাম। চারিদিক এখন শবদেহের মত নীরব নিশ্চল। তৃণ-লতা-বৃক্ষ-পল্লব-অরণ্য-গিরি-গহ্বর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসহীন। বহে না বাতাস, নড়েনা পাতা, নড়ে না আকাশের গ্রহ নক্ষত্র। নিবিড় নিশ্চলতায় সমস্ত জগৎ স্তব্ধ। চারিপাশের যাত্রীদের পথে সুপ্ত বক্ষের হিমসিক্ত নিঃশ্বাসবায়ুর শব্দ কানে এসে পৌঁছে। যেখানে আগুন জ্বেলে বসে আছি একটু দূরেই একটা মড়া। চেয়ে আছি সেই দিকে। এই মৃত ও নিদ্রিত নির্জন পথের ধারে আমি শুধু জেগে আছি। কিন্তু আমার জাগ্রত আত্মা আজ চারিদিকে চেয়ে শুধু কাঁদছে। মৃত নিদ্রিত ও জাগ্রত এই তিন পৃথিবীর অন্তহীন খবর আঁখিপল্লব আর্দ্র করে' দিচ্ছে। আমি যেন শুনছি, বিশ্বময় অনন্ত কান্না। কে মৃত? কে জীবিত? এ প্রশ্ন নিয়ে চল্‌ছে যেন যুগযুগান্তরের ক্রন্দন। মৃত কাঁদে প্রাণ ফিরে পাবার জন্য, আবার প্রাণ কাঁদে জীব-অঙ্গ-হীন হয়ে অশরীরী অনন্তে মিশবার জন্য। তাই শুনছি অনন্ত ক্রন্দন।

চারিদিকে চেয়ে দেখছি ; গৌরীদের গাড়ী দেখছি না। শেষে আগুন ছেড়ে উঠে গিয়ে দেখি, আমাদের সকলের পেছনে গৌরীর গাড়ী ; তার পেছনে আর গাড়ী নেই। ঘোর রজনীর নিবিড় নীরবতায় সে গাড়ীখানা নিস্তব্ধ। কায়াহীন ছায়ার মত আস্তে আস্তে গিয়ে গৌরীর গাড়ীর কাছে দাঁড়ালাম। অশরীরী কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করলাম, জাগ্রত ? নিদ্রিত ? না মৃত ? গৌরী শু'য়ে শু'য়ে বললে, জাগ্রত। বলে' আবার উঠে বসল। বললাম, ঘুমোওনি এখনো ? গাঢ় স্বরে বললে, আপনাদের নাম-সংকীর্তন শোনবার পর থেকে প্রাণ যেন কি ব্যথায় ভরে' গিয়েছে। হেসে বল্‌লাম, বৈরাগ্যের পূর্ব লক্ষণ নয়তো ?

গৌরী বল্‌লে, বৈরাগ্য কাকে বলে জানিনে। কিন্তু আজ আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে সব মিথ্যা, প্রেমই শুধু সত্য। বিস্মিত চোখে ও তন্ময় চিত্তে গৌরীর দিকে অন্ধকারে চেয়ে আছি, কিছুই দেখি না। শুধু ওর চোখ দুটো এক দিব্য আলোয় জ্বলছে দেখতে পেলাম। সে আলোকে আজ নিজকেও চিনতে পেলাম। শেষে নিজের ভিতরে চেয়ে দেখি এক অনন্ত প্রেম সমস্ত অন্তর জুড়ে। আবার গৌরীর দিকে চাইলাম, ওর চোখের ভিতর দিয়ে ওর অন্তরে প্রবেশ করলাম। মনে হলো পুরুষ ও নারী—দুই তীরে দুটী নিখিল বিরহী প্রেম ; যুগযুগান্তর ব্যাপী একে অন্যের অপেক্ষা করছে।

অভিভূত হয়ে দু'জনার মুখের দিকে দু'জনেই চেয়ে আছি। সে চাওয়া সমুদ্রের মত গভীর ; সে চাওয়া অসীম নীরবতায় ভরা, সে চাওয়ার ভিতর দিয়ে যেন আজ পুরুষ ও নারীকে ভাল

করে' চিনলাম। সঙ্গে সঙ্গে পদতলের এই জড় পর্বত ভূমিকম্পের মত যেন কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বুকও দুরু দুরু ক'রে উঠল। কম্পিত বিহ্বল গভীর কণ্ঠে শেষে ডাকলাম গৌরী! সেই গৌরী ধ্বনিটা যেন পার্বত্য ও অরণ্য অন্ধকার ভেদ করে' বহু উর্ধ্বে আকাশের তারায় তারায় গিয়ে আস্তে আস্তে মিশে রইল। আবার ডাকলাম, গৌরী! এবার উত্তর এলো, কি? ক্ষণকাল ওর দিকে নীরবে চেয়ে থেকে শেষে প্রশ্ন করলাম, তুমি কে? এতদিন এক সঙ্গে থেকেও যেন মনে হয় তোমাকে চিনতে পারিনি? আমার এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে' গৌরী যেন ক্ষুণ্ণ হলো। মুখ কালো করে' বল্‌লে, আর কোনদিন চিন্‌তে পারবেন বলেও মনে হয়না। কিন্তু যাক সে কথা, আজ আপনাকে এত বিষণ্ণ আর মলিন দেখাচ্ছে কেন? মনে হয় পথের ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছেন। বল্‌লাম, হ্যাঁ, পথের ক্লান্তিতো আছেই তার ওপর আজ মাথা ধরেছে খুব বেশী। বলতেই গৌরী গাড়ী থেকে হাত বাড়িয়ে আমার কপাল স্পর্শ করে' বল্‌লে, তাইতো! আগুনের মত গরম! জ্বরটর হয়নি তো? ব'লে আমার জামার বোতাম খুলে' বুকে হাত লাগিয়ে বল্‌লে, না, জ্বর নয়। আপনি আর একটু এগিয়ে এসে আমার গাড়ী ঘেঁষে দাঁড়ান। দাঁড়াতেই গৌরী তার দুটী হাত দিয়ে আমার সমস্ত কপাল চেপে ধরল। বল্‌লে, এখন কেমন লাগে? বল্‌লাম, কল্যাণময় স্পর্শ—তার কি তুলনা আছে! গৌরী বল্‌লে, এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকুন; আমি চেপে ধরে' থাকি। বল্‌লাম, বেশ ধর। মনে হয় এ

কল্যাণময়ী নারীর সংস্পর্শেই সারা বিশ্ব প্রাণ-স্পন্দনে হয় ধ্বনিত, হয় জীবিত। দেশের এ সংগ্রামের ধ্বংসস্তূপে একমাত্র নারীই করতে পারে পুনঃ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। গৌরী কিছু বল্‌লে না, শুধু অন্তরের সমস্ত গভীর চাউনি দুটীচোখে ভরে' নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাত্রি ভোর হলো। মানে রাত্রি থাকতেই যেন রাত্রি ভোর হলো। রাতের ঘোর অন্ধকার এখনো চারিদিকে জড়ানো। কিন্তু আর একটু ঘুমিয়ে থাকবার ধৈর্য কারো নেই। একে কি ঘুম বলা চলে? পথের ওপর, মাটিতে, গাড়ীতে, পাহাড়ের গায় হেলান দিয়ে বসে' বসে'—কেউবা গাড়ী ধরে' দাঁড়িয়ে ঝিমিয়ে,—এ হলো আমাদের শত শত যাযাবর যাত্রীদলের ঘুমানোর ব্যবস্থা। এ অবস্থায় রাত্রি ভোর না হ'তেই রাত্রি ভোর হওয়ার অসীম আনন্দ নিয়ে সকলে জেগে উঠে কর্ণভেদী কলরব করে' আবার যাত্রাপথে ছুটে চলতে তৈরী হচ্ছে। রাতের পর রাত নিদ্রাহীন; দিনের পর দিন অভুক্ত; দিনের পর দিন জল-অভাবে সারাবুক শুকিয়ে হয়ে আছে মরুভূমি। সর্বদা ধূলি-ধূসরিত দেহ দেখলে মনে হয় আমরা ধূলার মানুষ; ধূলায় গঠিত, ধূলায় নিঃশ্বাস প্রাপ্ত—আবার ধূলাতেই যেন সেই শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে।

গাড়ী চল্‌ছে। সকলের আগের গাড়ীতে বসে' আছি। পেছনে দলের সব। বার বার মুখ ফিরিয়ে পেছনের দিকে চেয়ে দেখি, পথের সাথীদের করুণ কাতর বিষাদ মন, ম্লান মৃত্যুময় চোখ মুখ। দেখি তাদের জীবনের মর্মন্তুদ

অভিশাপ। পেছনে ফিরে চাইলেই ওরা যেন আমাকে কি বলতে চায়। দলপতি হয়ে আগের গাড়ীতে বসার অক্ষমতা জেগে ওঠে বুকের প্রতিটী রক্তদোলায়। কি বলবে তা আর শুনতে চাই না। ওদের মুখের চোখের আর বুকের পরে শত বেদনার ক্ষত চিহ্ন। কিন্তু আমার কি সাধ্য আছে সে বেদনার এতটুকু উপশম করতে পারি। কিন্তু তারা সে সব জীবন দাহন-করা দুঃখ কষ্টের কথা বলতে চায় না। তারা জানে যাত্রা-পথে দুঃখই শেষ পথে পৌঁছাবার একমাত্র পাথেয়। কিন্তু পেছনে ফিরে চল্‌লেই তারা এখন বলতে চায় আপনার গাড়ীতে জল আছে? এখটু জল দেবেন? সে কথা শোনবার আগেই মুখ ফিরিয়ে এনে সমুখের মরুপথের পানে চোখ রেখে পথ চলি।

জানি, এখন জল চাইলে জল পাওয়া যাবে না। এই পৃথিবীতে জল নেই। নদী, খাল, বিল, সাগর, ঝরণা—এ সকল পৃথিবীর বুকে শুধু কল্পনার মরীচিকা ছবি। তাদের প্রকৃত কোন অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিষয় যেন ঘোর সন্দেহ। বিশ্বাস হয় না আমরা কোনদিন সমাজ সংসারের মানুষ ছিলাম। বিশ্বাস হয়না বাংলাদেশের আমাদের বাড়ী ঘর কোনদিন নদ-নদী পরিবেষ্টিত সুজলা সুফলা ভূমির ধারে ছিল কিনা। ভুলে' গেছি আমরা বাংলার সুজলা সুফলা জীবনের কথা। মনে হলো, আমরা যেন মরুবক্ষে ভ্রাম্যমান তৃষিত মরীচিকা। জল কোথায় পাব? কাজেই পেছনে ফিরে দলের লোকদের দিকে চাইতে

ভয় হয়, পাছে জল চেয়ে বসে। চার পাঁচদিন আগে সেই পাতালপুরীর ছোট ছোট গর্ত থেকে পাঁচ টিন জল তোলা হয়েছিল, এখন সম্বল আছে মাত্র দেড় টিন। এ সামান্য জল রান্নার জন্য যত্ন করে' লুকিয়ে রাখা হয়েছে। শুনতে পাওয়া গেল দু'তিন দিনের মধ্যে আর কোথাও জল পাওয়া যাবে না। কাজেই এখন কেউ জল খেতে চাইলে তাকে পরম শত্রুর মত মনে হয়। কিন্তু সব ছেলে-পিলেগুলি কেঁদে বলে—ভাত না হয় নাই দিলেন, কিন্তু একটু জল খেতে দিন। তখন শিশুদের করুণ কাতর শুকনো মুখের দিকে চেয়ে গভীর বেদনায় চোখের কোণে নামে জল। ভাবি, আমি কে? আমি দলপতি? যার এতটুকু ক্ষমতা নেই এই ছোট ছোট শিশুদেরে মরুপথে এক ফোঁটা জল দিতে, সে আবার দলপতি? তার ওপর এতগুলি জীবন বাঁচিয়ে রাখবার ভার? হায় ভগবান, দলপতি যদি করলে তবে এ অক্ষমতা দিলে কেন? এ হেন দলপতি হওয়ার কলংক আমাকে দিলে কেন? মনে পড়ল, আলাউদ্দিনের wonderful lamp-এর কথা। সেই আশ্চর্য প্রদীপটি যদি এখন আমার হাতে থাকত তবে চোখের পলকে এই পাহাড়ী মরুপথে প্রশান্ত মহাসাগর গড়ে' তুলে' শিশুদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম সর্ব পিপাসা সন্তাপহারী সেই নীল সমুদ্রের অতল বক্ষে।

বেলা ক্রমশঃই বেড়ে চল্‌ছে। চারিদিকে উত্তুঙ্গ পাহাড়ের রৌদ্রদগ্ধ পিপাসাকুল বৃক্ষের শুষ্ক নগ্ন ডালে অনল সূর্য অগ্নি

বর্ষণ করে' সমুখের পথ আরো শ্মশান করে' তুলছে। সেই অনলের উত্তপ্ত জিহ্বা আমাদের পিপাসাকুল জীর্ণ ক্লিষ্ট দেহ লেহন করে' আমাদের আরো দগ্ধীভূত করে' তুলছে। ছেলেমেয়েরা অর্ধদগ্ধ অবস্থার মৃতপ্রায় হয়ে গাড়ীর ওপর চোখ বুঁজে পড়ে' রয়েছে। মাঝে মাঝে অনলবর্ষী দম্‌কা হাওয়া ছুটে এসে যেই অঙ্গে অনল-আঘাত করছে—অমনি তারা আতঙ্কে শিউরে উঠছে। ওদের দিকে চাইতে আর সাহস হয় না। চোখ ফিরিয়ে সমুখের দিকে চাইলাম। বিশেষ করে' আমার গাড়ীর গরু দু'টোর দিকে। গরু দু'টো যেন ক্ষ্যাপা পাগলের মত হাঁটছে। মনে হলো, গাড়ীসহ এবার অতল গুহায় পড়ে না যায়। গাড়ী থেকে উপুড় হয়ে ঝুলে' পড়ে' গরুর পিঠে হাত দিয়ে দেখলাম, আগুনের মত উত্তপ্ত সকল দেহ। যেন একশো ছয় ডিগ্রি জ্বর গরুর গায়ে। বুঝলাম, ওদের বুকেও অগ্নিপ্রলয়।

অনেক চড়াই পথ ওঠবার পর আমরা অনেকগুলি লোক আবার একত্র হ'লাম। আগে যারা অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছিল পেছন থেকে এসে আবার তাদের সঙ্গে একত্র হ'লাম। কারণ এই দলের আগের গাড়ীর গরু নাকি পাগল হয়ে গেছে। বিপথে চলতে গিয়ে পড়ে' যাবে ভেবে আগের গাড়ী থামিয়ে রাখা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সব গাড়ী থেমে গেছে। এখানে আমাদের প্রায় শ'খানেক গাড়ী একত্র হয়েছে। আমাদের গাড়ী পড়ে' রইল সকলের পেছনে। মনে হলো, আমার দলপতিত্ব এবার ঘুচে' গেল। সে ভার

পড়েছে এখন সকলের আগের গাড়ীর আরোহণকারীর ওপর। সেই-ই এখন পথ দেখিয়ে চল্‌বে—আমরা চল্‌বো তার নির্দেশে। এখানে পৌঁছে আজ মানব-ইতিহাসের কথা মনে পড়ল। প্রথম যখন মানুষ সমাজ-সংসারহীন হয়ে অরণ্যে পাহাড়ে পর্বতে বাস করত একজন দলপতির অধীনে, আমরাও যেন এখন পৃথিবীর সেই আদিম অধিবাসী অসভ্য বর্বর ; গুহা-অরণ্যবাসী। যেখানে যাই দল বেঁধে যাই ; যেখানে পাহাড়ে পর্বতে বৃক্ষে অরণ্যে বাস করি, দল বেঁধে বাস করি। যেখানে অরণ্যের পুরাতন তরুশ্রেণীর ছায়া শীতল স্থানে বিশ্রাম করি—দল বেঁধে বিশ্রাম করি। এই পাহাড় পর্বত অরণ্য আমাদের জন্মস্থান। এ অরণ্যের শ্বাপদকুল আমাদের ভক্ষ্য। আমাদের ভিতরের ও বাহিরের চেহারা সেই আদি মানুষের মত। এখন আমাদের ভেতরে হিংস্র প্রবৃত্তি ; পেটের ক্ষুধা যেন কাঁচা মাংসের জন্য। জীব-জন্তুর রক্ত যেন আমাদের পিপাসায় সাগর জলধি। ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাদের এখন এমন যাতনা দিচ্ছে যে, আমাদের মনের সৎপ্রবৃত্তিগুলি এখন মরে' গেছে। আমরা হয়ে গেছি বনের পশু—হিংস্র-জিঘাংসু। আমরা কাঁচা মাংস লুব্ধ, তাজা রক্তপ্রিয়। হয়েছেও তাই। আমাদের আগের দলের কয়েকজন মজুর নাকি এর মধ্যেই একটা হরিণশিশুর কাঁচা মাংস ও তাজা রক্ত চিবিয়ে ও চুষে খেয়ে ফেলেছে। আমাদের বাহিরের চেহারাও ভয়াবহ। রুক্ষ চুল দাড়ি, ধূলি মাখা। এত বড় লম্বা। শত ছিন্ন শক্ত মোটা জামা কাপড় পরা। জানোয়ারের মত ফোলা মোটা

ক্ষত-বিক্ষত নগ্ন পা। দল বেঁধে যেন একত্র বেরিয়েছি ঘন অরণ্যে শিকারের সন্ধানে। আমরা যেন দু'হাজার বছর পূর্বের পৃথিবীর আদি মানব ইতিহাস সর্বাঙ্গে বহন করে' ঘুরে' বেড়াচ্ছি—back to nature—এ ধ্বনি উচ্চারণ করে'। সমস্ত আধুনিক বিশ্ব আজ আমাদের কাছে লুপ্ত। সমস্ত বেশ-ভূষা, আবরণ-আভরণ, কলেজ-কাছারি, অফিস-আদালত, সমাজ-সংসার সব এক মিথ্যার ছায়ায় ভরা। শুধু সত্যের তিক্ত জীবন-ছবি আমাদের সমুখে। বহ্নিতপ্ত পায়ের নীচে বহ্নিতপ্ত পথ আর পৃথিবী। আধুনিক বিশ্ববিহীন হয়ে' অনির্দিষ্টের পানে জীবনব্যাপী ছুটে' চলেছি পরিব্রাজকের অনাড়ম্বর বেশ পরিধান করে'।

আগের গাড়ীর গরু এখন ভাল হয়েছে। আবার সব গাড়ী চল্‌তে সুরু করেছে। ধীরে ধীরে গাড়ী উঠছে পাহাড়ের ওপরে। এবার পথ নাক-বরাবর সোজা, কিন্তু ক্রমশঃ ভীষণ উঁচু। সামনের প্রায় শ'খানেক গাড়ী স্পষ্ট দেখা যায় সারিবন্দী হয়ে চলেছে। সকলের আগের গাড়ীখানা সকলের পেছনের গাড়ী থেকে প্রায় একশো ফুট ওপরে। মনে হলো ঃ আমরা সব যুধিষ্ঠিরের দল, সশরীরে স্বর্গারোহণ কর্‌ছি।

দিন দুই পরের কথা। রাত্রি ভোর হয়ে গেছে। সূর্য এখনো ওঠেনি। চেয়ে দেখি, ক্রমে ক্রমে পথ এত উঁচু হয়ে উঠেছে যে, এখন গাড়ীতে বসা বিপজ্জনক। তার ওপর পথটা মাঝে মাঝে ভাঙ্গা এবং কোথাও কোথাও অত্যন্ত সংকীর্ণ। কাজেই গাড়ী থেকে নেমে ছেলেমেয়ে সবাই হেঁটে চল্‌ছে। প্রায়

সকলেই একে অন্যের হাত ধরে, পড়ে' গেলে যেন অন্ততঃ একে অন্যের সাহায্যে জীবন বাঁচাতে পারে। ঘণ্টা দুই এভাবে হেঁটে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে শেষে এমন এক জায়গায় এসে উঠলাম, মনে হলো ভূস্বর্গ! Thabi the highest hill. তিন হাজার ফুট নাকি এ পাহাড়ের উচ্চতা। একবার মাথা তুলে' ওপরে আকাশের দিকে চাইলাম, দ্যুলোকে ওঠবার আর কতদূর বাকী? আবার চোখ নামিয়ে চারিদিকে তাকালাম। নিঃসীম নিখিল। দিক্‌সীমা শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়, অরণ্যের পর অরণ্য, জনমানবহীন অরণ্য—ভূভাগ। মনে হলো: মানবাদি জীবজন্তু কীটপতঙ্গ পরিবেষ্টিতা পৃথিবী আর নেই। অন্তহীন জড়সৃষ্টি বেষ্টিত আজ সমস্ত ভূভাগ। হাজার হাজার বছর পূর্বে এই পৃথিবী হয়তো এমনি এক সীমাহীন মৃত্যুময় জড়তায় পূর্ণ ছিল। এ মহা জড়-জগতের বক্ষ ভেদ করেই হয় তো একদিন প্রথম প্রভাতে উঠেছিল জীব-শিশুর প্রথম কান্না। হয়তো এই মহা জড়-বক্ষ হ'তেই উঠেছে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের স্পন্দন। পাখীর গান, পশুর গর্জন, কীটপতঙ্গের কিচিমিচি শব্দ; সর্বশেষে মানবশিশুর প্রথম ক্রন্দন-কোলাহল। হয়েছে জগৎ সৃষ্টি; কান্নাময়, হাস্যময়, শব্দময় ও প্রাণময়। হয়েছে ক্রমে সমাজ-সংসার, দেশ-মহাদেশ।

গৌরী আর আমি দু'জনে হাত ধরাধরি করে' একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে অনেকটা এগিয়ে এসেছিলাম। আর সকলে আমাদের অনেক পেছনে। হাত ধরাধরি করে' এ পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে আমরা দু'জন দাঁড়িয়েছি। চারিদিকের পাহাড় আর অরণ্যরাজি

এ পাহাড় থেকে অনেক নীচু। পৃথিবীর সর্বোচ্চস্থান এখন আমাদের পায়ের নীচে। সুদূর দিগন্তরেখা এখন আমাদের চারিদিকে। বিশাল নীরব সুদূর নভোনীল আমাদের মাথার ওপরে। যেদিকে দৃষ্টি ফেরাই সেদিকেই "সুদূরের শেষ নাই।" মনে হলো ঃ কোথায় এই বিশ্বের আদি আর কোথায় তার অন্ত ? এক মহা আদি-অন্তহীনের মাঝে হারিয়ে গেলাম আমরা দু'জন। একবার চোখ ফিরিয়ে গৌরীর দিকে চাইলাম। গৌরীও চোখ তুলে' আমার দিকে চাইল। হারিয়ে ফেল্‌লাম আমাকে গৌরীর ভিতরে ; হারিয়ে গেল গৌরী নিজেও আমার ভিতরে। বাক্‌হীন নিস্তব্ধ উভয়েই ; শুধু গভীর দৃষ্টিভরা দু'জনের চোখ। গৌরী একটু সরে' এসে তার ডান হাত দিয়ে আমার কোমর বেষ্টন করে' দাঁড়াল ; আমার বাঁ হাতও জড়িয়ে রইল ওর কোমল কটিদেশ আবেষ্টন করে'। উদার উন্মুক্ত দিক্-সীমা। বাধাহীন বাতাসের গতি। ওর পরণে নীল শাড়ী। ক্ষ্যাপা পাগল বাতাস বইছে। ওর বক্ষাঞ্চল কিছুতেই সাম্‌লে' রাখতে পারল না। প্রাণস্পন্দন হীন সমুখের এই বিশাল জড়-জগতের বক্ষে সহসা যেন প্রাণের স্পন্দন নিয়ে উন্মুক্ত হলো হেমকান্তিভরা গৌরীর বক্ষের উন্নত দুটী স্তন-পদ্ম-কোরক। ঠিক সেই সময়ে পূব-আকাশ রাঙিয়ে ফুটল সোনার আলো। চেয়ে দেখি সূর্য উঠছে। জীবনে এত বড় বিস্ময়কর আলোর আবিষ্কার কোনদিন চোখে পড়েনি। সেই আলোক গৌরীর দুটী নগ্নবক্ষে এসে পড়ল আর বিশ্ব-চাঞ্চল্যকর লাবণ্যের তরঙ্গ তুল্‌ল। যুবতী নারীকে আজ নূতন করে' দেখলাম। আজ যুবতী নারীর এই অনাবৃত

রূপের মাঝে দেখলাম সৃষ্টির প্রথম কম্পন। সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংসের কথা কোন্ শাস্ত্রে কি বলে জানি না, কিন্তু আজ আমার মনে হলো ঃ যুবতী নারী সৃষ্টিময়ী, প্রৌঢ়া নারী স্থিতিময়ী আর বৃদ্ধা নারী ধ্বংসময়ী। আবার লাজমুক্ত গৌরীর দিকে চাইলাম! মনে হলো ঃ ও প্রকৃতি, আমি পুরুষ। ওর মুখখানা আমার বুকের ওপর রেখে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলাম। এ সময় চারিপাশের অন্তহীন মৌন জড়-জগৎ অসীম নীরব প্রেমের বাণী বহন করে' যেন অন্তরে প্রবেশ করল! মনে হলো ঃ এ প্রেম অমর।

কিছুক্ষণ পর আমাদের লোকজন আর গাড়ী এসে আমাদের কাছে পৌঁছাল। শকুন্তলাদি' এর মধ্যেই ময়লা ছেঁড়া শাড়ীখানা বদ্‌লে' একখানা বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পরেছেন। দেখে হাসি পেল। বল্‌লাম, চৈত্র না আসতেই এই চৈতালী বেশ? তিনিও হেসে বল্‌লেন, মনে হয় কৈলাস পর্বতের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠেছি, তাই গিরি-কন্যা পার্বতী আজ অন্তরে জেগেছে, বাইরে তাই বাসন্তী রঙ। কিন্তু আপনারা হরগৌরী সেজে লুকিয়ে লুকিয়ে আগে আগে পথ চল্‌ছেন যে? এই ইঙ্গিতে গৌরী লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বুদ্ধি খরচ করে' জবাব দিল, না শকুন্তলাদি, আমরা পহাড়ের সূর্য-ওঠা দেখ্‌ছিলাম। শকুন্তলাদি' তেমনি হেসে উত্তর করলেন, বেশ, নয়ন ভরে' দেখ, মনে সুখ থাকলে কত কিছুই দেখতে ইচ্ছা হয়।

এ পর্যন্ত আমরা প্রায় আশী নব্বই মাইল এসেছি। এখান থেকে পথ আবার ক্রমশঃ নীচের দিকে গেছে। পাঁচদিন কেবল ওপরেই উঠলাম। এখন দু'তিন দিন নাকি আবার নীচের দিকে

নামতে হবে। ইচ্ছে হলো : গাড়ীতে উঠে বসি মেরে ফেল্‌লেও এখন আর হাঁটতে পারব না। কিন্তু মরো আর বাঁচ, হাঁটতে হবেই। রাস্তা নীচের দিকে সোজা হয়ে নেমেছে। খালি গাড়ীগুলি পেছন থেকে টেনে ধরতে হয়, নইলে পড়ে' যাবার ভয় যথেষ্ট। এ অবস্থায় কার সাহস এখন গাড়ীতে উঠে বসে। তাছাড়া গাড়ীর অবস্থাও এমন হয়েছে যে, তার ওপরে উঠে বসতেই ভয় করে। উঁচু নীচু রাস্তায় উঠতে নামতে ঝাঁকুনি লেগে লেগে গাড়ীর অবস্থা একেবারে দুরবস্থা হয়ে গেছে। আর একটু ঝাঁকুনি লাগলেই যেন ঝর্ ঝর্ করে' খসে' পড়ে' যাবে। গাড়ীর ওপরের বিছানা-পত্রের অবস্থাও শ্মশান ঘাটের ছেঁড়া বিছানা বালিশের মত হয়েছে। এখন গাড়ীর দিকে চাইলে মনে হয় কেউ মরে' গেছে—পড়ে' আছে শুধু মৃতের বিছানাপত্র। বাধ্য হয়ে সবাইকে আবার হাঁটতে হলো। ছেলেপেলেগুলিকে এখন আবর্জনাস্বরূপ মনে হয়। অনিচ্ছায় সবাই মিলে তাদের কোলে পিঠে তুলে' নিয়ে সোজা নীচু পথ বেয়ে' নামতে লাগলাম। হাতে পায়ে বুকে পিঠে এখন আর শক্তি-সামর্থ্য নাই। সমস্ত ভেতর ও বাইরের দেহটা যেন মরে' গেছে, বেঁচে আছে শুধু মুমুর্ষু প্রাণ। বেলা এখন মধ্যগগনে। অগ্নি-রৌদ্র মাথার ওপরে। রাস্তার পাশে এখন আর ছায়াশীতল গাছপালা নাই। শুধু জ্বলন্ত পাহাড়। একটু ঠাণ্ডা জায়গা পেলে যেন বাঁচি। ছেলেপেলেগুলি কোলের মধ্যে ঢলে' পড়ে' রয়েছে। তাদের সারা দেহে মাত্র কয়েকখানা হাড় আছে, রক্ত মাংস শুকিয়ে গেছে। হাত পা আঙ্গুলের মত সরু হয়ে গেছে।

এখন দড়ির মত ঝুল্‌ছে। ঘাড় ভেঙ্গে বার বার ঢলে' পড়ে। প্রাণ যেন দেহ ছেড়ে দিয়েছে। দেখলে মনে হয় কতগুলো মরা ছেলেপেলে কোলে তুলে' পথ চল্‌ছি। সঙ্গে মাত্র দেড় টিন জল আছে, রান্নার জন্য রাখা হয়েছে। কাপে করে' একটু একটু জল নিয়ে ছেলেদের মুখে দিলাম। ওরা চোখ মেলে চাইল। বলতে লাগল, আর একটু। কিন্তু ধমক খেয়ে চুপ করে' গেল।

প্রায় দশবারো মাইল নীচে নামার পর শেষে আবার একটু সমতল রাস্তা পেলাম। ভাবলাম, বাঁচলাম। কিন্তু এখানে মৃতদেহের স্তূপ দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এখান থেকে রাস্তার দু'পাশে একটানা মড়া। মড়ার শরীর ফুলে' গিয়ে ফেটে গেছে। সাদা পোকাগুলি ফাটা জায়গা দিয়ে পিলপিল করে' ভেতরে যাচ্ছে আবার বাইরে আস্‌ছে। স্তব্ধ চোখে শুধু চেয়ে দেখলাম, কিন্তু ভয় পেলাম না মোটেই। কারণ মড়া যেন এখন আমাদের পথের বন্ধু।

চেয়ে দেখি, কম্পাউণ্ডারবাবু বসে' বসে' হাঁপাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বল্‌লাম, আপনি এখন গাড়ীতে উঠে বসুন। এখন রাস্তা ভাল। তিনি বল্‌লেন, রাস্তা ভাল হোক আর মন্দ হোক, আমি বোধ হয় আর দেশে গিয়ে পৌঁছাতে পারব না। আমার বোধ হয় এখানেই শেষ। আপনি দয়া করে' আমার ছেলেপেলেগুলিকে দেশে পৌঁছে দিন। বল্‌লাম, সে কথা পরে হবে, আপনি এখন গাড়ীতে উঠে বসুন। বলে' তাঁকে ধরাধরি করে' গাড়ীতে বসিয়ে দিলাম এবং আমরাও নিজ নিজ গাড়ীতে উঠে বসলাম। কেবল আমি, গৌরী, ক্ষেত্র, মণীন্দ্র

আর বসির হেঁটে চল্‌লাম। আমার গাড়ীতে এবার সুধাংশুবাবু ও রামকিষণ উঠে বসেছে। কারণ ওরা এখন একটু বিশ্রাম না করলে আর পারবে না, এ পর্যন্ত সারা পথ হেঁটেই এসেছে। রামতনু আমাদের চাল ডালের গাড়ীটায় উঠে বসেছে। বসে' বসে' তামাক খাচ্ছে। তামাকই তার চলার পথে পরম সাথী। এ তামাকের নেশাই হয়েছে তার এই পথ-বেদনার পরম শান্তি। নেশা যে করে তাকে লোকে বলে নেশাখোর কিন্তু তার নেশা যে তাকে ভুলিয়ে রাখে পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট থেকে—তার মূল্য কি কম?

গৌরীকে বল্‌লাম, হেঁটে চল্‌লে যে? গৌরী গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, আমার ইচ্ছে। তেমনি গম্ভীর স্বরে বল্‌লাম, তোমার ইচ্ছে এখানে খাটবে না। দলপতির অর্ডার, গাড়ীতে উঠে বসো গিয়ে। আমার ইচ্ছায় চলতে হবে এখন। গৌরী এবার হেসে ফেল্‌ল। বল্‌লে, কিন্তু আপনারও ইচ্ছে আমি আপনার সাথে সাথেই হেঁটে চলি। একা একা হাঁটতে আপনারও ভাল লাগে না, তা আমি জানি। চুপ করে' থেকে ওর কথা মেনে নিলাম। বল্‌লাম, বেশ, দেখে নেব কতক্ষণ হাঁটতে পার। বল্‌লে, আপনার সাথে হাঁটতে পারব আজীবন। বললাম, বেশ হাঁটো।

সহসা গৌরী বাঁ পাশের পাহাড়টার একখণ্ড পাথরের দিকে চেয়ে পড়তে লাগল, সুরেশ বোসের দল, ডাক্তার এ. এল. দত্তের দল, শান্তা সিংহের দল, ভেংকটস্বামীর দল: শাদা খড়িমাটি দিয়ে পাহাড়ের গায়ে লেখা। গৌরী বল্‌লে, এর মানে কি? বল্‌লাম,

এ সকল লোক এই পথে নিরাপদে পার হয়ে গেছে। এ পথের পেছনে এদের আত্মীয়স্বজন কেউ এলে বুঝতে পারবে, এরা এই পথেই চলে' গেছে। গৌরী বল্‌লে, আমরাও তাহ'লে লিখে রাখি আশোকবাবুর দল। বল্‌লাম, তাহ'লে দাঁড়াও লিখে দিচ্ছি। আমাদের সঙ্গে খড়ি নেই। পকেটে পেন্‌টা খুঁজতে লাগলাম, পাচ্ছি না। পেন্‌টা কি হলো? গৌরী তার কাছ থেকে পেন্‌টা আমার হাতে দিয়ে বল্‌লে, একদিনেই সব ভুলে যান? কাল থেকে পেনটা আমাকে রাখতে দিয়েছেন মনে নেই?

পকেট থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বার করে' লিখলাম, ন্যাশন্যাল ইন্‌ডিয়ান্ লাইফ্ উইথ্ সাম্ লেডিস্। লিখে গৌরীকে বল্‌লাম, কিন্তু এখন কাগজের টুক্‌রোটা পাহাড়ের গায় বেঁধে রাখি কি করে'? গৌরী বললে, আমার খোঁপা খুলে' লাল ফিতেটা নিয়ে বেঁধে রাখুন। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলে' ফিতেটা নিয়ে বেঁধে রাখলাম। বল্‌লাম, হাঁটো এবার। আমরা আগে আগে চলে' যাই, ওরা আসুক পেছনে।

খুব জোরে হাঁটছি। ইচ্ছে গৌরীকে পেছনে ফেলি। কিছুক্ষণ পর চেয়ে দেখি সত্যি গৌরী অনেক পেছনে পড়ে' রয়েছে। পেছন ফিরে ডেকে বল্‌লাম, সঙ্গ ছাড়া হ'লে যে? উত্তর নেই। আমি দাঁড়িয়ে আছি। কতক্ষণ পর কাছে এসে বললে, পুরুষের সাথে সমান পায়ে চলতে মেয়েরা কোনদিন পারে না। হার মানলাম আপনার কাছে। তারপর একটু আবদারের স্বরে বললে, আমাকে পেছনে ফেলে তাড়াতাড়ি হেঁটে এলেন কেন?

আমার ভীষণ ভয় করছিল। চারিদিকে পাহাড় পর্বত আর অরণ্য, পথের মাঝে আমি একা। ওর চিবুক ধরে' মুখখানা তুলে' হেসে বল্‌লাম, আচ্ছা, তুমি যদি আজ এই পথের মাঝে হারিয়ে যাও তবে কেমন করো? মুখভার করে' বললে, কেঁদে কেঁদে মরেই যাবো। বল্‌লাম, তুমি আর আমি দু'জনে মিলে যদি হারিয়ে যাই? গৌরী এবার হেসে বললে, পাহাড়ের গায় হেলান দিয়ে বসে' দু'জনে দিনরাত শুধু কথা বল্‌ব। এবার দু'হাত দিয়ে ওর দুটী গাল একটু আস্তে চেপে ধরে' ওর মুখখানা আমার মুখে প্রায় ঠেকিয়ে ধরে' বল্‌লাম—

"সে কথা শুনিবেনা কেহ আর
নিভৃত নির্জন চারিধার
দু'জনে মুখোমুখি........"

সহসা পথের পাশে থেকে কান্নার ধ্বনি কানে এলো। আর একটু এগিয়ে চেয়ে দেখি সেই বৃদ্ধ মুসলমানটি পাহাড়ের গায় গা ঢেলে দিয়ে বসে' কাঁদ্‌ছে। আমাকে দেখে আরো হাউ হাউ করে' কেঁদে উঠল। বল্‌লাম, কাঁদ্‌ছ কেন? তোমার ছেলে দু'টী কোথায়? যারা তোমাকে সিঁকেয় বয়ে' আন্‌ছিল? দু'হাতে বুক চাপরে বল্‌লে, আমাকে এখানে রেখে তারা চলে' গেছে। আপনার দু'টী পায়ে পড়ি বাবু, আমাকে নিয়ে যান। খোদা আপনার মঙ্গল করবেন। বৃদ্ধের মর্মভেদী আর্তনাদে অরণ্য পর্বতের বুক ভেঙ্গে' চুরমার হয়ে গেল যেন। গৌরী সিক্তকণ্ঠে বল্‌লে, অশোকদা, নিয়ে চলুন একে আমাদের গাড়ীতে তুলে'। কতকক্ষণ পর আমাদের গাড়ী এলো। চেয়ে

দেখি, সকলেই গাড়ীতে উঠে বসেছে। গাড়োয়ান অত্যন্ত গালা-গালি করছে। বসির, রামকিষণ আর রামতনুকে কিছুতেই গাড়ীতে বসতে দেবে না। এর পর যখন এই বৃদ্ধকে গাড়ীতে তুলে' নেবার কথা বল্‌লাম, গাড়োয়ানগুলি ক্ষ্যাপে উঠ্‌ল। আমার কথা বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে' গাড়ী জোরে চালিয়ে চলে' গেল।

বৃদ্ধ শুধু বল্‌লে, নিলে না বাবু? বক্ষভেদী কণ্ঠস্বর। নীরব নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আবার বল্‌লে, বাবু, পিপাসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, জল আছে? একটু জল দেবে, জল? এই অবসরে আমাদের গাড়ী অনেকটা এগিয়ে গিয়ে একটা পাহাড়ের আড়ালে পড়েছে। জলের টিনে সামান্য জল আছে সত্য কিন্তু জলের টিন যে ঐ গাড়ীতে। পাঁচ সাতবার ডাকলাম, বসির! রামকিষণ! শীগগীর গাড়ী থামাও। কিন্তু সাড়া পেলাম না কারোই। গাড়ী কাছে নেই, সবই অনেক এগিয়ে গেছে। বৃদ্ধকে আর কোন কথা না বলে' চুপ করে' চলে' এলাম।

গৌরী বল্‌লে, আপন ছেলে এতো নিষ্ঠুর হ'তে পারে? বাপকে ফেলে যায়? বল্‌লাম, এ পথে, এ জগতে কে কার? ছায়ার মতই সমস্ত সংসার।

বেলা তখন তিনটে বাজে। পথের ওপর রান্না করে' খাবার ব্যবস্থা করছি। জলের আশায় আশায় এতখানি পথ এলাম কিন্তু বিশ্বের কোথাও জল নেই। সঙ্গে যে দেড় টিন জল আছে তা দিয়েই রান্না করে' খাবার ব্যবস্থা হলো। রৌদ্রে পুড়ে' সুদীর্ঘ পথ আসার পর এ জায়গাটা ছায়া-শীতল পেলাম। পথের এক পাশে গভীর গুহা। অপর পাশে পাহাড়ের ঢালু ধার ঘেঁষে

গভীর বাঁশবন। কিন্তু বাঁশতলাটা বেশ পরিষ্কার, কোন আগাছা বা জংগল নেই। পথের ওপর উনুন বানিয়ে রান্না হচ্ছে। এমন সময় কয়েকজন এ্যাংলো ইন্‌ডিয়ান্ ইভাকুউজ্ এলো। সঙ্গে দুটী ইয়ং লেডি, ফুল প্যাণ্ট পরা। অন্য সময় হ'লে হয়তো মেয়ে দু'টীর দিকে মুখও ফেরাতামনা। কারণ এই কটা চেহারা ও কিচিমিচি করে' কথা বলা ইংরেজ মেয়ে কোনদিন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। কিন্তু আজ এক পথের যাত্রী হয়ে' মেয়ে দুটীর দিকে চোখ ফেরালাম। দেখে দুঃখ হলো। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় আর পথের কষ্টে এরাও যেন অর্ধমৃত। ফুল প্যাণ্টের নীচে মেয়ে দু'টীর পা আছে কিনা সন্দেহ হলো। মনে হলো ঃ শুধু প্যাণ্ট্‌টাই কোমর থেকে মাটি পর্যন্ত ঝুলছে। পা দু'খানা প্যাণ্টের ভেতর দিয়ে শুধু দড়ির মত দেখা যাচ্ছে। আমাদের কাছে দাঁড়িয়ে বললে, will you please help us with some food? যে পরিমাণ চাল ডাল রান্না হচ্ছে তাতে আমাদেরই হবে না। তার থেকে অপরকে দেওয়া অসম্ভব। বললাম, very sorry. ওরা আমাদের ভাতের হাঁড়ির ওপর যে দৃষ্টি রেখে চলে' গেল তা জীবনে ভোলবার নয়। মনে হলো, একেই বলে ক্ষুধার্ত।

আমাদের গাড়ী রাস্তার ওপর রক্ষিত। রাস্তা সংকীর্ণ। পাশ কেটে অন্য গাড়ীর যাওয়া একেবারে অসম্ভব। পেছন থেকে আর একদল গাড়ী এসে আমাদের জন্যই এখানে থেমে রইল, তারাও রান্নার ব্যবস্থা করল। গাড়ীতে এখন আর আমরা কেউ নেই। প্রায় দশ বারো মাইল রৌদ্রতপ্ত পথ

পার হয়ে' এখানে এসে বাঁশবনের ছায়া পেয়েছি। গাড়ী থেকে নেমে, ঢালু পাহাড় বেয়ে' ওপরে উঠে বাঁশের ফাঁকে ফাঁকে বাঁশ-তলায় শুয়ে' পড়েছি। নীচে রাস্তায় একপাশে বসে' শান্তিদি' রান্না করছেন। তাঁর কোলের ছেলেটির পেটের অসুখ কমে' গিয়েছে। কিন্তু একটু একটু জ্বর সর্বদা আছে। তবু তিনিই রান্না করছেন। নিষেধ করলে শোনেন না। বলেন, আপনারা যে কষ্ট করে' আমাদের নিয়ে চলছেন, রান্নাও কি এর পর আপনারাই করবেন? আমরা আছি কি জন্যে? আমরা মানে, তিনি নিজেই। মেয়েদের মধ্যে আর কেউ রান্নায় যোগ দেয় না। গৌরীর মা বুড়োমানুষ, এখন মরতে পারলে বাঁচে। শকুন্তলাদি' মেয়ে বেশে পুরুষ সাজা। পুরুষের মত চারদিকে চোখ রেখে তত্ত্বাবধান করেন। কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে পুরুষের মত গম্ভীর স্বরে উত্তর দেন। সেই ঝুলিটা কাঁধে করে' এলোমেলো চুলে ঘুরে' বেড়ান। আর গৌরী আমার সঙ্গলোভী। এ অবস্থায় শান্তিদি' স্বয়ং বাংলার কুলবধূ সেজে নিজে রান্না করেন আর আমাদের এই বুভুক্ষিত দলটিকে পরিবেশন করেন।

বাঁশের ফাঁকে গা ঢেলে শুয়ে' পড়েছি। সর্ব দেহে ক্লান্তি। মনে বিষাদ ছায়া। মৃত্যুময় ম্লান জীবন-নিশ্বাস। মুমূর্ষু রোগীর শিথিলতা আমাদের প্রতি দেহে অনুভব করছি। বক্ষ-সংলগ্ন শীতল মসৃণ সতেজ বাঁশটিকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে ধরে' নিজের মৃত্যু-মলিন দেহে প্রাণপূর্ণ বাঁশের শীতল স্পর্শ অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে জগদীশ বোসের কথা মনে পড়ল: গাছেরও প্রাণ আছে। এই দুজ্ঞেয় বাণীটি আজ চিরন্তন সত্য হয়ে

বুকের ভেতর দিয়ে প্রাণে প্রবেশ করল। আর একটি বাঁশে হেলান দিয়ে বসে' গৌরী ; হেসে বল্লে, আপনি একেবারে বনের শিশু, বাঁশগাছটি বুকে জড়িয়ে ধরে' কি ভাবছেন ? উঠে বসুন। রান্না হয়ে গেছে। খেয়ে একটু সুস্থির হোন্।

একখানা মাত্র থালা। আরো দু'খানা ছিল—এর মধ্যেই কোথায় হারিয়ে গেছে। একজন একজন করে' সে একখানা থালায় করেই একমুঠো আধসিদ্ধ ডাল ভাত খেতে লাগ্‌লাম। একজনের এই একমুষ্টি ভাত খাওয়ার সময়টুকু আর একজনের এক যুগ বলে' মনে হয়। একজনের খাওয়া হ'লে সেই উচ্ছিষ্ট থালাখানাতেই অপরে খায়। খাওয়ার পর হাতমুখ ধুতে নেই। জামা-কাপড়ে হাতমুখ মুছে' নিচ্ছে। খাওয়ার পর মাত্র আধ কাপ জল খেতে পারবে। গৌরীর মা বল্‌লেন, আমি ভাত খাব না, আমাকে একটু বেশী করে' জল দিন। আমি এই উচ্ছিষ্ট থালাখানা ধুয়ে' একটু জল খাব, তাতেই আমার হবে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, এখন রওনা হব। এমন সময় দেখা গেল কম্পাউণ্ডারবাবুর বড় ছেলে প্রতাপ নেই। কোথায় গেল ? কম্পাউণ্ডারবাবু নীচে রাস্তার ওপর মড়ার মত পড়ে' আছেন, শুনে' বল্‌লেন, এ ছেলেটাই হয়েছে আমার আর এক বিপদ। সারাটা পথ জ্বালাতন করে' মারছে। ওর গুণ্ডামী দেখিয়ে দেব একবার দেশে পৌঁছে নিই। হারামজাদা মরুক গিয়ে যেখানে খুসী। শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, তোমার ছেলেরা গুণ্ডা হ'লেই সৌভাগ্যের কথা। আমার ভয় তোমার মত দুর্বল ভালমানুষ না হয়। বলে' উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, প্রতাপ ! প্রতাপ !

পাহাড়ের ওপর থেকে সাড়া এলো—এই যে মা, আমি এখানে। দেখবে এসো, প্রকাণ্ড একটা কি গাছের সঙ্গে জড়িয়ে। ভয়ে সকলে জড়োসড়ো হয়ে, গাছের শুকনো ডাল ভেঙ্গে সকলে মিলে এক একটা হাতে নিয়ে পাহাড় বেয়ে' ওপরে উঠে দেখি, বাপরে! একটা সবুজ রঙের প্রকাণ্ড মোটা সাপ প্রায় দশ বারো হাত লম্বা! একটা গাছের ডালে জড়িয়ে শুয়ে' আছে। আর দুর্দান্ত প্রতাপ ছেলেটা একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে সাপটিকে খোঁচাচ্ছে। গালের মধ্যে একটা চড় দিয়ে কানটি ধরে' নিয়ে এলাম।

আরো দু'দিন পরে যেখানে এসে আমাদের গাড়ীগুলি থেমেছে, সে জায়গাটি বেশ চওড়া; পাহাড়ের গা-ঘেঁষা সমতল-ভূমি। এখানে ইভাকুইজদের বিশ্রামের জন্য বাঁশের মঞ্চ করে' গাছের পাতা দিয়ে ছাউনি করে' প্রকাণ্ড ঘর তৈরী হয়েছে। মনে হলো ঃ এতদিন পর বুঝি একটু বিশ্রামের জায়গা পেলাম। আজ কুড়িদিন হয় আমরা চায়লট থেকে রওনা হয়েছি। এ কুড়িদিন আমাদের কাছে কুড়ি বছরের মত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমরা যেন একদিন কোন্ আদি প্রভাতে এই মহাযাত্রার পথে বেরিয়েছি, কোন অন্তহীন কালের শেষ সন্ধ্যায় যে আবার আমাদের এ যাত্রাপথ শেষ হবে, তা কে জানে? হয়তো এই যাত্রা কোনদিন শেষ হবে না; এমনি করে' চলতে হবে আমাদের এই উত্তপ্ত জীবনের যজ্ঞ শেষ করে'। এ পথের ধারে নাই কোন পরিজন, কোন চির পরিচিত মুখ, কোন স্নেহ-মমতার সুর, প্রিয়ার কোমল কণ্ঠ বা বিশ্রামের জন্য কোন পান্থশালা। আছে শুধু একটানা বিশ্বমানবহীন নিজন বেদনা-গম্ভীর পথ, আছে শুধু

গহন অরণ্য পরিপূর্ণ অভ্রলেহী গিরি-শৃঙ্গ, আর তলহীন গুহার নিশীথ আঁধার। এর ভেতর দিয়ে চল্‌ছে আমাদের একটানা পথ। কিন্তু সহসা এ স্থানে এসে পান্থনিবাস দেখে ভাবলাম, এতদিন পর তা'হলে পথের এই দীর্ঘ অবসাদ ঘোচাবার একটু স্থান পেলাম। এখানে শুয়ে'-বসে' বিশ্রাম করে' সমস্ত দেহের ও হাড়ের ব্যথাগুলি জুড়িয়ে, চোখকে ঘুম দিয়ে, উদরকে আহার দিয়ে, কণ্ঠকে জল দিয়ে মৃতদেহে প্রাণ জাগিয়ে আবার রওনা হব পথের শেষের সন্ধানে।

সূর্য অস্তপ্রায়। সন্ধ্যা নেমে আস্‌ছে। হাজার হাজার লোক আবার এখানে এসে জমা হয়েছে। ছোটখাটো একটা মানব-পৃথিবী যেন এই পথের ওপর সৃষ্টি হয়েছে। হাজার লোকের কোলাহলে চারিদিক মুখরিত। আমরাও এই মানব-পৃথিবীতে পৌঁছে চারিদিকে চেয়ে দেখছি, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাল জায়গা দখল করা যায় কি না। কিন্তু ব্যাপার কি? সবগুলি লোক ঐ পান্থনিবাসের ঘরখানা ছেড়ে' রাস্তার ওপর কেন? ঐ ঘরে কি তাহ'লে আর স্থান নেই? নিকটেই ঐ ঘরখানা। একটু এগিয়ে গিয়ে চেয়ে দেখি, ঐ ঘরে বা ক্যাম্পে জীবিত মানুষ একটিও নেই। জীবন যাদের নেই তারাই সমস্ত ঘরখানা দখল করে' বসে' আছে। একসঙ্গে এতো মড়া জীবনে কোনদিন দেখি নি। সহসা এই মৃতদেহগুলির ভেতর থেকে অর্ধমৃত একটা লোক জল জল বলে' চীৎকার করে' উঠ্‌ল, মৃতরাজ্যে ভূতের কণ্ঠস্বরের মত। এই মড়ার রাজ্যে দাঁড়িয়ে একটি কথা বার বার মনে হ'তে লাগল, মানবদেহে

প্রাণরূপে আর জড়ো-জগতে সূর্যরূপে ভগবান বিরাজ করেন।

দলের লোকের কাছে এসে বল্‌লাম, ক্যাম্প ভর্তি মরা মানুষ। পচা দুর্গন্ধ। তার চেয়ে যেখানেই আছি সেখানে থাকাই ভাল। বলে' পথের ওপর একটু জায়গা করে' নিলাম। এখানে পথের দু'পাশেই অনেকটা স্থান ব্যাপী শ্যামতৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূমি। সমস্ত জায়গাটা জুড়ে' আমরা প্রায় হাজার দুই লোক। লোকের ফাঁকে ফাঁকে আবার দু'একটা মরা মানুষও পড়ে' আছে। সকলের চোখেই এই দু' একটা মড়া অতি তুচ্ছ তাচ্ছল্যের ঘটনা। দু' একটা মড়াকে কেউ মড়া বলে—শত শত মড়া একত্র স্তূপাকারে দেখে আসার পর ?

সন্ধ্যারাত্রেই শোনা গেল সামনের দশবারো মাইল পথ বিপদ-সংকুল। সেটা বাঘের মুল্লুক। আজ রাত্রে এ পথ কেউ ধরবে না। রাত ভোর হ'লে আবার রওনা হওয়া যাবে।

ভয়ানক শীত আর হিম পড়ছে। গাড়ীর ওপর কাপড় দিয়ে ছই তৈরী করে' মেয়েদের শোবার ব্যবস্থা হলো। আমরা গায়ের ওপর, কাপড়ের অর্ধেকটা মুড়ি দিলাম। শকুন্তলাদি'র কাছে গিয়ে বল্‌লাম, আপনারা নির্বিঘ্নে ঘুমোন, বাঘ ভাল্লুক আছে—আমরাও আছি ; কোন ভয় নেই। শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, কিন্তু আপনাদের মত পুরুষের কাছে কোন ভরসাও নেই। মনে নেই সেই কাশবনের বাঘের কথা। তখনই দেখেছি আপনাদের সাহসের দৌড়। লজ্জা পেয়ে চুপ করে' গেলাম। গৌরীর গাড়ীর কাছে গিয়ে বল্‌লাম, একি, তোমার

গাড়ীতে কোন ঢাকা দাওনি? তুমি কাপড় দিয়ে একটা ছই করে' নাওনি? গৌরী বল্‌লে, সকলেরই দু'একখানা কাপড় বেশী আছে, আমার তো পরার শাড়ীখানা ছাড়া আর দ্বিতীয়টি নেই। নিজের গাড়ী থেকে সুজনী চাদরখানা এনে ওর হাতে দিয়ে বল্‌লাম, এই নাও, ছই করে' এবার ঘুমোও। গৌরী বল্‌লে, আপনি? বল্‌লাম, আমি আগুন পোহাব, রাত জাগব আর বাঘ তাড়াবো। বল্‌লে, অত সাহসের দরকার নেই, আপনার কে আছে যে সারা রাত জেগে বাঘের পাহারা দেবেন? বরং আপনার গাড়ীখানা একটু ঠেলে' এনে আমাদের গাড়ীর পাশাপাশি রাখুন। দুটো গাড়ী মিলে' একটা ছই করা যাক। সুজনী চাদরটা বেশ বড় আছে। পরামর্শটা একেবারে মন্দ লাগল না। সারা রাত পাহাড়ী হিম-ঝরণার নীচে বসে' স্নান করার চেয়ে গৌরীর উপদেশই ভাল ভেবে নিজেই গাড়ীখানা ঠেলে' ঠেলে' এদিকে সরিয়ে আনতে লাগলাম। কিন্তু গাড়ীখানা আর নড়ছে না। চেয়ে দেখি, গাড়ীর চাকা একটা মড়ার গায়ে ঠেকে গেছে। আগেই বলেছি, আমাদের এই হাজার দুই লোকের ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা করে' মরা মানুষও আছে। আর একজন লোকের সাহায্য নিয়ে মড়াটা সরিয়ে গাড়ীখানা শেষে গৌরীদের গাড়ীর সঙ্গে পাশাপাশি রেখে বল্‌লাম, এবার ছই তৈরী করো। বলে' আবার শান্তিদি'র গাড়ীর কাছে গেলাম। দেখি, সেই অসুস্থ ছেলেটা কোলে করে' তিনি বসে' আছেন। বল্‌লাম, ঘুমোন নি? তিনি বল্‌লেন, বাঘের ভয়ে কি আর ঘুম আছে চোখে? তার ওপর খোকাটা শীতে ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপছে; কাঁথা

কাপড় সব হিমে ভিজে উঠেছে। আপনি এই কাঁথাখানা একটু গরম করে' দেবেন ?

সবাই আগুন জ্বেলে আগুন পোহাচ্ছে। কাঁথাখানা সেঁকে' সেঁকে' গরম করে' শান্তিদি'র গায়ে জড়িয়ে দিলাম। তিনি বল্‌লেন, বাঁচলাম। ফিরে এসে দেখি, গৌরী দুটো গাড়ী জুড়ে' ছই তৈরী করে' ফেলেছে। হেসে বল্‌লাম, বাঃ, চমৎকার ছই হয়েছে তো! মাঝিগিরি করতে নাকি কোনদিন? গৌরী বল্‌লে, ধ্যেৎ! বল্‌লাম, তবে? বল্‌লে, ওপরে উঠে আসুন, বল্‌ব পরে। প্রায় বুক সমান উঁচু গাড়ী। উঠতে হ'লে গাড়ী থেকে একজনকে টেনে তুল্‌তে হয়। গৌরীর দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌লাম, টানো। গৌরী আমার ডান হাতখানা ধরে' টানতে লাগল। মনে একটু দুষ্টুমি বুদ্ধি হলো। নিজে ওঠবার চেষ্টা না করে' গৌরীর ওপরই সে চেষ্টার ভার দিয়ে নিজে একেবারে গা ছেড়ে' দিলাম। গৌরী যথাসাধ্য টান্‌ছে কিন্তু এতটুকুও ওঠাতে পার্‌ছে না। মনে মনে হাস্‌ছি। গৌরী একেবারে নিরাশ হয়ে' বল্‌লে, আপনি নিজেও একটু চেষ্টা করুন, একেবারে গা ছেড়ে' দিলেন কেন? হেসে বল্‌লাম, তোমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে' দেখলাম, তুমি অক্ষম। ঠিক এমন সময় আমাদের পালে সত্য সত্যই বাঘ এসে তাড়া দিল। কে একজন সহসা চীৎকার করে' বলে' উঠ্‌ল, বাঘ! বাঘ এসেছে! বাঘ! অমনি সমস্বরে প্রায় হাজার কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে' উঠ্‌ল, কই? কোথায় বাঘ? মারো! মারো! বলে' হাতের সামনে যে যা' পেল তা দিয়েই বাঘ মারতে তৈরী হ'তে লাগল। কিন্তু হাতের

সামনে সকলেই পেল জলের খালি টিনগুলো। একসঙ্গে প্রায় হাজার-খানেক কেরোসিনের খালি টিন বেজে' উঠ্‌ল। মনে হলোঃ রণভেরী। বাঘের সাধ্য কি এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে ঢোকে। বাঘ আর খুঁজে' পাওয়া গেল না। আসলে বাঘের মুখ কেউ দেখেনি। কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে' গেল সেই মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের মত। বৃথাই সকলে মিলে হৈ চৈ করে' মরলাম।

কম্পাউণ্ডারবাবু এমন অচেতন ভাবে চোখ বুঁজে পড়ে' আছেন যে, তিনি জীবিত কি মৃত ঠিক বোঝা যায় না। ডেকে বল্‌লাম, ঘুমোচ্ছেন নাকি? তিনি চোখ বুঁজেই জবাব দিলেন, বাঘটা কি মেরে ফেলেছেন? হেসে বল্‌লাম, সে ভয়ে আপনি এখনো চোখ বুঁজে পড়ে' আছেন? সেতো অনেকক্ষণ বাঘ মেরে ভূত করে দিয়েছি। শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, ভাগ্যি আপনি সঙ্গে ছিলেন, নইলে এঁর মত বীরপুরুষকে নিয়ে এই দুর্গম পথে চলা অসম্ভব হয়ে' উঠ্‌ত।

রাত ভোর হলো। আবার গাড়ী ছুট্‌ল। সকলে বলাবলি কর্‌ছে আজকের দিনটা কাটলেই নাকি টাংগুব গিয়ে পৌঁছতে পারব। এ পর্যন্ত নাকি আমরা প্রায় শ'খানেক মাইল পাহাড়-মুল্লুক পার হয়ে' এসেছি। শুধু আজকের দিনটা হাঁট্‌লেই পাহাড়ের রাজ্য শেষ হবে, তারপর সমতল টাংগুবে গিয়ে পৌঁছাব। সেখান থেকে লঞ্চে আকিয়াব। টাংগুব ষ্টীমার ষ্টেশন। নদী আছে, জল আছে, চাল ডাল সবই আছে। এই সব কথা ভেবে সারা দেহে যেন নতুন করে' প্রাণ ফিরে পেলাম। মৃত্যুর বুকে এলো আবার আশা ও আনন্দ; এলো বাঁচবার আশা

আর মৃত্যুর প্রতি মহা ঘৃণা। শুনতে পেলাম সত্য সত্যই আর কয়েক মাইল পথ নাকি সমুখে আছে। আজকের দিনটা বেঁচে থাকতে পারলেই আবার হয়তো বেঁচে থাকতে পারব আজীবন। সবার মনে বাঁচবার এমনই তীব্র বাসনা। কিন্তু আজকের দিনটা নিয়েই ভীষণ সমস্যা। আজকের দিন পরেও যদি পথ না ফুরোয় টাংগুব পৌঁছতে আরো চার পাঁচদিন দেরী হয়ে' যায়, তবে সকলেরই অনাহারে ও পিপাসায় মৃত্যু অনিবার্য। কারণ খাদ্যস্বরূপ তণ্ডুল কণামাত্রও কারো সঙ্গে নেই। এর পরও যদি পথ শেষ না হয় তবে নিশ্চিত মরণ। গাড়োয়ানরা এই দেশের লোক। পথের খবর এরা সামান্য রাখে। এদের কথা বিশ্বাস করলাম। এরা বল্‌লে, সন্ধ্যে নাগাদ্ টাংগুব পৌঁছে দেবে। কিন্তু গাড়ীর বোঝা হাল্‌কা করে' দিতে হবে। গরুগুলো এখন আর হাঁটতে চায় না, হাঁটতে পারে না। গরুর সমস্ত দেহে মাত্র হাড় ক'খানাই সার আছে ; রক্তমাংস শুকিয়ে গেছে, গরুগুলি তাই পথের মাঝে শুয়ে' পড়েছে। আমাদের চাল ডাল বয়ে'-আনা গাড়ীর একটা গরুর বয়স কম। সে গরুটা শুয়ে' পড়েনি সত্যি কিন্তু তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে যখন ছোটে একেবারে পাগলের মত ছোটে। সে গাড়ীখানা এখন চল্‌ছে একেবারে খালি। চাল ডাল নেই, কিন্তু কোন লোকও নেই। কারণ কেউ সে গাড়ীতে উঠতে সাহস পায় না, গরুটা পাগল, যদি গুহার মধ্যে লাফিয়ে পড়ে ? কাজেই গাড়ীখানা একেবারে হাল্‌কা। এমন হাল্‌কা গাড়ী হ'লেই এখন গরুর

পক্ষে সুবিধা। কাজেই গাড়োয়ানরা বল্‌লে, সবাইকে হেঁটে যেতে হবে, মেয়েছেলে বাদে।

তথাস্তু। বলে' সবাই মিলে হাঁটতে সুরু করলাম। মেয়েরা গাড়ীতেই বস্‌ল। কিন্তু বসতে চাইলেই বসা যায় না আর হাঁটতে চাইলেই হাঁটা যায় না। কারণ এখন পথ আরো ভয়ংকর, আরো সংকীর্ণ ও বন্ধুর। পথ এখান থেকে ঢালু হয়ে নীচের দিকে যেন সোজা হয়ে নাম্‌ছে। কারণ মাইল কুড়ি পরেই নাকি টাংগুব, সমতল ভূমি। সেজন্য এই কুড়িমাইল পথ পেছন থেকেই নীচের দিকে খাড়া হয়ে নামতে সুরু করেছে। এ অবস্থায় গাড়ীতে বসে' পথ চলা বিপজ্জনক। গাড়ী উল্টে পড়তে পারে। আবার হেঁটে যাওয়াও এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সমতল ভূমি পাব, নদী পাব, জল পাব, স্নান আহার করতে পারব, আবার মানুষের মত বেঁচে থাকতে পারব, সে আশায় নবীন উৎসাহে মাইল পাঁচেক পথ হাঁটলাম। কিন্তু আশায় আর সজীব থাকা যায় কতক্ষণ? দেহের ও মনের সজীবতা এই পাহাড়ী পথে একটু একটু করে' মরে' গেছে যেন। দেহে কি আর কিছু আছে? সব গেছে নিঃশেষ হয়ে। দুরু দুরু করছে বুক। প্রতি পদক্ষেপে সর্বাঙ্গ কেবল কাঁপছে। ঘূর্ণি লেগে কাত হয়ে পড়ে' যেতে চায়। তার ওপর যে রকম নীচমুখো ঢালু রাস্তা, কিছুতেই পা সামলাতে পারছি না। কে যেন ঘাড় ধরে' নীচে ঠেলে নামাচ্ছে। এখন ইচ্ছে করে গাড়ীতে উঠে বসি। কিন্তু হাঁটার চেয়ে গাড়ীতে উঠে চলার ভয় অনেক বেশী। যারা উঠে বসেছে, তারাই এখন ভয়ে নেমে পড়তে

চায় ; কারণ আমাদের শরীরে যখন বল ছিল, তখন গাড়ী পেছন থেকে টেনে ধরে' গাড়ীর দোল সামলে নিতাম। প্রত্যেক গাড়ীর পেছনেই আমরা একজন চল্‌তাম, গাড়ী টেনে ধরে' ধরে'। এখন আর সেদিন নাই, দেহে সে বলও নাই। নিজের অসহ্য ক্লান্ত দেহখানি নিজের কাছেই বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এখন গাড়ী টেনে' ধরবার মত শক্তি কারো দেহে নাই। মেয়েরা শেষে ভয়ে গাড়ী থেকে নেমে হাঁটতে লাগ্‌ল। বল্‌লে, আর দশ পণর মাইল মরে' বেঁচে হেঁটেই যাব।

সব গাড়ী এখন হাল্‌কা ; কারণ আরোহী নেই। কাজেই ঢালু রাস্তা পেয়ে গাড়ীগুলি যেন আপনিই গড়িয়ে পড়তে লাগল। দলবল নিয়ে গাড়ীর আগে আগে হাঁটছিলাম। কিন্তু আগে হাঁটা ভয়ানক বিপদ। গরুগুলি দৌড়ে এসে আমাদের গায়ের ওপর এসে পড়ে। গাড়ী চাপা পড়ে' মারা যাব শেষে? গরুগুলি দৌড়ে নামে, ঢালু রাস্তাই যেন গাড়ীসহ গরুগুলিকে ধাক্কা দিয়ে সমুখে ঠেলে' নামাচ্ছে। কাজেই সমুখের রাস্তা ছেড়ে গাড়ীর পেছনে পেছনে থেকে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু বিপদ চারিদিকে। কতক্ষণ পর পর অপর দলের গাড়ীগুলো এসে তেমনি গায়ের ওপরে পড়ে যেন। একপাশে দাঁড়িয়ে থেকে পথ ছেড়ে দিই। শুধু সামান্য মালপত্র বোঝাই যাত্রীহীন খালি গাড়ীগুলি হু হু করে' চলে' যাচ্ছে। গাড়োয়ানরা এখন আর গাড়ীর ওপরে মানুষ তুলতে চায়না, শুধু সামান্য মালপত্র। দেখে মনে হলো—এ পৃথিবীতে মানুষই সব চেয়ে অবাঞ্ছিত

বোঝা। এমনি করে' শূন্য গাড়ীগুলির পথ ছেড়ে' দিতে দিতে আমরা অনেক পেছনে পড়ে' রইলাম। আমাদের গাড়ী যে ততক্ষণে কতদূর চলে' গেছে কে জানে? কিন্তু একমাত্র ভরসা গাড়ী হারিয়ে যাবার ভয় নেই, যতদূরই যাক না কেন। একমাত্র পথ, অন্যগতি নাস্তি। দেখা হবেই। কিন্তু এদিকে যে আর হাঁটতে পারছি না। এখন গাড়ীর ওপর একটু বসতে পারলেই যেন বাঁচি। বিশেষ করে' মেয়েদের মুখের দিকে এখন আর চাওয়া যায় না। 'একটু তাড়াতাড়ি হাঁটুন' এ কথা বলতে আর সাহস হয় না। তাদের মুখ চোখ দেখলেই আতংকে প্রাণ কেঁপে ওঠে। মরা মানুষের মত মুখচোখের চেহারা; বিশ্রী বিবর্ণ। চোখ দু'টী যেন কোন গুহায় ঢুকে' গেছে। গালের হাড় অনেক ওপরে উঠে গেছে। সমস্ত দেহে এখন শিথিল বসন। মাথায় ঘোমটা নেই, ধূলো মাখা এলোচুল, জট্ পাকানো। চোখের পাতার চুল আর ভুরু-যুগল ধূলায় একেবারে সাদা হয়ে' গেছে। মানুষ না প্রেতাত্মা সহজে বুঝা যায় না। দুলতে দুলতে কাঁপতে কাঁপতে তবু পথ চল্‌ছে। পথের দু'পাশে মড়ার পর মড়া পড়ে' আছে। কখনও কখনও এই মৃতদেহগুলির ওপর অসাবধানে পা গিয়ে ওঠে, কিন্তু তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মরা মানুষ দেখে এখন আর ভয় হয় না, বরং চোখের সামনে একটা বিরাট সত্য জিনিষ ধরা পড়ে। মনে হয় মৃত্যুই সত্য, এ জীবনই মিথ্যা। জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্যন্ত মাঝখানের এ ক'টা দিন শুধু স্বপ্ন ও মায়া-মরীচিকা দিয়ে ভরা। মাঝখানের এ যাত্রাপথটুকু কেবল ঘন অরণ্য আর বন্ধুর পাহাড় পর্বত দিয়ে ঘেরা; স্পষ্ট করে'

সামনের কিছু দেখা যায় না, জানা যায় না। জন্মের আগে ও মৃত্যুর পরে যে জীবন তা নিয়েই জীবনের সব চেয়ে বড় প্রশ্ন এবং সে প্রশ্নের রহস্য অনুসন্ধানের জন্যই আমাদের কিছু-দিনের জন্য এই পৃথিবীতে আসা।

আমাদের আগে আগে হেঁটে চল্‌ছেন আর একজন ভদ্রলোক। সঙ্গে তাঁর তিনটি মেয়ে—নিজের কন্যা। আমাদের মত তাঁরা গাড়ী করে' আসেননি। পায়ে হেঁটে পথ ধরেছেন। সব চেয়ে ছোট মেয়েটির বয়স বারো তেরো ; হঠাৎ সে মেয়েটি কাত হয়ে' রাস্তার ওপর পড়ে' গিয়ে মারা গেল। ভদ্রলোক ও বাকী দু'টী মেয়ে মেয়েটির দিকে চেয়ে বার বার চোখ মুছে' আবার পথ ধরল। আমরা মৃত মেয়েটির পাশ কেটে চলে' এলাম। দেখে' এলাম মর্মন্তুদ দৃশ্য। এ পথ শুধু দেখবার, করবার কিছুই নেই।

খুব কাছে কাছে থেকে আমরা এখন হাঁট্‌ছি। আমাদের মধ্যে কেউ যেন ঐ মেয়েটির মত আবার পথের পাশে খসে' না পড়ে। কারো মুখে কোন কথা নেই, চুপচাপ চল্‌ছি। কি এক ভয়াবহ গভীর নীরবতা আমাদের সকলকে ঘিরে আছে। শুধু মনে হলো : ঐ মেয়েটির নীরব আত্মা বিরাট স্তব্ধ রূপ ধরে' আমাদের আশেপাশে ঘুরে' বেড়াচ্ছে যেন। আমাদের জীবনকে যেন নীরবে উপহাস কর্‌ছে। গৌরীকে বল্‌লাম, এত চুপচাপ যে? ভাব্‌ছ কি? কথা কইছ না যে? গৌরী বল্‌লে, ভাবছি, আমাদের মধ্যে যদি কেউ এমনি মারা যায়, তাকেও কি এমনি করে' পথের ধারে ফেলে যাবেন? বল্‌লাম, কিন্তু কে মারা যাবে তার কথা আগে জানা দরকার। বল্‌লে, ধরুন, আমি

মারা গেছি—আমাকে? বল্লাম, অবিকল ঐ মেয়েটির মতই তোমারও মৃতদেহ পড়ে' থাকবে এই গিরিমূলে। গৌরী বল্লে, আপনিও আমাকে ফেলে' যাবেন? এতটুকু দুঃখ হবে না আপনার?

এবার মলিন কণ্ঠে বল্লাম, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহের অতীত এই পথ। হয়তো যেতে যেতে তোমার মুখখানার দিকে একবার চেয়ে বলব ঃ

"হায়রে হৃদয় তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।"

এখানে আপনারা হয়তো কেউ বলবেন যে, এত দুঃখের পথ চলতে গিয়ে প্রেমিকার কাছে এ সব কাব্য দিয়ে কথা বলা সম্ভব হয় কি করে'? যত সব গাঁজা। কিন্তু সত্যিই গাঁজা নয়। আসল ব্যাপারটা হলো ঃ আমরা এতদিন ধরে' দুঃখের পথ বেয়ে বেয়ে শেষে দুঃখটাকে এখন আর দুঃখ বলেই মনে করি না। দুঃখ-কষ্ট এখন গা-সহা হয়ে' গেছে। দুঃখটাই যেন মাঝে মাঝে সুখের মত লাগে। মনুষ্যসমাজে থাকতে চির দুঃখী যারা তাদের কথা অনেক সময় ভেবেছি যে, এরা এতো দুঃখ-কষ্টের মাঝে এমনি হাসিমুখে বেঁচে আছে কি করে'? আজ সে প্রশ্নের জবাব নিজেই পাচ্ছি এই পাহাড়ী পথে এতদিন হেঁটে। তাই মাঝে মাঝে কবিতার আবেগ এসে পড়ে। দুঃখের মাঝ থেকে কঠোর সত্যগুলি যেন আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

গভীর বেদনায় গৌরীর মুখ চোখ কালো হয়ে গেল। বললে, প্রেম জিনিষটা তা'হলে আপনি বিশ্বাস করতে চান্ না? দু'জনের

এতদিন ধরে' এই একই পথে চলার কথা এক মিনিটে ভুলে' যেতে পারবেন ?

—বললাম, পথের প্রেমেই আমরা ছুটে চল্‌ছি, মানুষের প্রেমে নয়। মানুষ দু'দিনের ; পথ চিরকালের। মানুষ শুধু জীবনব্যাপী যাত্রীর দল। এ পথের মাঝেই সব কিছু পেতে হয় আবার এ পথের শেষে সব কিছু ফেলে যেতে হয় ঃ

পথ মাঝে পেয়েছি কুড়ায়ে,
পথ শেষে গিয়াছে ফুরায়ে।

গৌরীর চোখ দু'টী ছল ছল করে' উঠ্‌ল। বললে, পথের প্রান্তে পৌঁছে' কি এ পথের স্মৃতি কিছুই থাকবে না ?

—পাবার জন্যই কি প্রেম ? না-পাওয়া-প্রেমই যুগ-যুগান্তর বেঁচে থাকে। প্রেম হলো আকাশের চাঁদ, তাকে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু তার স্নিগ্ধ আলোক যুগযুগান্তর সকল দেহে অনুভব করি।

সহসা মৃত্যুযাতনার অস্ফুট ধ্বনি কাণে এলো। মুমূর্ষু একটি লোক পথের পাশে পড়ে' আছে। মৃত্যু-ব্যথায় ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। পথ-পাশের এই অবস্থা দেখে এখন আর ভয় বা দুঃখ হয় না। পাষাণ-পথে আমরাও এখন পাষাণ। লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। গৌরী আর আমি দু'জনেই দাঁড়িয়ে দেখছি। দেখছি ভারতীয় ইভাকুইজদের পথের মাঝে অসহায় মৃত্যু ! আমাদের পায়ের শব্দ শুনে' লোকটা চিৎ হয়ে শু'তে চাইল, পারল না। দু'জনে ধরে' চিৎ করে' শুইয়ে দিলাম। লোকটিকে চিনতে পারলাম। এই সেই প্রেমিক পুরুষ।

রেংগুন থেকে পালাবার দিন এ-আর-পি পোষাকে যাকে দেখেছিলাম, সেই মিঃ স্মিথ এখন খাঁটী মাদ্রাজী পোষাক পরা। এতদূর এসে এখন মরতে চলেছে। মিঃ স্মিথ আমাদের দিকে একটু চেয়ে হা করে' জিব নাড়তে লাগল। বললাম, কি চাও? নিরুত্তর। বল্‌বার শক্তি আর নেই। দৃষ্টিহীন চোখ দুটী মেলে' মাঝে মাঝে গোঙাতে লাগল। গৌরী বল্‌লে, জল পিপাসায় এমন করছে। একটু জল চাইছে।

কিছুদূরে একটা মানুষ মরে' আছে। পাশে টিনের বাটিতে একটু জল আছে; মৃত লোকটিরই অমূল্য সম্পত্তি। তার এ জলটুকু তুলে' এনে' এ-আর-পি'র মুখে ঢেলে দিলাম। খেতে পারল না সে, মুখেই আট্‌কে রইল। মরুবুকের বৃষ্টিজল ওপরের বালুর উত্তাপেই জমাট্‌ বেঁধে যায়, ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

কম্পাউণ্ডারবাবু বকাবকি সুরু করে' দিয়েছেন, হারামজাদা গাড়োয়ানগুলি গাড়ী নিয়ে গেল কোথায়? ভাড়ার টাকাগুলি জলে গেল, অর্ধেক পথ হেঁটেই এলাম। তারপর একটা দীর্ঘ-শ্বাস টেনে' রাস্তার এক পাশে বসে' পড়লেন। বল্‌লেন, আর পারি না—পা দুটো কোমর থেকে ছিঁড়ে' পড়তে চায় যেন। কি কুক্ষণেই এই পথ ধরেছিলাম। এমন পথ, এমন গাড়ী আর গাড়োয়ান—এ যদি আগে জানতাম তবে কি আর এই পথে আসি। এখন গাড়ী-গরু হারিয়ে রাস্তায় পচে' গলে' মরি।

আমি আর গৌরী অনেকটা এগিয়ে এসেছি। আমাদের অনেক আগে চল্‌ছেন শকুন্তলাদি, বসির, রামকিষণ ও ছেলেপেলেরা।

আমাদের অনেক পেছনে কম্পাউণ্ডারবাবু, শান্তিদি, গৌরীর বাবা ও মা ; আর হুঁকা হাতে রামতনু। দলের লোক এখন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পথ চল্‌ছে। কারো জন্যে কারো মায়া নেই, কারো জন্যে কারো অন্তরের টান নেই। যে যেমন খুসী চলছে, যেমন খুসী পথের পাশে বসে' জিরিয়ে নিচ্ছে, যেমন খুসী এগিয়ে চল্‌ছে। একটা বিষাক্ত অবসন্নতা সকলের আপাদমস্তক জুড়ে'। শুষ্ক ওষ্ঠ, মরুময় শূন্য বুক, বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, দৃষ্টিহীন চোখ, গতিহীন অবশ চরণ-জীবন্ত মানুষের চেয়ে মৃত মানুষের চেহারাই সব চেয়ে বেশী পরিস্ফুট। বেঁচে থাকার চেয়ে এখন মরে' যাওয়াই বেশী প্রিয় হয়ে' উঠেছে সকলের কাছে। প্রথম প্রথম সকলের প্রতি সকলের যে প্রীতি, যে মায়া মমতা, যে সহৃদয়তা দেখেছিলাম এখন আর তা নেই। কি যেন একটা বিষাদ সত্যের তিক্ত অনুভূতি সকলকেই কর্‌ছে অভিভূত। কি যেন একটা গভীর উদাসীনতা—কি যেন একটা বিরাট নিঃসঙ্গতা সকলকে করছে ম্রিয়মাণ। কি যেন একটা প্রলয় ঝড়ের উন্মত্ত বাতাসে আমাদের মন প্রাণ একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে' কোথায় উড়ে' গিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মনে হলো ঃ প্রত্যেকেই এখন প্রত্যেকের কাছে অপ্রিয় ; অসীম অজানা অচেনা। পথের প্রান্ত-সীমায় এসে দেখলাম, সকলেই আমরা এক্‌লা পথের যাত্রী। এখন সবাই এক অসীম উদাসীন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পথকেই জীবনের সাথী করে' নিজের মনে হাঁটছি।

যখন সকলের মনে এ অবস্থা তখন ইচ্ছা হ'লেও এমন কি মমতার সুরে কারো সঙ্গে কথা কইতে সাহস হলো না।

সকলের মুখের চেহারা বিষাদ-গম্ভীর। এ অবস্থায় কারো সঙ্গে কোন কথা না বলে' সমুখ পথে ছুটে চললাম গাড়ী খুঁজতে। এখন কাছাকাছি গাড়ী না পেলে ছেলেমেয়ে সব ফিট্ হয়ে' পড়বে, কারণ হাঁটবার মত দেহে শক্তি-সামর্থ্য কিছুই নেই। কিছুদূর এগিয়ে দেখি, ক্ষেত্র ছেলেটি পেছন পথে আমাদের খোঁজে আসছে। বল্‌লে, সবগুলি গাড়ী খালি দেখে দৌড়ে গিয়ে একটার ওপর উঠে বসেছিলাম—সারা পথ হেঁটেছি, গাড়ীতে বসে' ঘণ্টা দুই মজা করে' নিলাম। এখন আপনারা গিয়ে গাড়ীতে বস্থন। সামনের পথ এখন ভাল। ক্রমশঃ সমতল হয়ে আসছে। বোধ হয় টাংগুবের কাছাকাছি এসে পড়েছি। সামনেই গাড়ী বাঁধা হয়েছে; গাড়োয়ানরা গরুগুলিকে খেতে দিচ্ছে, নিজেরা রান্না চাপিয়েছে। চলুন, আমরাও রান্না করে' খেয়ে নিই।

যেখানে গাড়ী বাঁধা হয়েছে—একে একে সবাই সেখানে গিয়ে হাজির হ'লাম। সামান্ত জল আছে, কিন্তু চাল নেই, আছে সের দেড়েক ডাল। সামান্ত জলে শুধু ডাল সিদ্ধ করে' খাওয়া হলো। এক একজনের অংশে আধ কাপ ডাল পড়ল এবং থালার পরিবর্তে কাপে করেই খাওয়া হলো। ক্ষুধার কাজ আর পিপাসার কাজ এই আধ কাপ ডালেই সমাধা হলো। গাড়োয়ানদের চাল ডাল কিছুই ছিল না। তারা কতগুলি গাছের পাতা সিদ্ধ করে' খেল।

গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে ভয়ানক দুঃখ হলো। ফুটন্ত বয়স। এই আধ কাপ ডালে ওর এতটুকু ক্ষুধাও মেটেনি। গৌরীর মাকে বল্‌লাম, আপনার ডালের কাপটা না হয় গৌরীকে দিন।

তিনি বল্‌লেন, আমি বুড়োমানুষ, আমি কি না খেয়ে থাকতে পারি? বলে' ডালটুকু তাড়াতাড়ি নিজের মুখের ভেতর ঢেলে দিলেন। বুঝতে পার্‌লাম, এখানে আধ কাপ ডালের মূল্য লক্ষ সন্তানের সমান। দুর্ভিক্ষপীড়িত যে মানুষ তার কাছে পৃথিবীর সমস্ত মানব-ধর্ম, মানব-নীতি পদতলে দলিত ও মথিত হচ্ছে। ক্ষুধিত ও পিপাসিতের বক্ষের কাছে পৃথিবীর সমস্ত ভার মুক্ত। সর্ব সংস্কার-বিহীন হয়ে সে ছুটে চলে পাগলের মত—পিছনের স্নেহের সুর কানে না তুলে'। মাতৃস্নেহ হলো আজ এই পথের ধারে আমূল ভাবে বিনষ্ট।

নিজের অংশের ডালটুকু এখনো খাইনি। শান্তিদি'র কাছ থেকে নিজের কাপটা তুলে' এনে গৌরীকে বল্‌লাম, খাও। ক্ষুধায় বিবর্ণ মুখের ওপর গৌরী একটু হাসি টেনে' বল্‌ল, নিশ্চয়ই আপনার নিজের অংশটা? বল্‌লাম, আমার নিজের বলে' কোন কিছু নেই, সবই তোমার। ওর মায়ের কথাগুলি গৌরী নিজের কানে শুনেছিল, মায়ের দিকে চেয়ে বল্‌ল, এ পথে মা বড় না আপনি বড়, কিছুই বুঝতে পারলাম না। বল্‌লাম, এ পথ শুধু এগিয়ে চলার পথ। পেছনে ফিরে বড় ছোট বোঝবার সময় নেই। এবার ডালটুকু খেয়ে নাও। গৌরী আমার হাত থেকে কাপটা তুলে' নিয়ে জোর করে' আমার হাত দুটো ধরে' হেসে হেসে আমার মুখেই ঢেলে দিল কাপটা।

এমন সময় আর একটি মাদ্রাজী পরিবার পিছন পথ হ'তে আমাদের সঙ্গে এসে একত্র হলো। ভদ্রলোক নিজে, স্ত্রী আর ছোট ছোট পাঁচ ছ'টি ছেলেমেয়ে সহ গাড়ী করেই এসেছেন।

একটি ছেলের আজ সকাল বেলা থেকে অসুখ। বল্‌ল, কলেরা। ছেলেটির বয়স সাত আট। আমাদের দলে এসে পৌঁছাতেই ছেলেটির অবস্থা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। কম্পাউণ্ডারবাবু ডাক্তার। ছেলেটিকে দেখে বল্‌লেন, বাঁচবে না। আপনার আর সব ছেলেপেলেদের যদি রক্ষা করতে চান তবে এর মায়া ত্যাগ করুন। এ বড় ছোঁয়াচে রোগ। ভদ্রলোক গভীর দুশ্চিন্তায় পড়লেন। কম্পাউণ্ডারবাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, তাহ'লে আপনি কি পরামর্শ দেন? কম্পাউণ্ডারবাবু নিরুত্তর। ভদ্রলোক শেষে দু' চক্ষের জল ছেড়ে দিয়ে গাড়ী থেকে ছেলেটিকে তুলে' এনে রাস্তার একপাশে শুইয়ে রাখ্‌লেন। ছেলেটির মা উন্মাদিনীর মত গাড়ী থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে' ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে' পাহাড় অরণ্যভেদী মৃত্যুকান্না কাঁদলেন। এ পথে পিতা আছে পিতৃস্নেহ নেই; মাতা আছে মাতৃপ্রাণ নেই। জীবন্ত ছেলেটিকে শেষে পথের ধারে ফেলে যেতেই হলো। ছেলেটি দু' একবার মা মা করে' ডাক্‌ল। কিন্তু মায়ের প্রাণ আজ গভীর নীরব।

আমরা এখন সকলেই গাড়ীতে উঠে বসেছি। পথ এখন ভাল। ক্রমশঃ সমতলভূমিতে গিয়ে নাম্‌ছে। মনে হলো: পথ তাহ'লে শেষ হয়ে এসেছে। পাহাড়গুলি এখন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। বন-জংগল এখন পাতলা। বনের ফাঁক দিয়ে বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। গুহার গভীরতা অনেক কমে' গেছে। গুহার ভেতরের অন্ধকারও এখন পাত্‌লা। মনে হলো: এসেছি তাহ'লে! পৌঁছেছি তাহ'লে! এই ধ্বনি সকলের মুখে। আর একটু এগিয়ে গেলেই

আমরা টাংগুব পাব। মানুষের বসতি পাব। সমাজ পাব, সংসার পাব, হাট বাজার পাব, চাল পাব, ডাল পাব, জল ভরা নদী পাব। আবার খেয়ে বাঁচব। এমনি জীবনের জয়ধ্বনি সকলের মুখে। নিমিষের মধ্যে আমরা ভুলে' গেলাম—পেছন পথের জীবনের চিরসত্য বাণীটা—জীবন মিথ্যা, মৃত্যুই সত্য। এখন আবার ভাবছি—মৃত্যুই মিথ্যা, এজীবনই সত্য; কত আনন্দ-মধুর।

রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। শুভ্র-শীতল পরিষ্কার জোৎস্না ফিরে-পাওয়া জীবনের আশীর্ব্বাদ রূপে যেন আমাদের পথের পাশে নেমে আস্‌ছে আকাশ থেকে। এখন পথে পাহাড় নেই, গুহা নেই—শুধু বড় বড় মাটির ঢিবি। প্রায় ঘণ্টাখানেক এমন পথে আসার পর একটা সড়ক পেলাম। দু'পাশে ধানের ক্ষেত। সকলে সমস্বরে বলে' উঠলাম, টাংগুব এসে পড়েছি। মেয়েরা আনন্দে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো। কম্‌পাউণ্ডারবাবু বার বার শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ কর্‌লেন। বল্‌লেন, রাখে কৃষ্ণ মারে কে? সকলের প্রাণেই নব জীবনপাবার আনন্দ আরউল্লাস। ছেলেপেলেগুলি পর্যন্ত এতদিন পর যার যার মার সঙ্গে আবদারের সুরে কথা বল্‌তে লাগল। মায়েরাও স্নেহসিক্ত অধরে ছেলের মুখে চুমো খেয়ে আকাশের চাঁদ দেখাতে লাগ্‌ল। আমাদের চোখেমুখে এখন জীবনের আলো। ভাবলাম : আর ভয় নেই, বেঁচে গেলাম এ যাত্রায়। কিন্তু অমনি মৃত্যুরধ্বনি কাণে এসে পৌছাল। চীৎকার করতে করতে কতগুলি কুলীমজুর সমুখে এসে পড়ল। বল্‌ল, বাবু, এ পথে যাবেন না। একদল বর্মী ডাকাত বড় বড় দা হাতে ঐ দিকে

লুটপাট আরম্ভ করে' দিয়েছে। আপনারা এখান থেকে শীগ্‌গির সরে' পড়ুন।

ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম। সারা পথ মেরে তারপর টাংগুব এসে ডাকাতের হাতে পড়ব! সব লুটপাট হবে? এ সড়কে প্রায় শ'চারেক লোক পাহাড় পেরিয়ে এসে সবেমাত্র নেমেছে। সকলের মাঝে এই খবর রটে' ভীষণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হলো। চারিদিকে হৈ চৈ রব। যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। সকলের আগের গাড়ীতে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে' আছি। পেছনের দিকে চেয়ে দেখি, আমাদের দলের একটি গাড়ীও নেই, লোকও নেই। এ পর্যন্ত আমার গাড়ীর পেছনে পেছনে সবাই ছিল। এই গোলমালে কে কোথায় যে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না! উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলাম, কম্পাউণ্ডারবাবু! রামকিষণ! গৌরী! কিন্তু কারো সাড়া নেই, সব হারিয়ে গেছে। সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে চলে' গেছে কোন্ পথে কে জানে? নিমিষের মধ্যে এক মহাপ্রলয় হয়ে গেল। সঙ্গের সাথীরা সব এতদিন পর ছেড়ে চলে' গেল। যদিও জানি এরা আমার কেউ নয়, তবু আজ সত্য সত্যই এদের জন্য চোখে জল এলো। গৌরী? আর কিছু ভাবতে পারলাম না।

আমার গাড়ীর গাড়োয়ান আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই সড়কের পথ ছেড়ে ক্ষেতের মাঝে নেমে কোথায় যেন গাড়ী চালিয়ে নিতে লাগ্‌ল। সড়ক ধরে' সমুখের পথে আর গেল না। সমুখে কিছু দূরে সড়কের ওপর এখনো মুমূর্ষু ইভাকুইজদের ওপর দা আর লুটপাট চল্‌ছে। ক্ষেতের ওপর দিয়ে গাড়ী চল্‌ছে। জ্যোৎস্না

রাত্রি। ক্ষেতের মাঝে অনেক গাড়ী আর অনেক লোক দেখতে পেলাম। কিন্তু আমাদের দলের কাউকেই দেখছি না। তবু বারবার গৌরীকে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু ব্যর্থ আমার ব্যথিত কণ্ঠধ্বনি। গভীর নিঃসঙ্গ ব্যথায় চোখ দুটী সিক্ত হয়ে উঠ্‌ল। গাড়োয়ান গাড়ী চালিয়ে নিতে লাগল ক্ষেতের মাঝ দিয়ে যেদিকে তার খুসী। আমি শুধু অন্তহীন অসীম প্রান্তর বক্ষে হারিয়ে যাওয়ার ব্যাথা নিয়ে চুপ করে' বসে' আছি। প্রায় মাইলখানেক ক্ষেতের পর ক্ষেত পার হয়ে আসার পর চেয়ে দেখি—এখানে মাঠ ভর্তি লোক আর মাঠ ভর্তি গরুর গাড়ী। মনে হলো ঃ প্রায় হাজার দশেক লোকের কোলাহলপূর্ণ ভিড়। যেখানে খুসী মাঠের মাঝে পড়ে' আছে। আমার গাড়ী একটা গাছের নীচে বাঁধলাম। চারপাশে আরো অনেক গাড়ী। গাড়ী থেকে নেমে চারদিকে ঘুরে' বেড়িয়ে আমাদের দলের লোক খুঁজতে লাগলাম। ডাকাডাকি কর্‌লাম—কিন্তু ব্যর্থ সব। ফিরে এসে গাড়ীতে বসলাম। সহসা কাণে এলো অশোকদা!

গাড়ী থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে' গৌরীর কাছে গেলাম। বল্‌লাম, আর সব কোথায়? তোমার মা, শকুন্তলাদি', শান্তিদি'? গৌরী বল্‌ল, কিছুই জানিনা। আমি এতক্ষণ অজ্ঞানের মত ছিলাম। এখন দেখছি আমি গাড়ীতে একা।

গৌরীর গাড়ী আর আমার গাড়ী একত্র লাগালাগি করে' বাঁধলাম। গৌরী আমার গা ঘেঁষে' বস্‌ল। বল্‌লে, বাবা আর মাকে যদি ফিরেনা পাওয়া যায় তবে আমি একা কোথায় যাব? বল্‌লাম, এখনো অনেক পথ বাকী, পথের শেষেই সে প্রশ্ন

উঠবে। মনের মত প্রশ্নের জবাব না পেয়ে গৌরীর চোখ দুটী জলে ভরে' উঠ্‌ল। তবু আমার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। মাথার চুলগুলিতে আমার সমস্ত কোল ভরে' গেল। মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লাম, রাত বেশী নেই, একটু ঘুমোও।

গৌরীর মাথা কোলে রেখে সারা রাত বসে' রইলাম। রাত্রি ভোর হয়ে গেল। চেয়ে দেখি, লাখখানেক লোক ঐ মাঠের মধ্যে। রাত্রিবেলা যা অনুমান করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী। দেখে মনে হলো ঃ এরা মানুষ নয়, কতগুলি কংকাল মূর্তি। মাঠের চারপাশে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে মড়ার মত পড়ে' আছে। মাঠের চারপাশে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢিবি ; আগাছার বন জংগল ভরা। মাঝখানে এই প্রকাণ্ড মাঠ। শুধু রৌদ্রতপ্ত শুক্‌নো মাটির বুক। তৃণাচ্ছাদিত কোন শ্যামল স্থান কোথাও নেই। অনুর্বর পতিত জমি। মাঝে মাঝে দু' একটা হিজল গাছ—পাতা ঝরা। মরা গাছের মত শুক্‌নো ডালপালা নিয়ে দূরে দূরে দাঁড়ানো। কিন্তু ঐ হিজল গাছের নীচটুকুই আমাদের কাছে ছায়াশীতল কুঞ্জবন। আমাদের তৃষিত উত্তপ্ত দেহের শীতল ছাউনি। যারা আগে এসে এই মাঠে পৌঁছেচে তারাই এ বৃক্ষতল দখল করে' মাটির ওপর কাঁথা-কম্বল আর ছেঁড়া মাদুর পেতে বসে' আছে, কেউ বা পড়ে' রয়েছে। বাকী লোক দারুণ রৌদ্রদগ্ধ মাঠের ওপর ছট্‌ফট্‌ করছে। সূর্য এখন মাথার ওপর। সারা মাঠটা যেন প্রচণ্ড আগুনের ওপর বসানো একটা লোহার কড়া। মানুষগুলি তার ওপর সিদ্ধ হচ্ছে। লোকগুলি একটু ছায়ার জন্য চারদিকে ছুটোছুটি করছে। অনেকে সহ্য করতে না পেরে দূরে গিয়ে ঐ মাটির

ঢিবির ওপর যে পাতলা আগাছার জংগল আছে তার ভেতরে ঢুকে রয়েছে। আধুনিক মানুষের আসল চেহারা জংগলের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পেলাম।

দূরে একটা ঘন ঝোঁপের ধারে কতগুলি বাংগালী পরিবার দেখলাম। গাড়োয়ানকে বললাম, সেখানে আমাদের গাড়ী নিয়ে যেতে। গিয়ে দেখি আমাদের দলের লোক সবাই সেখানে, বাদে রামতনু। জিজ্ঞাসা করলাম, রামতনু কোথায়? রামকিষণ মলিন কণ্ঠে বল্‌লে, কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। কথা শুনে' স্তম্ভিত চোখে রামকিষণের দিকে চেয়ে আছি। কিছু বলতে পারলাম না। রামকিষণ আবার বললে, গত রাত্রি থেকে তার পেটের অসুখ আর ভেদ বমি হয়, আজ সকালবেলার দিকে মারা গেল। শেষে কি আর করি, টেনে নিয়ে ঐ জংগলটার ধারে ফেলে দিয়ে এসেছি। রামতনুর মৃতদেহটা দেখতে ইচ্ছা হলো। জংগলের কাছে গিয়ে দেখি রামতনু হাঁ করে' আর চোখ দুটো মেলে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। রামতনু কে তা জানি না, শুধু এই একমাস চলার পথের সাথী ছিল, হয়ে গিয়েছিল বড় আপনার। চোখ দুটী আমার সহসা জলে ভরে' উঠ্‌ল। যদি সত্যিকারের চোখের জল কোনদিন ফেলে থাকি তবে এই সেই চোখের জল। শুনেছি মরে' যাওয়ার পর চোখ মেলে' থাকলে অমঙ্গলের লক্ষণ। রামতনু ছিল আমাদের দলের লোক, কাজেই আমাদের কোন অমঙ্গল হয় ভেবে নিজের ডান হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়ে রামতনুর চোখ দুটী বুজিয়ে দিলাম।

—একি করলেন! কলেরার মড়া ছুঁলেন যে? আপনার যদি হয়?

পেছন ফিরে চেয়ে দেখি গৌরী। এ মেয়েটি কে? আজও কিছু বুঝতে পারলাম না। হৃদয় যেখানে তুঃখের বোঝায় ভেঙ্গে পড়ে, বুক যেখানে আঘাতের পর আঘাতে হয় শতবার চূর্ণ, সেখানেই দেখি গৌরী ছায়ার মত পাশে এসে দাঁড়ায়। শুধায় কুশল-বার্তা, মুছে দেয় চোখের জল, ফোটায় অধরে আশার হাসি। তাই হেসে বললাম, হলে না হয় আমিও মরব। হয়তো এমনি চোখ মেলে পড়ে' থাকব। নিজের অমঙ্গল জেনে তুমি চোখ তুটী এভাবে আঙ্গুল দিয়ে বুজিয়ে দিয়ে চলে' যাবে। গৌরী রাগে ফোঁস্ করে উঠল। এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে' টেনে নিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে, চলুন, হাতটা এক্ষুণি ধুয়ে' দিচ্ছি।

নিকটেই শহর। শুনলাম, সেখানে চাল ডাল সস্তা ও সুলভ। কিন্তু শহরে প্রবেশ নিষেধ; হুকুম নেই। কারণ আমাদের সারা দেহে নাকি মৃত্যুর গন্ধ। ছোঁয়া লাগলে শহরের করপোরেশনের দেহ রুগ্ন হ'তে পারে। পড়ে' আছি মাঠে, বিশ্বের অনাদৃত হয়ে। ঘৃণা অবহেলা তুচ্ছ তাচ্ছল্যে আমাদের জীবনও ভেঙ্গে পড়া। কিন্তু সে সব আমরা এখন গ্রাহ্য করি না। মান অপমান-বোধ এখন আমাদের নেই। আমরা চাই এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে' পড়তে; নইলে মৃত্যু অনিবার্য। কারণ এই হাজার হাজার লোকের মধ্যে কলেরা আর বসন্ত সুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে মৃত মানুষ

যেখানে সেখানে পড়ে' আছে। মড়া সরিয়ে নেবার কোন বন্দোবস্ত নেই। যেখানে মরে সেখানেই পচে, সেখানেই আর একজনের ব্যারাম হয়; আবার সেও সেখানেই মরে' পড়ে' থাকে; পচে গন্ধ উঠ্‌তে থাকে। এমনি চলছে এই মাঠের অবস্থা। কাজেই এখন এখান থেকে পালাতে পার্‌লে বাঁচি। প্রত্যহ অন্তত দশবারো বার করে' জাহাজের মানে লঞ্চের খবর নিই। আজ তিনদিন যাবৎ কোন লঞ্চ আসছে না। এদিকে দৈনিক প্রায় হাজার দুই করে' লোক পাহাড় পথ পেরিয়ে এসে এই মাঠের ওপর জমা হচ্ছে এবং কলেরা বসন্তে রোজ শ'খানেক করে' লোক মারা যাচ্ছে।

আমরা প্রায় কুড়ি একুশটি বাংগালী পরিবার একত্র এই ঝোঁপের ধারে ক্ষেতের ওপর কাপড়ের তাঁবু খাটিয়ে বসবাস করছি, মানে সমস্তদিন রোদে শুকোই, সমস্ত রাত্রি হিমে ভিজি আর শীতে কাঁপি। দিনেও একটু একটু করে' মরি, রাত্রিতেও একটু একটু করে' মরি। সারাদিন ষ্টীমার ঘাটে ষ্টীমারের খোঁজে বসে' থেকে থেকে সন্ধ্যাবেলা এসে খবর দিই ষ্টীমার নেই। খবর শুনে' গভীর আতংকে ভরে' ওঠে সকলের বুক। একটা বাজ মাথায় পড়লে সহ্য করা যায়, কিন্তু ষ্টীমার নেই, এ খবর বজ্রের চেয়েও ভয়াবহ। রাত্রিটা জেগে কাটাই উৎকণ্ঠিত চিত্তে জাহাজের ফু যদি শুনতে পাই।

শেষে একদিন শোনা গেল, কাল তিন চারখানা ষ্টীমার আসবে এক সঙ্গে। লোকগুলি আজ সন্ধ্যারাত্রি থেকেই পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগল টিকিটের জন্য। এই মাঠ

ছেড়ে তিন মাইল দূরে ষ্টীমার ষ্টেশনে গিয়ে ভিড় করতে লাগল। আমরাও শেষে প্রস্তুত হ'তে লাগলাম। কিন্তু আমাদের সঙ্গে মালপত্রের অভাব নেই। এইসব মালপত্র নিয়ে এখন তিন মাইল দূরবর্তী ষ্টেশনে কি করে' যাই? গাড়োয়ানরা আমাদের এই মাঠে ফেলে দিয়ে সেদিনই চলে' গেছে। এখানে ঠেলাগাড়ী বা আর কিছু নেই যে, মালগুলি একবারে নিতে পারি। কুলী খুঁজতে লাগলাম। দশজন কুলীকে এক রকম হাতে পায়ে ধরে' দু'শ টাকায় ঠিক করলাম এবং একবারেই সব মাল নিয়ে রওনা হ'লাম। মাইল দুই গিয়ে আর সমুখে এগুতে পার্‌ছি না। সমুখের এক মাইল জুড়ে' লোকের ভিড় টিকিটের জন্য। এখন পর্যন্ত কিন্তু ষ্টীমারের দেখা নেই। কোন রকম ভিড় ঠেলে এগুতে এগুতে একেবারে নদীর তীরে, যেখানে ষ্টীমার এসে লাগবে, সেখানে গিয়ে মালপত্র মাটির ওপর রেখে বসে' আছি। মানে, হাজার হাজার যাত্রীর ঠেলাঠেলির মধ্যে দেহটাকে এতটুকু করে' বসে' আছি। লোকের ঠেলাঠেলির চাপে পড়ে' ছেলেপুলে সব আধমরা হয়ে পড়ে' রয়েছে। হয়তো আর দু'চার ঘণ্টা বাঁচতে পারে। এমন সময় সত্য সত্যই রাত তিনটেয় তিনখানা ষ্টীমার এলো। কিন্তু এখন উপায়! টিকিট করা কারো হয়নি। কারণ টিকিট ঘরের তখনো দরজা বন্ধ। নিমিষের মধ্যে তিনখানা ষ্টীমার ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়ে ছেড়ে গেল। প্রায় হাজার দুই লোক বিনা টিকিটে তার মধ্যে গিয়ে উঠে পড়েছে। ছোট্ট ষ্টীমার। এত লোক ওঠবার নিয়ম নেই, কিন্তু কার কথা কে শোনে। ষ্টীমার থাকুক আর ডুবুক উঠতেই হবে

পুলিশ লাঠি চালিয়েছিল, কিন্তু সবই ব্যর্থ। ষ্টীমার চলে' গেল। আমরা সেই ভিড়ের মধ্যে পড়ে রইলাম।

পরদিন রাত ভোর হ'তেই আবার টিকিটের জন্য অমানুষিক চেষ্টা করলাম সকলে মিলে, কিন্তু সবই ব্যর্থ হ'ল। এখানে বিনয়নম্র বাক্যে টিকিট মিলে না; গায়ের বলেও নয়, শিক্ষার বলেও নয়। কেবল মাত্র টাকার বলে টিকিট মিলে। চোখের সামনে দেখলাম অবাংগালী কয়েকটি পরিবার দশ টাকার কয়েকটি নোট ঘুষ দিয়ে টিকিট কিনে আনল। ভাবলাম: এই পথ না ধরলে উপায় নেই। কিন্তু শকুন্তলাদি' বল্‌লেন, এত অন্যায় ভাবে টিকিট কিনে এনে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না—আমাদের টাকা আছে আমরাই যাব? কিন্তু যাদের টাকা নেই, তারা? ঐ কুলীমজুররা? ঘুষ দিয়ে টিকিট কিনলে কুলীমজুরদের পথ বন্ধ করা হয়। তা হ'তে পারে না! দিন্, টিকিটের টাকা আমার হাতে। বলে' শকুন্তলাদি' আমার থেকে আমাদের সকলের টাকা নিয়ে লক্ষ লোকের ভিড় ঠেলে সোজা টিকিট ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে নারী-মধুর কণ্ঠে বল্‌লেন, You gentleman! Ladies first please! Ladies with dying children!

টিকিট যে বিক্রী করে সে একজন নগণ্য বর্ম্মী, সামান্য লেখাপড়া জানা চাষীর ছেলে। বাংগালী নারীর মুখে এতগুলি ইংরেজী কথা শুনে' ভুলে গেল নিজের আর্থিক জগতের কথা। এক রকম হাতজোড় করে' বল্‌লে, আসুন, আপনি ওপরে উঠে আসুন। শকুন্তলাদি' এবার টিকিট ঘরের রেলিং দেওয়া

বারান্দায় উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেই আলুলায়িত রুক্ষ কেশ! উদাসিনী মূর্ত্তি! সমুখে ভিড় করে' দাঁড়ালো হাজার হাজার লোক। শকুন্তলাদি'র দিকে সকলেই প্রশ্নভরা স্তব্ধ নেত্রে চেয়ে রইল। সকলেই হাতজোড় করে' মৌনমুখে যেন বল্‌ছে, আমার জন্য একখানা টিকিট।

শকুন্তলাদি' সমুখের উদ্বিগ্ন জনতার দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বল্‌লেন, আপনাদের সঙ্গে যাদের মেয়েছেলে আছে তাঁরা এগিয়ে আসুন। আগে তাঁদেরই টিকিট দেওয়া হবে। টিকিট-বেচা বর্মী ভদ্রলোক শকুন্তলাদি'র উক্তি সকলকে শুনিয়ে সমর্থন কর্‌ল। মেয়েছেলেদের জন্য আগে টিকিট দেবার বন্দোবস্ত হলো।

আমাদের সকলের টিকিট উচিৎ মূল্যে কিনে' শকুন্তলাদি' এসে হাসতে হাসতে বল্‌লেন, অরাজক রাজ্যে শান্তিস্থাপন করতে পারে শুধু নারী।

বেলা বারোটার সময় আবার তিনখানা ষ্টীমার এলো। আমাদের মালপত্র যা-কিছু সব নদীর তীরে এনে একত্র করে' রাখা হয়েছে। ষ্টীমার একটু দূরে নোঙ্গর ফেলে' দাঁড়িয়ে আছে; তখনো তীরে লাগে নি। আমরা সব প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু ষ্টীমার যখন তীরে এসে ভিড়ল, সে সময়ের অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রায় হাজার তিনেক লোক এসে ঝুঁকে পড়্‌ল। এদের মধ্যে অনেকেরই টিকিট নাই বা টিকিট করতে পারেনি। মেয়েছেলে নিয়ে ভীষণ চাপে পড়ে' গেলাম। রামকিষণ, বসির ভিড় ঠেলে'

আমার আগে আগে চল্‌ছে। আমার পেছনে আমার ডান হাত ধরে' গৌরী, তার পেছনে শান্তিদি, শকুন্তলাদি' এবং আর সবাই। আমাদের প্রত্যেকের কোলে ছেলেপেলে। কুলীরা সমস্ত মালপত্র মাথায় নিয়ে অনেক পেছনে রয়েছে। এদিকে পুলিশ লাঠির চোটে ভিড় তাড়াচ্ছে। মাথায় লাঠি পড়ে আর কি! পকেটে দশ টাকার নোটগুলি গুঁজে দিতেই পুলিশ পথ ছেড়ে দিল। ষ্টীমারে আমরাই যেন সকলের শেষে গিয়ে উঠলাম। তখনি ষ্টীমার ছেড়ে দিয়ে নদীর মাঝখানে গিয়ে আবার থামল। কিন্তু ষ্টীমার এখানে থামানো অসম্ভব। শত শত লোক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে' সাঁতরে এসে ষ্টীমারে উঠতে লাগ্‌ল। এ অবস্থায় ষ্টীমারটা ডুবো ডুবো অবস্থা। ষ্টীমার তখনি নদী ছেড়ে হু হু করে' ছুট্‌ল।

সর্বনাশ! চেয়ে দেখি অফিসের মণীন্দ্র ছেলেটা উঠতে পারেনি আর উঠতে পারেনি মালপত্র নিয়ে কুলীরা কেউ। মেয়েরা কান্না সুরু করে' দিল। তাদের সোণা-গয়না, জিনিষ-পত্র সব পড়ে' রইল। আমি মনে মনে কেঁদে আকুল হলাম মণীন্দ্রের জন্য; ওর সঙ্গে টাকা পয়সা কিছুই নেই। না খেয়ে নিশ্চয় মারা যাবে। ষ্টীমার চল্‌ছে হু হু করে'; কিন্তু শত শত আরোহীদের বুকেও রুদ্ধ ক্রন্দনধ্বনি। চারিদিকে যেন মৃত্যু-শোক। ব্যাপারটা শেষে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। কারো ছেলে, কারো বয়স্থা মেয়ে, কারো স্ত্রী, কারো স্বামী টাংগুবের ঘাটে পড়ে' রয়েছে, ষ্টীমারে উঠতে পারেনি। সেজন্য এই মৃত্যু-কান্না। বার বার নিজের চোখ দুটী মুছলাম নদীর তীরের দিকে চেয়ে, মণীন্দ্র কোথায়?

দুদিনে এসে আকিয়াব পৌঁছলাম। এ শহরে এখনো বোমা পড়েনি ; কিন্তু বহু লোক শহর ছেড়ে পালিয়েছে। আজ না হোক দু'একদিনের ভেতরেই এ শহরেও পড়বে। আকিয়াবের ঘাটে ষ্টীমার পৌঁছতেই চেয়ে দেখি বহু লোক আমাদের দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হলো ঃ আমরা যেন কোন অভিশপ্ত দেশ হ'তে পালিয়ে এসেছি, তাই আমাদের দেখবার জন্য আকিয়াবের ঘাটে এতো লোকের ভিড়। একে একে আস্তে আস্তে ষ্টীমার থেকে সিঁড়ি বেয়ে তীরে গিয়ে উঠলাম।

তীরে উঠতেই সমস্ত লোক আমাদের দেখে ভয়ে ও আতংকে আমাদের কাছ থেকে একটু সরে' দাঁড়াল। কারো মুখে কোন কথা নেই, কোন প্রশ্ন নেই, শুধু ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে আমাদের দেখ্‌ছে। সত্যি আমরা মানুষ কিনা সে বিষয়ে যেন তাদের মনে সন্দেহ জন্মেছে। মানুষের চেহারা এ রকম হয় ?

এরা কি সভ্যসমাজের সত্যিকারের মানুষ না অরণ্যবাসী বনমানুষ! এতো বড় বড় গোফ দাঁড়ি! এত বড় বড় চুলে জটা পাকানো ; ধূলো বালি মাখা। অস্থিসার অর্ধনগ্ন ভয়ংকর বীভৎস চেহারা! কিন্তু এ সন্দেহ কেটে গেল যখন আমরা সভ্য, শিক্ষিত, পরিমার্জিত মানুষের ভাষায় কথা বল্‌লাম। আশ্রয় চাইলাম। কয়েকজন বাংগালী ভদ্রলোক এগিয়ে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। অতিথিশালার মত প্রকাণ্ড একটা বাড়ীতে নিয়ে আমাদের স্থান দিল। বাড়ীর ভেতরেই একটা জলের কূয়ো আছে, সেটা দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, আপনারা এখন স্নান আহার করে' বিশ্রাম করুন।

যেই শুন্‌ল ওখানে জলের কুয়ো আছে, অমনি মেয়েরা ঝাঁপিয়ে গিয়ে কুয়োর ধারে পড়ল। ইতিমধ্যেই কাপড়-কাঁচার সাবান কেনবার জন্য রামকিষণকে টাকা দিয়েছিলাম। সে এসে কুয়োর ধারে সের পাঁচেক সাবান ফেলে দিল। অমনি সকলে মিলে কাপড় কাঁচতে লাগল। নিজের দিকে চেয়ে ভাবছি, এখন আমার উপায়? সাবান মেখে কাপড় ধোবার অভ্যাস কোনদিন নেই। কোত্থেকে গৌরী একখানা ধুতি নিয়ে এসে বললে, এই কাপড়খানা পরুন, ওটা ছেড়ে দিন, সাবান মেখে কেঁচে দিচ্ছি। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, এই কাপড় পেলে কোথায়? বল্‌লে, মার কাছে বাবার একখানা কাপড় ছিল। হেসে বললাম, এতো মোটা বুদ্ধি? কিন্তু তোমার বাবা পরবেন কি? বল্‌লে, আপনার কাপড় শুকোলে পরে বাবার কাপড় কেঁচে দেব বুঝলাম, এর পর তর্ক করা বৃথা।

রান্না হলো। সকলে মিলে খেতে বসলাম। কিন্তু দু'চার গ্রাস খেতে না খেতেই পেট যেন ভরে' গেল, আর খেতে ইচ্ছে করল না। মাসখানেক জ্বরে ভুগে' ওঠার পর প্রথম ভাত পথ্য করতে গিয়ে যে ক'টি ভাত খাওয়া যায়, আমাদেরও সেই অবস্থা হলো। কম্পাউণ্ডারবাবু দুঃখু করে' বল্‌লেন, না খেয়ে খেয়ে শালার পেট গেছে একেবারে শুকিয়ে; ভাত ঢুকবে কোথায়? বলে' পরিপূর্ণ এক ঘটি জল খেয়ে দীর্ঘকণ্ঠে বল্‌লেন, দুর্গা! দুর্গা! এই বলে' ভাতগুলি ফেলে উঠে পড়লেন।

আজই জলগোপাল জাহাজ আকিয়াব বন্দর ছেড়ে হাজার হাজার ইভাকুইজ নিয়ে চট্টগ্রাম রওনা হবে। আমি আর

রামকিষণ অনেক কষ্টে টিকিট কিনে আনলাম। সেই বেলা চারটায় জাহাজ ছাড়বে. এখন থেকেই ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু এবার আমাদের কপাল ভাল, রেংগুন পোর্টের মিত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি এখন এই পোর্টের অফিসার। তাঁর কৃপায় সসম্মানে জাহাজে উঠে ভাল জায়গা পেলাম। মানে, আমাদের দলের সবাই সব চেয়ে আমাকে ভাল জায়গা করে' বসতে দিল। দলের লোকের ভিড়ের মাঝে গৌরী চুপ করে' বসে' বার বার আমার দিকে চাইছে। বুঝতে পারলাম, ওর ওখানে অসুবিধা হচ্ছে। ইসারা করলাম আমার কাছে এসে বসবার জন্য। গৌরী একটু হেসে মাথা গুঁজে রইল। বুঝলাম, ওর লজ্জা করছে। লজ্জা ওর শুধু শকুন্তলাদি'র কাছে। তিনি যদি কিছু বলেন, সেই ভয়ে উঠে আসছে না। বুঝতে পেরে শকুন্তলাদি'কে বললাম, আমার কাছে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, গৌরীকে আমার কাছে উঠে আসতে বলুন না? শকুন্তলাদি' আমাকে একটু কমই care করেন। বললেন, এত একচোখো নজর কেন? কেবল গৌরী আর গৌরী—আমরা সব যেন জলে ভেসে এসেছি। তারপর গৌরীর দিকে চেয়ে বললেন, যা, তোকে দলপতি ডাকছেন। মেয়েটার বরাত ভাল। এ কথার পর কি সাধ্য আছে গৌরী আর উঠে আসে। একেবারে মাথা গুঁজে যেখানে বসে' ছিল সেখানেই বসে' রইল।

জাহাজ ছুটে চলেছে বঙ্গোপসাগরের অনন্ত জলরাশির নীল বক্ষে গভীর আন্দোলন তুলে'। এবার নিজেদের বক্ষে চেয়ে

দেখি, পিপাসা আজ আর নেই ; আজ সকল তৃষ্ণা
হায় ভগবান, যে জলের অভাবে পাহাড়ী পথে
শুকিয়ে মরুময় হয়ে গিয়েছিল, আজ এই সুনীল জ
তরঙ্গের দোল্ খাচ্ছি, কিন্তু কই আজ তো আর এ
মুখে দিতে চাইছি না। হায় রে রহস্যময় এই জ
ততোধিক রহস্যময় মানব বক্ষের এই পিপাসা।

চারদিন সমুদ্রবক্ষে থেকে আজ সকাল
চট্টগ্রাম নামলাম। একটু দূরেই রেল ষ্টেশন।
ইভাকুইজের জন্য কয়েকখানা স্পেশাল ট্রেণ দাঁ
ভাড়ায় গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু এই দে
সাধারণতঃ কুলীমজুরদের জন্য, যারা ভাড়া
ভাড়া দিতে এখন আমরাও অক্ষম। কিন্তু এ
করে' গাড়ীতে উঠে শেষে জায়গার অভাবে
আমরা এখন রাজী নই। কাজেই পয়সা
কিনতে হলো বেশ একটু আরামে শুয়ে' বসে
গৌরীরা চট্টগ্রামের লোক, স্থানীয় ট্রেণে তারা
ট্রেণের সময় এখনো হয়নি। কিন্তু শকুন্তলাদি'
গাড়ী এখুনি ছাড়বে। ঢাকা মেইলে তাঁদের
বিদায় নিচ্ছি। শান্তিদি'র সেই অসুখে ভোগা মে
এখন বেশ ভাল হয়ে গেছে। মায়ের কোল
বাড়িয়ে আমার কোলে উঠতে চাইল। তাড়া
তুলে' নিয়ে মুখে ছোট্ট একটি চুমো দিয়ে আব
কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লাম, একমাসে এই

আসতে আসতে এই শিশু পর্যন্ত আমাকে চিনে ফেলেছে। শান্তিদি' এবার দু'চোখের জল ছেড়ে দিয়ে বল্‌লেন, আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

তারপর শকুন্তলাদি'র কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি কিছু বলবার আগেই তিনি আমার দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লেন, আসি তাহ'লে অশোকবাবু! বলে' তিনি দু'হাত তুলে' নমস্কার জানালেন। প্রতি নমস্কার জানিয়ে বল্‌লাম, কিন্তু আপনাদের দেশের ঠিকানাটা? চেনা-পরিচয় হলো যখন মাঝে মাঝে চিঠি লিখব। শকুন্তলাদি' হেসে উত্তর দিলেন, চিঠিপত্রের কি দরকার? ভাল আছি, কুশলে আছি; আপনার মঙ্গল চাই— এই সব তো লিখবেন? এতো অতি পুরাতন কথা। তার চেয়ে এইতো বেশ। চেনা-পরিচয়ের চিহ্ন এই পথের শেষে এসে মুছে' ফেলাই ভাল। মায়া বাড়িয়ে কি লাভ? কথা শুনে' আর ঠিকানা চাওয়ার মুখ রইল না। একটু ম্লান হাসি হেসে আচ্ছা তাহ'লে যাই। এই কথা বলে' আস্তে আস্তে গাড়ী থেকে নেমে এলাম। মনে হলো এ শকুন্তলাদি'কে এতদিনেও এতটুকু চিনতে পারলাম না। শুধু প্রশ্ন রয়ে গেল এই নারী কে?

ঘণ্টাখানেক পর গৌরীদের গাড়ী ছাড়বার সময় হলো। ওরা সবাই গাড়ীতে উঠে বসেছে। গৌরী গাড়ীর জানালার ধারে বসে' মুখ বার করে' আমার সঙ্গে কথা কইছে; কথা কিছুই না, শুধু চোখের জল। বল্‌লাম, কেঁদোনা। এমনি করেই হয় চেনা-জানা আবার এমনি করেই ছেড়ে চলে' যেতে হয়।

সহসা গাড়ীর বাঁশী বেজে উঠল। প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে আস্তে আস্তে গাড়ীটা চলতে লাগল। কিছু দূরে গেলে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গৌরীর ডাক শুনলাম, অশোকদা!

কিন্তু মুখ ফিরিয়ে তার দিকে আর চাইতে পারলাম না।

শেষ